রাজ্যের রূপকথা

প্রথম খণ্ড

বলকান্ দেশের রূপকথা

রাজ্যের রূপকথা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২/১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রথম পর্ব

আমার কথা

'রাজ্যের রূপকথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সব জাতের বাছাই-করা কটি প্রাচীন রূপকথা নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে লিখে সেগুলি নানা খণ্ডে সম্পূর্ণ করে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে তখন 'বিচিত্রা'র আসরে খুব নিবিড় করে পেয়েছি—তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই! ছোট-গল্প, উপন্যাসের মর্ম-কথা, ভারতীয় চিত্রকলা, নাটক ও নাট্যশালার অভিনয়, নাচের মুদ্রা থেকে বিদেশী কথার বাঙলা পরিভাষা রচনা—এ সবের আলোচনা চলে সমবয়সী বন্ধুর মতো। সেই সময়ে তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলুম, পৃথিবীর নানা দেশের রূপকথা সংগ্রহ করে বাঙলা ভাষায় সেগুলি রূপান্তরিত করবো—আমার সাধ। শুনে তিনি খুশী হয়ে বলেছিলেন, লাইন ধরে তর্জ্জমা যেন না করি! সে-তর্জ্জমায় গল্প-উপন্যাসের রস নষ্ট হয়, জান্ থাকে না! গল্পগুলি পড়ে নিজস্ব ভাষায় যেন লিখি! উপাখ্যান, ভাব, চরিত্রগুলো যেন বজায় থাকে—সেদিকে শুধু নজর রেখে লেখা চাই। তাঁর সে-উপদেশ শিরোধার্য্য করে রূপকথাগুলি লিখেছি—লাইন ধরে তর্জ্জমা করিনি।

সেই সময় থেকেই নানা দেশের রূপকথা সংগ্রহে আমি মনোনিবেশ করি; এবং ১৩৫৪ সাল পর্য্যন্ত নানা দেশের প্রায় চারশো রূপকথা সংগ্রহ করেছি। তিব্বত, চীন, জাপান, রাশিয়া, বলকান, তুর্কি, আফ্রিকার কঙ্গো, কেপ-কলোনি, মাদাগাস্কার; হাওয়াই-দ্বীপ—এমনি বহু দেশের বহু জাতের রূপকথা সংগ্রহ করেছি। অবশ্য সে-সব দেশের ভাষায় গল্পগুলি পাইনি—পেয়েছি ইংরেজী ভাষার মারফৎ।

আরব এবং পারস্য দেশের রূপকথাগুলি এ সংগ্রহে গ্রহণ করিনি। বাঙলার অনেকগুলি প্রাচীন রূপকথা বহু বৎসর পুর্ব্বে বাঙলার দেশপুজ্য শিক্ষাব্রতী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় ইংরেজীতে লিখে Folktales of Bengal গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে। সে গ্রন্থের শেষ ছাপা-সংস্করণ, আমি যা দেখেছি, প্রায় ষাট বছর পূর্ব্বেকার। আরব এবং পারস্য উপন্যাসের গল্পগুলি আলাদা করে 'আরব্য উপন্যাসের গল্প'; 'পারস্য উপন্যাসের গল্প' নামে প্রকাশ করছি। রেভারেণ্ড দে-মহাশয়ের Folktales of Bengal গ্রন্থের গল্পগুলি লিখে 'বাঙলার রূপকথা' নাম দিয়ে তিনখণ্ডে প্রকাশ করছি। আরব্য উপন্যাসের গল্প প্রথম খণ্ড এবং বাঙলার রূপকথা প্রথম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বাকি খণ্ডগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

রাজ্যের রূপকথার শ'খানেক গল্প লিখে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না—এতগুলি গল্প পর-পর ছেপে প্রকাশ করা কি সম্ভব হবে?

কিন্তু আমার এ-উদ্যোগের কথা শুনে সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কর্ম্মকর্ত্তা আমার সাহিত্য-রসিক বন্ধু হরিকেশব ঘোষ নিজে থেকে রূপসজ্জায় সাজিয়ে

এ গ্রন্থ দশ-খণ্ডে প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগ ভিন্ন এ গ্রন্থ-প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর এ ঋণ শোধ করবার নয়। আমার দুর্ভাগ্য, প্রথম খণ্ডটিও তিনি দেখে যেতে পারলেন না। অকস্মাৎ মৃত্যু এসে তাঁকে আমাদের স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে নিয়ে গেছে! এই বিয়োগ-ব্যথায় আমার মন কতখানি কাতর, ভাষায় তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর একটি বিয়োগ-বেদনায় আজ এ গ্রন্থ-প্রকাশের দিনে আমার মন কাতর। এ রূপকথাগুলি প্রকাশের আয়োজন করছি খবর পেয়ে পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পগুলি তাঁকে শোনাতে বলেন। তখন তাঁর কাছে গিয়ে এ গ্রন্থের অনেকগুলি গল্প পড়ে তাঁকে শোনাই। শুনে তিনি উৎসাহ দিয়ে স্বহস্তে এক পত্র লিখে আমার হাতে দেন। তাঁর সে পত্র বুকে ধরে এ-গ্রন্থের শিরোভূষণ স্বরূপ ব্যবহার করলুম। তিনি এ-গ্রন্থ দেখবেন বলে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। তাঁর সে বাসনা পূর্ণ করতে পারলুম না, আমার এ দুঃখ যাবার নয়!

আমার সংগৃহীত গল্পগুলি পড়ে যদি বাঙলার পাঠক-পাঠিকা একটুও আনন্দ পান, আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

৫২এ বেণীনন্দন ষ্ট্রীট

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৬১

রূপকথার কথা

'রূপকথা' এই কথাটির উৎপত্তি উপকথা থেকে। উপকথার অর্থ কল্পিত গল্প। অনেকে বলেন, যে-উপকথাকে রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, তার নাম রূপকথা! সুধী-বন্ধু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, উপকথার অপভ্রংশে রূপকথা'র সৃষ্টি বলে তাঁর ধারণা। অনেকে 'উ'র জায়গায় 'রু' বলেন; তাই থেকে রূপকথার সৃষ্টি!

গল্পের গতি আর রূপ দেখে রূপকথা এবং ইংরেজী fables, folk-tales কে একগোত্র-সম্ভূত বলে মনে হয়।

আদিম যুগে মানুষের মনে যখন শিক্ষা-সভ্যতার স্পর্শ লাগেনি, তখন নিসর্গের নানা বৈচিত্র্য দেখে সকল-জাতের মানুষ মনে মনে সে-সব বৈচিত্র্যের নানা ব্যাখ্যা করতো। তাদের সে ব্যাখ্যা ছড়া বা গল্পের রূপ ধরে প্রকাশ পেতো। সে-প্রকাশের মধ্যে পাণ্ডিত্য বা নিজেদের জাহির করবার এতটুকু চেষ্টা ছিল না। সে-প্রকাশ ছিল সরল, সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত; সমালোচকের যুক্তি-তর্কের বা পণ্ডিতদের হুঙ্কারের ভয় না রেখে প্রকাশ পেতো। হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে এ-গল্পগুলি লোকের মুখে মুখে চলে আসছে—পাহাড়, নদী, সাগর, বনের অন্তরাল ঠেলে এ-দেশ থেকে ও-দেশে—ও-দেশ থেকে সে-দেশে—দেশে-দেশে। এমনি ক'রে প্রত্যেকটি দেশের স্পর্শে বিচিত্র ভাবে-ভঙ্গীতে জাতি, দেশ, রুচি ও সংস্কার-ভেদে এ সব গল্প কত বিচিত্র রূপ পেয়েছে—সমষ্টিগতভাবে দেখলে তা বোঝা যাবে। এমনি করেই রূপকথাগুলি পুষ্টি লাভ করেছে। যুগে যুগে নানা দেশে মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু রূপকথার আমূল পরিবর্ত্তনও ঘটেছে। সকলেই নিজের নিজের রুচি-অনুযায়ী আদি-রূপকথায় রঙের বিচিত্র তুলি বুলিয়েছে, নানা প্রসাধন করেছে। যুগে-যুগে পৃথিবীর নানা দেশের আবহাওয়ায় সমাজে ও ধর্ম্মমতে যে-বিভেদ ঘটেছে, রূপকথাগুলিতে তার পরিচয় মেলে। একজন বিদেশী সুধী এ সম্বন্ধে খুব খাঁটি কথা বলে গেছেন—An exhaustive account of the folklore of the world would be equivalent to a complete history of mankind.

ইংরাজী ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে নানা দেশের চলিত রূপকথা নিয়ে জার্ম্মানিতে প্রথম আলোচনা সুরু হয়। তাও শুধু পণ্ডিত-মহলে; সাধারণ মানুষের এদিকে কোনো কৌতূহল ছিল না। রূপকথার সম্বন্ধে এ-অনুশীলনে পাওয়া যায় নূতন তথ্য। সে তথ্য—আর্য্য জাতি মূলে ছিল এক, অভিন্ন; বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতির বংশধররা দূরে দূরে নানা দেশে গিয়ে বসতি স্থাপনা করে। দূরে গিয়ে শিক্ষায়, রীতি-নীতিতে, এমন কি কল্পনায়, ভাষায়, মনের গড়নে পর্য্যন্ত ঘটলো পরিবর্ত্তন—সেই সঙ্গে আদিম রূপকথাগুলিতেও বেশ কিছু অদল-বদল হতে লাগলো। কাজেই রূপকথার গড়নে এই যে পরিবর্ত্তন ঘটলো, সে ইতিহাস আলোচনায়

দেখা যাবে, পৃথিবীর ইতিহাস আর মানব-জাতির ইতিহাস মূলে এক। In this way the history of a story like the history of the world was found to be more interesting and more instructive than the history of a campaign.

আদিযুগের এ গল্পগুলিকে পণ্ডিতরা দু-ভাগে ভাগ করেছেন—পুরাণ আর উপকথা। পুরাণের গল্প মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরে রচিত। রূপকথা কিন্তু মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শ-লেশহীন; মনের স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার সামগ্রী। সব দেশের পুরাণের গল্পে সেই এক কথাই পাই। গ্রীক-পুরাণে যেমন পার্শিয়ুস, থিশিয়ুস, হেলেন,—ভারতের পুরাণে তেমনি রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ, ইন্দ্রজিত, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য—দুদিকের পুরাণেই যুদ্ধের সমারোহ এবং সে-যুদ্ধে ন্যায়-ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের পরাজয়। সুতরাং এদিক দিয়েও আমরা প্রমাণ পাই, আদিযুগে সব মানুষের মন ছিল এক—মনের গোত্র এক; পৌরুষ আর শৌর্য্যেয় সমান অনুরাগ। নানা দেশে আর্য্য জাতির বসতি-স্থাপনের জন্য (migration) ভাষায় ধর্ম্মে শিক্ষার যে পরিবর্ত্তন দিনে দিনে ঘটেছিল—সে-কথা মনে রেখে আদিকাল থেকে লোকের মুখে-মুখে-চলে-আসা এ সব গল্পে দেশভেদে, শিক্ষাভেদে, ধর্ম্মভেদে ব্যঞ্জনায় আকৃতিগত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটলেও সেগুলির প্রকৃতিগত অভিন্নতা প্রায় অটুট আছে। The story current among the Indo-European peoples were absolutely identical. আমাদের দেশের হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি দেশ-ভেদে জাতি-ভেদে একটু-আধটু অদল-বদল হয়েই অন্য দেশে প্রচলিত হয়েছে। এ অদল বদলের হেতু, জাতির migration. প্রসিদ্ধ জার্ম্মান আচার্য্য মাক্‌সমূলার সবপ্রথম এ-তথ্য আবিষ্কার করেন। কোথায় সুদূর আফ্রিকা - সেখানকার অতি-প্রাচীন জাতির রূপকথাগুলি ভারতের পঞ্চতন্ত্রের গল্পের মতো সেই জন্তু-জানোয়ার নিয়ে রচা। ভারতের ধূর্ত্ত শেয়ালকে আফ্রিকায় আমরা দেখি ধূর্ত্ত মাকড়শার মূর্ত্তিতে।

পৃথিবীর নানা-রাজ্যের প্রায় পাঁচ-ছশো রূপকথা সংগ্রহ করে পড়ে, তাদের প্রকৃতি বিচার করে দেখেছি, সব দেশের গল্পগুলির মর্ম্মকথায় অর্থাৎ theme-এ আশ্চর্য্য মিল আছে। সেদিক দিয়ে যদি বলি, সব রাজ্যের রূপকথাগুলি শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতির ঊর্দ্ধে; সেগুলিতে মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে আত্মীয়তার ইঙ্গিত পাই, তাহলে সেটা অত্যুক্তি হবে না। এই সব রূপকথার কল্যাণে যদি নিজেদের রচা ধর্ম্ম রাজনীতি প্রভৃতির কৃত্রিম বন্ধন থেকে মনকে নির্মুক্ত করে দ্বেষ-হিংসা ভুলে আবার সেই আত্মীয়তার বন্ধনে সব দেশের সব জাতের মানুষ এক-গোষ্ঠীভুক্ত বুঝে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, তাহলে আর কিছু না হোক, পৃথিবীতে চির-শান্তি বিরাজ করবে, তাতে এতটুকু সংশয় নেই।

৫২এ বেণীনন্দন ষ্ট্রীট

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৬১

পুপু

বুজু

লিওঁী

প্রাণাধিকেষু—

তিন যুগ আগে
কোথা ছিলে তিন জনে ?
নাহি পরিচয়—
দেখা নাই কোনো ক্ষণে,
চোখে নয়···স্বপনেও নয় !
তিন যুগ ধরি
পৃথিবীর নানা রাজ্যে মন নিয়ে কত না সঞ্চরি
কল্প-কুঞ্জ-তরু-স্বর্ণ-শাখে
যেন মণি-মাণিকের ফুল,—লাখে লাখে—
'রূপকথা'—কি বিচিত্র রূপ !
বর্ণে-গন্ধে অতুল অনুপ !
কত না আহরি
মনের সাজিতে ভরি
যত্নে রাখি ! দিই নিকো কারে—
পাছে ছিঁড়ে দূরে ফেলে দেয়
অনাদরে অবজ্ঞার ভারে !

তিন যুগ পরে
তিনটি অতিথি এলে ঘরে!
দিলে সাড়া···কণ্ঠে সুধা-সুর···
কি পুলকে চিত্ত পরিপূর!
কি দিব? তুষিব কিসে?
পাই না কো দিশে!
রাজ্যের সে রূপকথাগুলি—
আমার বুকের মণি···
হীরা-মুকুতার চেয়ে মূল্য বেশী গণি···
তারি কটি নিয়ে
হার গাঁথি প্রীতি-ডোর দিয়ে
তোমাদের কণ্ঠে দিই আজি স্নেহভরে—
অনাদর হবে না যে, জানি ভালো করে!

আষাঢ়, ১৩৬১ তাতা

সূচী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব

বলকান দেশের রূপকথা

দ্বিতীয় পর্ব

কাফ্রী দেশের রূপকথা

কঙ্গো

কেপ কলোনি

দক্ষিণ আফ্রিকা

বলকান্ দেশের রূপকথা

এক গাঁ। গাঁয়ে থাকে তিন ভাই। সম্পত্তি বলতে আছে তাদের একটি নাশপাতির গাছ। ঐ গাছটি ছাড়া তুনিয়ায় তাদের আর কিছু নেই! তিন ভাই পালা করে' পরের ক্ষেতে চাষ করে, ঘরে এসে গাছটি চৌকি দেয়। বড় যেদিন চৌকি দেয়, মেজো আর ছোট সেদিন ক্ষেতে বেরোয় কাজ করতে; মেজো পরের দিন দেয় গাছ চৌকি, বড়-ছোট ক্ষেতে কাজ করে। আর ছোটর যেদিন গাছ চৌকি দেবার পালা, বড়-মেজো যায় ক্ষেতের কাজে। এমনি ভাবে তাদের দিন কাটে।

একদিন বিধাতা-পুরুষের কি খেয়াল হলো, একজন দেবতাকে তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন। বলে দিলেন,—কি করে' ওদের তিন ভাইয়ের দিন কাটে, কী ওরা চায়—সব জেনে এসে আমাকে বলবে···ওদের যদি কোনো তুঃখ থাকে, দেখবো, সে-তুঃখ ঘোচাতে পারি কি না!

চর-দেবতা এলেন তুঃখী ভিখিরীর বেশে······সেদিন বড় ভাইয়ের পালা। বড় দিচ্ছে গাছ চৌকি। চর-দেবতা শুনলেন, মেজো আর ছোট ক্ষেতে গেছে খেটে পয়সা রোজগার করতে।

গাছের ফলে তিন ভাইয়ের সমান ভাগ। ভিখিরী-দেবতা ভিক্ষা চাইলো। বড় তার নিজের ভাগের ফলগুলি ভিখিরীকে দিলে, দিয়ে বললে—আমার ভাগে যত ফল ছিল, তোমাকে দিলুম। বাকী ফল আমার মেজো আর ছোট ভাইয়ের, তা থেকে তো দিতে পারবো না।

ভিখিরী-দেবতা বড়র দেওয়া ফলগুলি নিলেন—নিয়ে বড়কে আশীর্ব্বাদ করে' চলে গেলেন।

পরের দিন তিনি আবার এলেন। সেদিন মেজো দিচ্ছে গাছ চৌকি। ভিখিরী ভিক্ষা চাইলো······মেজো দিলে তাঁকে নিজের ভাগের সব ফল। ভিখিরী-দেবতা ফল নিয়ে মেজোকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। তার পরের দিন ছোট দিচ্ছে গাছ চৌকি··· ভিখিরী-দেবতা এসে ভিক্ষা চাইলেন······ছোট দিলে তাঁকে ছোটর ভাগের সব ফল।

চার দিনের দিন চর-দেবতা আবার এলেন। এবারে এলেন সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে। তখনো ভোরের সূয্যি ওঠেনি। এসে তিন ভাইকে ঘরে পেলেন। তিনজনকে তিনি ডাকলেন, ডেকে বললেন—তিন ভাইয়ে আমার সঙ্গে এসো দিকিনি···তোমাদের বরাত ফিরিয়ে দেবো···তাহলে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারবে।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে তিন ভাই অবাক···তিনজনে চললো সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসী এলেন এক নদীর ধারে। নদীর জলে এমন তোড় যে একটা কুটো ফেললে সেটা সাত-টুকরো হয়ে যায়! তিন ভাইকে সন্ন্যাসী বললেন,—কী তোমরা চাও, বলো···আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করবো। সন্ন্যাসীর কথায় বড় বললে,—আমি চাই, এই নদীর জল এখনি হোক টাট্‌কা মদ···আর আমি হই সেই মদ-নদীর মালিক।

সন্ন্যাসী বললেন—তথাস্তু।

নদীর অথৈ জল···চকিতে অমনি হলো মদ! জল নয়—দু-কূল ছাপিয়ে মদের স্রোত বইছে। সঙ্গে সঙ্গে নদীর দুই কূল জুড়ে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হলো···তাদের সঙ্গে রাশ-রাশ পিপে···লাখ লাখ বোতল। এসেই তারা নদী থেকে মদ তুলে টকাটক্ সব পিপে ভরতে লাগলো; পিপে থেকে বোতলে ভরা। নদীর দু-কূল জুড়ে নিমেষে হলো সহরের পত্তন, আর সে সহরে ঘর-বাড়ী-বাগান···পথ-ঘাট-মাঠ—সে-সব ঘর-বাড়ীতে হাজার-হাজার মানুষের বসতি—আর মাঠে বাটে মদের বড় বড় ভাঁটী উঠলো!

বড়কে সন্ন্যাসী বললেন—তোমার ইচ্ছা পূরণ করেছি···খুশী হয়েছো তো?

এক-মুখ হেসে সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বড় বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ!

তার পর মেজো আর ছোট ভাইকে নিয়ে সন্ন্যাসী এলেন প্রকাণ্ড এক চাষের ক্ষেতের সামনে। ক্ষেত জুড়ে লাখ-লাখ ঘুঘু পাখী ফশল খুঁটে খাচ্ছে! সন্ন্যাসী মেজোকে বললেন—তোমার কী ইচ্ছা, বলো—আমি সে-ইচ্ছা পূরণ করবো।

মেজো বললে—আমি চাই, ঐ ঘুঘু পাখীগুলো এখনি হোক ভেড়ার পাল···আর আমি সেই ভেড়ার পাল আর এই ক্ষেতের মালিক হই।

সন্ন্যাসী বললেন—তথাস্তু!

সন্ন্যাসীর 'তথাস্তু' বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই লাখ-লাখ ঘুঘুপাখী চক্ষের পলকে হয়ে গেল লাখ-লাখ ভেড়া। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এলো হাজার-হাজার মেয়ে। তাদের হাতে দুধের বালতি। মেয়েরা এসেই সব বালতি নিয়ে ভেড়ার দুধ দুইতে বসলো···দুধ দোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-দুধ ঢালা হলো বড় বড় সব কড়ায়। দুধ থেকে তৈরী হতে লাগলো ক্ষীর, সর, ননী, ছানা, চীজ।

ক্ষেতের একদিকে গড়ে উঠলো কসাইখানা···সেখানে বসলো হাজার-হাজার কসাই······ভেড়া কেটে ভেড়ার মাংস বেচতে; আর-এক দিকে হলো পশমের কারখানা···দেশ-বিদেশে চালান যেতে লাগলো পশম···দুধ···ক্ষীর-সর···ননী···ছানা-চীজ···

সন্ন্যাসী মেজোকে বললেন—খুশী হয়েছো?

এক-মুখ হেসে মেজো বললে—খু-উ-ব খুশী!

ছোটকে নিয়ে সন্ন্যাসী আবার চলা সুরু করলেন। চলে চলে ক্ষেত পার হয়ে···ধূ-ধূ খোলা জায়গায় এসে ছোটকে বললেন—এবারে তোমার কী ইচ্ছা, বলো?

ছোট বললে—আমি চাই খুব ভালো ঘরের একটি রূপবতী গুণবতী কন্যাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতবো···এ ছাড়া আমার আর কোনো সাধ নেই!

সন্ন্যাসী একটু মুস্কিলে পড়লেন। ভুরু কুঁচকে বললেন—তাইতো বাপু, তুমি দেখছি, ফ্যাসাদ বাধালে! গুণবতী হবে আবার রূপবতী হবে, এমন কন্যা পাওয়া সহজ নয়। যার রূপ থাকে, তার গুণ থাকে না···আবার যে গুণবতী হয়, তার রূপ থাকে না।···রূপবতী-গুণবতী কন্যা বিধাতা-পুরুষ তিনটি মাত্র সৃষ্টি করেছেন। সে তিনজনের মধ্যে দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে···বাকী কন্যার বিয়ের জন্য পাত্র-বাছাই চলেছে। হাজার হাজার পাত্রের মধ্যে দুটি পাত্র পাওয়া গেছে—সে দুটির মধ্যে কোন্‌টির হাতে কন্যা দেওয়া হবে, এখনো ঠিক হচ্ছে না!

ছোট কোনো জবাব দিলে না···সন্ন্যাসীর পানে শুধু তাকিয়ে রইলো।

সন্ন্যাসী একটা নিশ্বাস ফেললেন, নিশ্বাস ফেলে বললেন,—এসো, দেখা যাক সেখানে চেষ্টা করে! যখন বলেছি তোমার ইচ্ছা পূরণ করবো···

ছোটকে নিয়ে সন্ন্যাসী চলতে লাগলেন। তিন দিন তিন রাত চলে-চলে' কত সহর, নদী, বন পার হয়ে চার দিনের দিন দুজনে এলেন মস্ত এক সহরে। সহরের বুকে তিন-তলা প্রকাণ্ড বাড়ী···সেই বাড়ী দেখিয়ে সন্ন্যাসী ছোটকে বললেন—সে মেয়ে থাকে ঐ বাড়ীতে। এসো, ফটকে ঢুকি।

ফটক পার হয়ে ছোটকে নিয়ে সন্ন্যাসী এলেন······ভিতরে চমৎকার একখানি সাজানো ঘরে। ঘর একেবারে মানুষের ভিড়ে ঠাশা। কত রাজা-রাজড়া কোটাল-সদাগর···পণ্ডিত, গরীব···কত রকমের মানুষ যে এসেছে!···ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুজন রাজপুত্র···দুজনের হাতে একটি করে আপেল! আপেল হলো পাত্রের নিশানা।···

রাজপুত্র দুজন হাতের আপেল রাখলেন···সিংহাসনের সামনে সোনার থালা ছিল, সেই থালার উপর।

সিংহাসনে বসে রাজা। আপেল রেখে দুই রাজপুত্রই রাজাকে বললেন—আমাদের দুজনের মধ্যে বেছে নিন মহারাজ, একজনকে—কন্যা দান করবার জন্য।

রাজা চুপ করে আছেন···সন্ন্যাসী এদিকে চুপি-চুপি ছোটর হাতে একটা আপেল দিয়ে তাকে করলেন ইশারা। সে-ইশারায় ছোট তার হাতের আপেল রাখলো সিংহাসনের সামনে সেই

সোনার থালায়—রেখে ছোট বললে—আমিও এসেছি মহারাজ, আপনার রূপবতী গুণবতী কন্যাকে বিয়ে করতে।

রাজার দু'চোখ কপালে উঠলো! তিনি বললেন—সর্ব্বনাশ! দু-দুজন রাজপুত্র কবে থেকে এসেছেন…এ দুজনের মধ্যেই ঠিক করতে পারছি না, কার হাতে কন্যা দেবো—তার উপর আবার তুমি—যার মানে, তিনজন!

রাজা চাইলেন মন্ত্রীর পানে, বললেন,—এখন উপায় কি মন্ত্রী?

মাথা চুলকে মন্ত্রী বললেন,—এ ছেলেটির সম্বন্ধে কোনো কথা উঠতে পারে না, মহারাজ… ওঁরা দুজনে হলেন রাজপুত্র। ওঁদের কথা আলাদা! আর এ ছেলেকে দেখছি দুঃখী গরীব…ময়লা ছেঁড়া পোষাক…দেখছেন না?

সভার লোক বলে উঠলো,—ঠিক…ঠিক…মন্ত্রী মশায় ঠিক কথা বলেছেন, মহারাজ।

সন্ন্যাসী তখন বললেন—উঁহু!…মহারাজ এমন ঘোষণা ছ্যাননি যে রাজপুত্র ছাড়া দুঃখী-গরীবের হাতে কন্যা দান করবেন না!

রাজা চিন্তিত হয়ে বললেন—হুঁ…ঠিক কথা।

সন্ন্যাসী বললেন—তাহলে আপনি রাজা…ন্যায় বিচার করতে আপনি বাধ্য। রাজপুত্র বলে যখন ঘোষণা করা হয়নি…তখন মন্ত্রীর কথায় আপনি অবিচার করতে পারেন না।

নিশ্বাস ফেলে রাজা বললেন—নিশ্চয়! রাজা হয়ে রাজার আসনে বসে অবিচার করতে পারি না! তাহলে? রাজা চাইলেন সন্ন্যাসীর পানে…

সন্ন্যাসী বললেন—এক কাজ করুন মহারাজ। তিন জনকেই আপনি পরীক্ষা করুন। সর্ত্ত হোক, তিনজনে আপনার বাগানে তিনটি আঙুরের চারা পুঁতবেন। কাল সকালে যার গাছে আঙুর ফলেছে দেখবেন, তার হাতে কন্যা দান করবেন।

সভার লোক বলে উঠলো—চমৎকার ব্যবস্থা!

রাজাও বললেন—বেশ, তাই হোক।

তিনজনে তখন রাজার বাগানে গেলেন…পাশাপাশি তিনজনে পুঁতলেন তিনটি আঙুরের চারা।

সে রাত্রে রাজ্যে কারো চোখে আর ঘুম নেই! রাজা, মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, সভাসদ…সকলে মনে মনে কত কল্পনা-জল্পনা করছেন। সবাই ভাবচেন, কখন ভোর হবে…ভোর হলে বাগানে গিয়ে সদ্য-পোঁতা গাছে আঙুর দেখবেন, না, পাতা দেখবেন!

শেষে সকাল হলো। সকলে বাগানে এলেন। এসে দেখেন, ছোটর পোঁতা চারা পেল্লায় হয়ে উঠেছে ডাল-পালা মেলে! আর সে সব ডালপালায় থোলো থোলো রসালো আঙুর…রাজপুত্রদের চারা দুটি এখনো এক হাতের বেশী বাড়েনি! আঙুরের অঙ্কুর নেই তাতে।

রাজা কি করেন! রাজা মানুষ…কথা দেছেন! রাজার কথা আর বেদের কথা…এর নড়চড় নেই—কথা রাখতেই হবে। কাজেই ছোটর সঙ্গে তিনি দিলেন রাজকন্যার বিয়ে।

বিয়ের পরে ছোটকে আর রাজকন্যাকে নিয়ে সন্ন্যাসী এলেন বনে। ছোটকে বললেন—লোকালয়ের বাইরে এই গভীর বনে এখন তোমাকে থাকতে হবে। তুমি বলেছিলে, ভালো ঘরের রূপবতী গুণবতী কন্যাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতবে, তা ছাড়া তোমার আর অন্য কামনা নেই …মনে আছে?

ছোট বললে—মনে আছে বৈ কি! বনেই আমি থাকবো এবং খুব খুশী-মনে।

—তাই থাকো।

সন্ন্যাসী চলে গেলেন। ছোট বাস করতে লাগলেন বনে রূপবতী গুণবতী রাজকন্যা বৌয়ের সঙ্গে।

দিন যায়…মাস যায়…বছর যায়।

বিধাতা-পুরুষ ডাকলেন চর-দেবতাকে……বললেন—ওহে, একবার পৃথিবীতে যাও, গিয়ে সেই তিন ভাইকে দেখে এসো…ইচ্ছা পূরণ করিয়ে কে কতখানি সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করছে! দেখে এসে আমাকে খবর দেবে। যদি ছাখো, দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে তার প্রতিবিধান করতে হবে-তো।

বিধাতা-পুরুষের কথায় চর-দেবতা আবার এলেন পৃথিবীতে—এলেন দীন ভিখিরী সেজে।

প্রথমে গেলেন বড়র কাছে। গিয়ে বড়কে বললেন—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, বাবা—তোমার দেখছি মদের সুমুদ্দুর! এ সুমুদ্দুর থেকে এক বোতল মদ যদি আমাকে খেতে দাও!

কথা শুনে বড় খিঁচিয়ে উঠলো, বললে—বটে! ট্যানাপরা ভিখিরী…ওঁকে দিতে হবে এই দামী মদ খেতে! যা, যা, দেশে অনেক পুকুর আছে; নালা আছে, বিল আছে, খাল আছে, সেখানে গিয়ে আঁজলা ভরে জল খেগে যা।

বড়র কথায় চর-দেবতার গা উঠলো জ্বলে…মদ-নদীর দিকে চেয়ে তিনি বাতাসে দিলেন মন্ত্র ছেড়ে! দেখতে দেখতে নদীর মদ চক্ষের পলকে হলো সাদা জল!

ব্যাপার দেখে বড় অবাক! বললে—এ কি হলো, এঁ্যা? তুই তো ভিখারী নোস্…ফুশ-মন্তর-জানা ভেলকিবাজ্!

চর-দেবতা বললেন—এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার যোগ্যতা তোমার নেই। এ ঐশ্বর্য্য তোমায় সাজে না! তাই তুমি যা ছিলে, আজ থেকে তাই থাকবে…পরের ক্ষেতে জন-মজুরী করে দিন কাটাও গে।

এ কথা বলে চর-দেবতা আর এক-মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়ালেন না—সোজা এলেন মেজোর কাছে। এসে মেজোকে বললেন—গরীব ভিখিরী মানুষ, বাবা! না খেতে পেয়ে চলতে পাচ্ছি না! তোমার এমন ক্ষীর-সর-ননীর ভাণ্ডার, আমাকে দেবে একটু ছানা খেতে? তাহলে গায়ে গত্তি পাবো।

কথা শুনে মেজো উঠলো ক্ষেপে—বললে,—বটে! বটে! বটে! ওরে আমার সৌখীন ভিখিরী রে…ক্ষীর-সর-ননী-ছানা খাবেন? ভাগ্ এখান থেকে…না হলে ছাই দেবো তোর মুখে গুঁজে…হতভাগা ছুঁচো!

চর-দেবতার দু' চোখে জ্বললো আগুন! তিনি বললেন—হুঁ, ছাই! আগের কথা ভুলে গেছ,
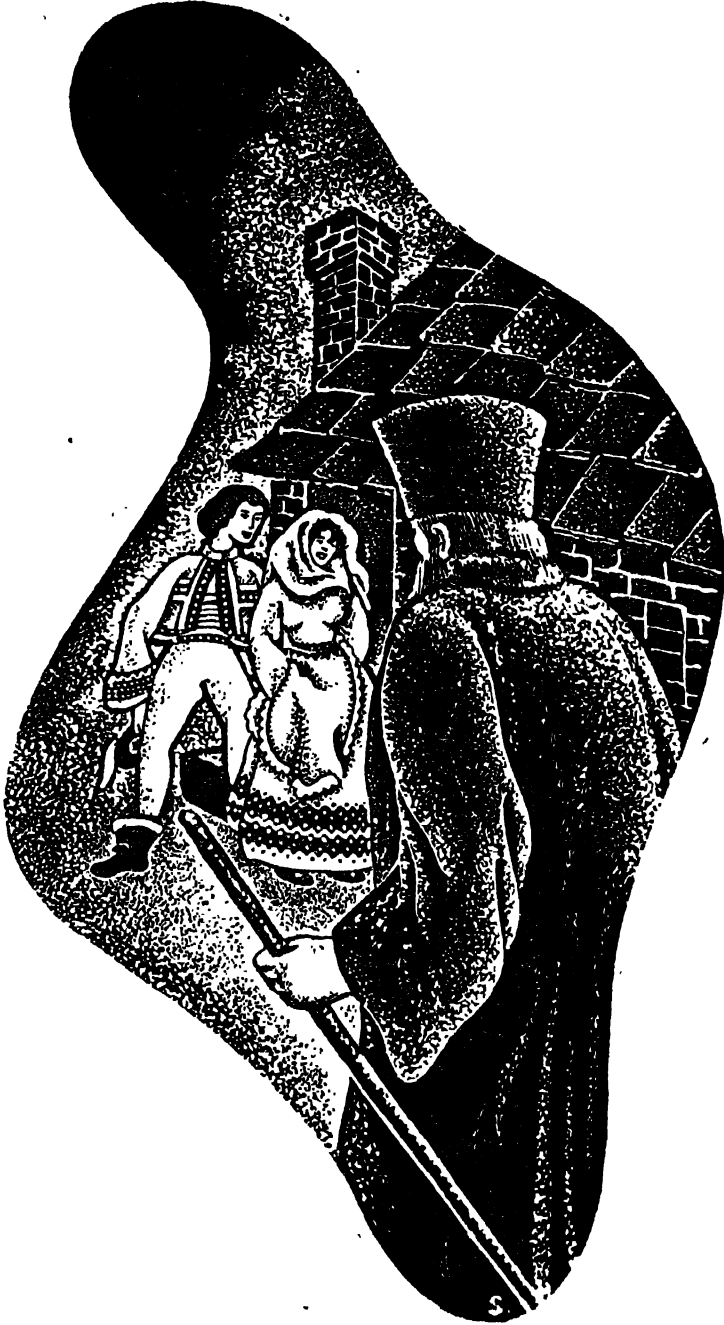
ঐশ্বর্য্য পেয়ে! এ সব ভোগ করবার মানুষ তুমি নও যাও, আবার সেই গাছ চৌকি দাও গে আর পরের ক্ষেতে কষে লাঙল টানো গিয়ে।

দেখতে দেখতে কোথায় গেল উবে মেজোর অমন বোল্‌-বোলাও ভেড়ার কারবার! ঝড়ের মুখে ধূলোর মতো ক্ষীর-সর-ছানা-চীজের পাহাড় গেল বাতাসে মিলিয়ে! মেজো গিয়ে বসলো সেই নাসপাতি গাছের তলায় গাছ চৌকি দিতে।

তার পর চর-দেবতা এলেন সেই গভীর বনে ছোটর কাছে···দীন ভিখিরীর বেশে।

ছোট থাকে পাতার কুঁড়েয়। কুঁড়ের চাল ফুঁড়ে জল ঝরে পড়ে···বাঁশের বেড়ার ফাটল দিয়ে হি-হি করে ঘরে ঢোকে হিম। দরজায় দাঁড়িয়ে চর-দেবতা বললেন—আমি ভিখিরী মানুষ···ছুটি ভিক্ষে পাই, বাবা।

ভিখিরীকে দেখে ছোট আর ছোটর বৌ রূপবতী গুণবতী কন্যা বেরিয়ে এলেন···বললেন—আমরা গরীব মানুষ বাছা, কি-বা তোমাকে দেবো, বলো? তবু নিজেদের জন্য যা তৈরী করেছি, এনে দি, তুমি খাও।

চর-দেবতা বললেন—আমাকে তা দাও যদি, তাহলে তোমরা কী খাবে?

গুণবতী কন্যা বললেন—আমরা রোজ খাই। একদিন না খেলে কিছু হবে না। তুমি কতদিন উপোসী আছো···তুমি খাও।

এ কথা বলে চর-দেবতার সামনে ছোট পাতা পেতে দিলেন···গুণবতী কন্যা এনে দিলেন সে-পাতে অন্ন।

খেয়ে খুশী হয়ে চর-দেবতা বললেন—রাজ-রাজ্যেশ্বর হও বাবা! আর তুমি হও মা, রাজ-রাণী···

কথা শেষ করেই চর-দেবতা বাতাসে মিশে অন্তর্ধান হলেন!

দেখতে দেখতে বনের গাছপালা গেল সরে—আর সেখানে গড়ে উঠলো সাত-মহলা রাজপুরী··· পুরীতে দাস-দাসী শান্ত্রী-পাহারা পাত্র-মিত্র সভাসদ গিজগিজ করছে! ছোটকে আর গুণবতী কন্যাকে সেলাম করে সকলে জয়ধ্বনি করলো, জয় মহারাজার জয়, জয় মহারাণীর জয়!

ভাগীদার ভূত

গরীব চাষা। একদিন সে হাটে চলেছে। গোরস্থানের সামনে দিয়ে হাটে যাবার পথ। চাষা গোরস্থানের কাছে এসেছে, এমন সময় দেখে, খুব দামী পোষাক-পরা সভ্য-ভব্য এক মহাজন গোরস্থানে ঢুকে একটা গোরের উপর দমাদ্দম্ লাঠি পিট্ছে আর গোরের মাটী চারদিকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে ছিটিয়ে পড়ছে। রাগে মহাজনের চোখদুটো আগুনের মতো গন্‌গন্ করছে। চাষা অবাক! ভাবলো, মহাজন পাগল হলো না কি? চাষা ঢুকলো গোরস্থানে। ঢুকে মহাজনের কাছে এসে বললে—আপনি এ কি করছেন মশাই? গোরের মাটী তুললে যে-মানুষ গোরে আছে, তাকে পীড়ন করা হয়। এ যে মরা মানুষের উপর খাঁড়ার ঘা!

কথা শুনে মহাজন তাকালো চাষার পানে। চাষার বয়স বেশী নয়: মহাজন বললে—আমার খুশী, আমি গোরে লাঠি মারবো! তার জন্য তোমার জ্যাঠামি কেন?

চাষা বললে—জ্যাঠামি নয়। এমনি আমি বলছি, মরা মানুষকে পীড়ন করা মিথ্যে।

মহাজন বললে—জানো, এ গোরে যে-মানুষ আছে, সে কত বড় বদমায়েস! শুধু বদমায়েস কেন, জোচ্চোর! জ্যান্তে আমার কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার নিয়েছিল। তার একটি পয়সা উপুড়-হস্ত না করে মরে আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে! এখন সে টাকা উদ্ধার করবার আর উপায় নেই। আশা নেই, জানি। তবু গোর থেকে ওর হাড়-পাঁজরাগুলো তুলে লাঠির ঘায়ে গুঁড়ো করে মনের ঝাল মেটাতে চাই।...বুঝেছো বাপু, ওর গোরে আমার লাঠি মারার মানে?

চাষার মনে মায়া হলো, চাষা বললে—দেখুন, আমি গরীব মানুষ, তবু জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনা। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যেমন করে' পারি, একমাসের মধ্যে ওঁর সে কুড়ি টাকা দেনা আমি শুধে দেবো।...দোহাই আপনার, মরাকে আর মারবেন না!

চাষার কথা শুনে মহাজন চুপ করে কি ভাবলো...ভাবলো, টাকা যদি পাই, লাঠি চালিয়ে কাজ কি মিছে হাত ব্যথা করা! সে বললে—বেশ, তোমাকে ভালো মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। তোমার

কথায় মার বন্ধ করছি। কিন্তু দেখো বাপু, এ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত তোমার আশায় আমি চুপ করে থাকবো···যদি টাকা না পাই, তাহলে এ গোরের আর কিছু রাখবো না আমি!

চাষা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, টাকা দেবো যখন বলেছি, তখন ঠিক দেবো···আমার কথার খেলাপ হবে না।

লাঠি হাতে মহাজন চলে গেল...গোরের উপর মাটী চাপা দিয়ে চাষা এলো গোরস্থান থেকে বেরিয়ে।

যেমন গোরস্থানের বাইরে এসেছে, অমনি গোরের মাটী ঠেলে বেরিয়ে চাষার সামনে এসে দাঁড়ালো এক ভূত।

মূর্ত্তি দেখে চাষা শিউরে উঠলো! কিন্তু রাত নয়, দিনের বেলা,—দিনের বেলায় ভূতে ঘাড় ভাঙ্গে না···তাই সাহসে ভর করে' চাষা বললে—কে তুমি?

ভূত বললে—যার গোরে ঐ মহাজন লাঠি মারছিল···আমি ঐ মহাজনের মরা দেনদার।

চাষা ভাবলো, তাহলে সত্যি ভূত!

ভূত বললে—ওর কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার নিয়েছিলুম···নেহাৎ দায়ে পড়ে! যতদিন বেঁচে ছিলুম, কী তাগাদা না করেছে! আমার খুব অসুখ হলো, তখনো রেহাই ছায়নি।...এখন গোরের মাটী খুঁড়ে আমার হাড়গুলো তুলে গুঁড়িয়ে মনের ঝাল মেটাতে এসেছে!···কথায় বলে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা! জ্যান্ত থাকতে মার খেয়ে চোট লাগলে সে-চোটের চিকিৎসা চলে। এখন মরে' গেছি, গোরে রয়েছি, এখন লাঠির ঘায়ে জখম হলে না হবে তার চিকিৎসা, না কেউ দেখবে! তুমি ভাই, আমাকে আজ খুব বাঁচিয়ে দেছো···তাই আমি তোমার ঋণ শোধ করতে চাই।

চাষা বললে—বেঁচে থেকে ওর ঋণ শোধ তুমি করতে পারোনি, এখন মরে গিয়ে আমার ঋণ কি করে শোধ করবে, শুনি? তা ছাড়া তোমার কাছে কোনো-কিছুর প্রত্যাশা না করেই আমি তোমার মহাজনকে সরিয়েছি!

ভূত বললে—জ্যান্ত থাকতে আমার যে-ক্ষমতা ছিল, এখন মরে গিয়ে তার চেয়ে অনেক রকমের ক্ষমতা হয়েছে! জ্যান্ত থাকতে তোমাদের ইহলোকের কতটুকুন্ বা খবর রাখতুম! এখন মরে গিয়ে তোমাদের গোটা ইহলোক, আর আমাদের পরলোক···দু লোকের সব খপর আমার নখদর্পণে। আর তার জোরে আমি এমন কিছু করতে চাই, যাতে তুমি লক্ষপতি হবে—তোমার কোনো দুঃখ, কোনো অভাব থাকবে না।

চাষা বললে—কি করে তুমি কি করবে, শুনি?

ভূত বললে—শোনো, যা বলি। তোমার সঙ্গে আধাআধি বখরায় আমি ব্যবসা করবো। সহরে গিয়ে ব্যবসা। তখন, দেখবে কি হয়!

মুখে যে কথা, কাজেও ভূত তাই করলে। চাষার আর হাটে যাওয়া হলো না···পশরা-সমেত চাষা চললো ভূতের সঙ্গে সহরে।

সহরে গিয়ে ভূত মস্ত কারবার ফেঁদে বসলো। এমন কারবার যে তার জাঁকে সহরের আর সব কারবারীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। কাজেই চাষা-ভূত কোম্পানি হয়ে উঠলো লালে লাল। ছ'মাসে কারবার ফেঁপে ফুলে যেমন ঐশ্বর্য্য, তেমনি নাম!

চাষা তখন ভূতকে বললে—ভারী একটা ইচ্ছা হচ্ছে, ভাই, আমার এবার...

ভূত বললে,—কি ইচ্ছা?

চাষা বললে—বেশ সুন্দর দেখে একটি মেয়ে বিয়ে করি···বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতি! ছেলে হবে, মেয়ে হবে···বেশ, সুখের সংসার!

ভূত বললে—এ আর শক্ত কি! ভালো কথা।

এখন সহরে আছে এক মস্ত বড়লোক। তার অগাধ ঐশ্বর্য্য আর অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। সেই মেয়ের বিয়ে। বিয়ে দেবার জন্য ভদ্রলোক ধনবান, গুণবান, জ্ঞানবান, রূপবান পাত্র খুঁজচেন। পাত্র আসে···পাত্রের হাতে মেয়ে দান করেন। দানের পর রাত্রে বিয়ের বাসর···বাসরে বর-কনে যায় শুতে···আর সেই বাসরে হয় বরের মৃত্যু! কোনো পাত্রকে আর সকালে বাসর থেকে জ্যান্ত বেরুতে হয় না। বড়লোকের মন বিরস...মেয়ে নির্বিকার। এ খবর দেশ-বিদেশে রটে গেছে তবু বড়লোকের দোরে পাত্র আসার কামাই নেই···রোজ-রোজ নতুন পাত্র আসছে।

চাষা এসে বড়লোকের দোরে দাঁড়ালো পাত্র সেজে। চাষার অনেক টাকা···মস্ত কারবারী বলে দেশজোড়া নাম। চাষাকে বড়লোক বললে—কিন্তু শুনেছো তো বাপু, পাত্রের ভাগ্যে বাসর রাত কোনো কালে পোয়ালো না!

চাষা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে খপর শুনেছি বৈকি।

বড়লোক বললে—তবু তোমার সাহস হয় এ-মেয়েকে বিয়ে করতে?

চাষা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবু সাহস হয়।

বড়লোক বললে—কিন্তু বাসর?

চাষা বললে—সে আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক করে নেবো।

নিশ্বাস ফেলে বড়লোক বললেন—বেশ। বিয়ের হাড়কাঠে গলাও তবে তোমার মাথা।

সন্ধ্যার সময় কন্যা-দান। বাজনা-বাদ্যি লোকজনের সোরগোল সেই নিত্যদিনের মতো।

চাষা বিয়ে করতে বেরুবে···তার কাণে কাণে ভূত দিলে উপদেশ—মেয়েকে বিয়ে করবে বলে' যখন জেদ ধরেছো, তখন করো বিয়ে। মোদ্দা খুব হুঁশিয়ার, কন্যা-দানের পর কনের সঙ্গে বাসরে ঢুকবে না, খবর্দ্দার! বলবে, আমাদের বাড়ীর নিয়ম, দানের রাত্রে কনের সঙ্গে বাসরে থাকা বারণ। এ কথা বলে তুমি বাসরের বাইরে শোবে। শুয়ে ঘুমোবে না, সজাগ থাকবে। আমার এ কথা মেনে যদি চলতে পারো তবেই রক্ষা পাবে। তার পর ভোরে তাঞ্জাম নিয়ে আমি থাকবো

বাড়ীর দরজায় হাজির...কনের চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে সেই তাঞ্জামে তুলবে—তুলে সোজা একেবারে নিজের বাড়ী! বুঝলে?

চাষা বললে—হুঁ, তোমার কথা শুনবো। বিয়ে করে বৌ নিয়ে আমি সংসার করতে চাই, মরতে চাই না।

তাই হলো। কন্যা-দান হলো। এবার বাসর। চাষা বললে,—আমাদের বাড়ীর নিয়ম দানের রাত্রে বাসরে ঢুকতে নেই...বাসরের বাইরে একলা শুতে হয়। আমি তাই শোবো।

নিয়ম যখন, মানতেই হবে। বরকে বাসরে যেতে হলো না···দু'চোখে আগুন জ্বেলে কটমট করে বরের পানে চেয়ে কনে একা বাসরে গেল শুতে। বাসর-ঘরের বাইরের বারান্দায় বরের বিছানা··· বর শুলো সেই বিছানায়। শুয়ে সারা রাত মট্কা মেরে পড়ে রইলো।

রাতের পর সকাল···ভূত এসে দোরে হাজির···সঙ্গে তাঞ্জাম।

বর বললে—আমাদের বাড়ীর নিয়ম, কনের ঝুঁটি ধরে তাঞ্জামে তুলতে হয়।

নিয়ম...আরে ব্যস্, তাহলে তো মানতেই হবে। মেয়ের বড়লোক বাবা সেকেলে মানুষ, নিয়ম ভাঙ্গতে পারেন না! কনের মাথার ঝুঁটি ধরে কনেকে চাষা ভূতের তাঞ্জামে তুললো।

তারপর বাড়ী। বর নামলো, কনে নামলো তাঞ্জাম থেকে। ভূত বললে—মনে আছে, কারবারে তুমি আমি আধাআধি ভাগীদার?

চাষা বললে—নিশ্চয়।

ভূত বললে—তাহলে তোমার কনের উপর আমারো অর্দ্ধেক ভাগ আছে। কাজেই কনেকে দু-টুকরো-কেটে ঠিক অর্দ্ধা-অর্দ্ধি করতে হবে···কেটে এক-টুকরো তুমি নেবে, আর এক-টুকরো নেবো আমি।

এ-কথা বলে ভূত প্রকাণ্ড একখানা ধারালো ছোরা নিয়ে এলো। কনে শুনেছে ভাগাভাগির কথা—তার পর দেখে, এত বড় ছোরা! ভয়ে সে ভয়ানক চীৎকার করে উঠলো।

যেমন চীৎকার···কনের হাঁ থেকে বেরিয়ে এলো ফণা-তোলা প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ!

সাপটাকে সাপ্‌টে ধরে ভূত তখনি সেই ছোরা মেরে সাপের মাথাটা ফেললে কেটে...তার পর দেহখানা কেটে কুচি কুচি! মেঝেয়-পাতা দামী গাল্‌চের উপর রক্ত ছিটিয়ে পড়লো।

চাষা অবাক! কনের দুচোখ ড্যাবড্যাব করছে! হেসে ভূত বললে—ঐ সাপটাকে আমি নিলুম ভাই আমার ভাগে···কনেটিকে পুরোপুরি তুমি তোমার ভাগে নাও। জানো, দুনিয়ায় অনেক মানুষ আছে···বাইরে থেকে দেখবে যেমন রূপ, তেমনি কথাবার্ত্তা! কিন্তু তাদের মনের মধ্যে অহঙ্কার আর ঘৃণার বিষ। ঐ অহঙ্কার আর ঘৃণা অজগর সাপ হয়ে তাদের মনে থাকে। রূপের অহঙ্কারে, বাপের টাকার অহঙ্কারে কনে দুনিয়ার আর-সব মানুষকে ঘৃণা করতো। ঐ ঘৃণা আর অহঙ্কার সাপ···তার বিষে

বাসরে পাত্রদের মেরেছে। এখন সাপ মরে গেছে! কনের মনের অহঙ্কার ঘৃণা গেছে নিঃশেষ হয়ে। আর ভয় নেই...কনে এখন থেকে হবে লক্ষ্মী। এ কনেকে নিয়ে তুমি সুখে ঘর-সংসার করো।

চাষা বললে—আর তুমি···

চাষার কথা শেষ হলো না···ভূত বললে—আমি আর ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না, পরলোকে চলে যাবো। কারবারে আমার যে অর্দ্ধেক ভাগ, সে ভাগটুকু তোমাকে দিলুম তোমার বিয়েয় যোতুক। আজ থেকে আমাদের কারবারের তুমি হলে পুরো মালিক।

এ কথা বলে চাষার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ভূত গেল বাতাসে মিলিয়ে···

চাষা আর কনে···দু-জনে তার গোরের উপর শ্বেত-পাথরের স্তম্ভ গড়িয়ে দিলে—ভাগীদার ভূতের ভালোবাসার স্মৃতি!

এখান থেকে অনেকখানি দূরে রাজ্য। রাজ্যের রাজার তিন ছেলে। তিন ছেলেই ডাগর হয়েছে। একদিন ছেলেদের ডেকে রাজা বললেন—তিনজনেই তোমরা বড় হয়েছো···এখন আর ঘরে বসে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তিনজনে বেরোও...সারা পৃথিবী ঘুরে তিনজনে মনের মতো তিনটি কন্যা দেখে বিয়ে করে রাজ্যে এসো।

তিন ছেলেকে রাজা দিলেন টাকা-কড়ি, পোষাক-আশাক; আর বেশ ভালো তিনটি তেজী ঘোড়া। নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়ে তিন রাজপুত্র বেরুলেন তিন কন্যার সন্ধানে।

বড় আর মেজো রাজপুত্রকে বেশী দূরের রাজ্যে যেতে হলো না। কাছাকাছি দুটি রাজ্যের দুই রাজার ছিল একটি একটি কন্যা···ছেলে ছিল না। বড় মেজো বিদ্যা শিখেছেন···সুন্দর চেহারা—চমৎকার বুদ্ধি—তায় রাজার ছেলে···তাঁরা দুজনে সেই দুই রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পর জামাইদের দুই শ্বশুর বললেন—নিজেদের রাজ্যে নাই বা আর রইলে! আমরা মরে গেলে তোমরা দু-ভাইয়ে এ দুই রাজ্যে রাজত্ব করবে। মা-বাপকে বৌ দেখিয়ে আবার ফিরে এসো।

বড় মেজো রাজপুত্র বাপের রাজ্যে ফিরলেন। দুজনেরি বৌ মোটা সোটা—দুজনে আনলেন অনেক টাকা যৌতুক আর কত যে আসবাব-পত্র।···বাপ-রাজা মহাখুশী...মা-রাণী বৌ বরণ করলেন। যৌতুকের জিনিষ-পত্র রাজা তুললেন নিজের তোষাখানায়।

ছোট রাজপুত্রের কিন্তু ফেরবার নাম নেই! কবে সেই ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছেন...ছ মাস কাটলো, আট মাস কাটলো...তাঁর কোনো উদ্দেশ নেই!

ঘোড়ায় চড়ে ছোট রাজপুত্র চলেছেন, চলেছেন, চলেছেন···কত রাজ্য পার হলেন···কত দেশ ···কত মহাদেশ...মনের মতো পাত্রী আর কোথাও পান না!

চলতে চলতে শেষে তিনি এলেন এক ধু-ধূ প্রান্তরে। প্রান্তরের কোনো দিকে জন প্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই। শুধু জলা আর জঙ্গল···পুকুর আর ডোবা। জীব বলতে আছে কেবল পোকা আর মাকড়, ফড়িং আর প্রজাপতি···আর পাখী, ইঁদুর, সাপ, বিছে, ব্যাঙ···এই-সব।

ঘুরে ঘুরে কোথাও মানুষের সন্ধান না পেয়ে ছোট রাজপুত্র ফিরুবেন বলে ঘোড়া থেকে নামলেন এক ডোবার ধারে। নেমে ডোবা থেকে এক-আঁজলা জল নিয়ে খেলেন। নিজে খেলেন, নিজের ঘোড়াকেও খাওয়ালেন। জল খাওয়া হলে রাজ্যে ফিরবেন বলে ঘোড়ার পিঠে চড়বেন, এমন সময় শুনলেন, খুব চাপা গলায় কে ডাকছে—গ্যাঙর গ্যাঙ···গ্যাঙর গ্যাঙ...

ছোট রাজপুত্র দেখেন, ডোবা থেকে উঠে ছোট্ট একটি ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে তাঁর দিকেই আসছে! ব্যাঙের গায়ে সোনার রঙ···ব্যাঙটি দেখতে চমৎকার! ব্যাঙের পানে চেয়ে ছোট রাজপুত্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্যাঙ কাছে এলো। এসে ব্যাঙ বললে—কাদায় থুপ্ থুপ্ করে চলে' আমার পা ধরে গেছে রাজপুত্র...আমাকে তোমার ঘোড়ার পিঠে তুলে নেবে? তাহলে তোমার সঙ্গে আমি অনেকখানি পৃথিবী দেখে আসি।

ব্যাঙের কথা শুনে রাজপুত্রের মায়া হলো। আহা বেচারী! ছোট্ট ডোবার এক কোণে পড়ে আছে! এত বড় পৃথিবীর কোথায় কি আছে, জানতে চায়···জানতে পারচে না!

তিনি বললেন—এসো, তোমাকে আমার ঘোড়ার পিঠে তুলে বসাই···বসিয়ে বেড়িয়ে আনি।

ব্যাঙকে ছোট রাজপুত্র নিলেন তুলে...নিয়ে নিজের কাঁধে তাকে বসালেন···বসিয়ে ব্যাঙকে বললেন—ঘোড়া এবার ছুটবে···তুমি বেশ করে আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরে থাকো...ভয় পেয়োনা। পথে কত কি নতুন নতুন জিনিষ দেখবে'খন!

ঘোড়া ছুটিয়ে ছোট রাজপুত্র রাজ্যে ফিরলেন। আইবুড়ো কার্ত্তিক এলো ফিরে...বৌ আনেনি, যৌতুক আনেনি···দেখে রাজা আগুন! বললেন—ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেয়ে ফিরলে!···আমি যা বলে দিয়েছিলুম...বৌ কোথায়?

ছোট রাজপুত্র বললেন—অনেক রাজ্যই তো ঘুরে দেখলুম...মনের মতো কন্যা কোনো রাজ্যে পেলুম না।

—বটে! পেলে না! রাজা দিলেন হুঙ্কার। বললেন—মানুষের ঘরে কন্যা নেই···এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? এত রাজ্য···সে সব রাজ্যে এত রাজা...এত বাদশা···এত সব প্রজা···কারো কন্যা নেই?

ছোট রাজপুত্র বললেন, —না, কারো ঘরের কন্যা আমার পছন্দ হলো না!

রাজা বললেন—হুঁ!···তাঁর দু' চোখ হলো রক্তবর্ণ।

রাজা বললেন—বাপের কথা অমান্য করা! রাজার কথা অগ্রাহ্য করা! আমি প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজা...

ছোট রাজপুত্র এলেন নিজের ঘরে···এসে ব্যাঙকে নিজের হাতে খাবার দিলেন, জল দিলেন, তারপর ব্যাঙকে রাখলেন চমৎকার একটি সোনার খাঁচায়।

রাত হলো...রাজপুত্র এসে পালঙ্কে শুলেন। পালঙ্কে নরম বিছানা। খাঁচার ভিতর থেকে ব্যাঙ খুব চাপা গলায় ডাকলো,—গ্যাঙর গ্যাঙ···

রাজপুত্র উঠে ব্যাঙের কাছে এলেন···বললেন—কি চাও ব্যাঙ?

ব্যাঙ বললে,—আমার মোটে ঘুম আসছে না। নরম বিছানায় না শুলে আমার ঘুম হয় না।

এ আবদার রাজপুত্রের ভালো লাগলো না। পাখী নয়, খরগোশ নয়, ভালো-জাতের কুকুর-বেরাল নয়···ডোবার ব্যাঙ···সেই ব্যাঙের বাচ্ছা! তাকে শুতে দিতে হবে কোথায়? না, নিজের পালঙ্কে···নরম বিছানায়!···

কিন্তু কি করেন! ছোট রাজপুত্রের মন ভারী নরম···ভাবলেন, ব্যাঙের মনে যদি দুঃখ হয় এ-কথা না রাখলে। বেচারীর সত্যি যদি ঘুম না হয়! বললেন—বেশ, এসো আমার বিছানায়।

এ-কথা বলে ব্যাঙকে এনে তিনি শোয়ালেন বিছানার এক-ধারে...শুইয়ে নিজে পাশ ফিরে শুলেন। শোবামাত্র, ঘুম।

মাঝ-রাত্রে কি কারণে রাজপুত্রের ঘুম গেল ভেঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গলে চোখ মেলে তিনি দেখেন, ঘর একেবারে আলোয় আলো! শোবার সময় নিজের হাতে ঘরের বাতি নিভিয়ে দেছেন···এত আলো কোথা থেকে আসে?

পাশ ফিরলেন···পাশ ফিরে রাজপুত্র দেখেন, বিছানায় ব্যাঙ নেই! কোথায় গেল? নিঃশব্দে তিনি চাইলেন ঘরের চার দিকে! চেয়ে দেখেন, মেঝের গালচের উপর ব্যাঙের খোলশ রয়েছে পড়ে ···আর ঘরের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক পরমা সুন্দরী কন্যা! কন্যা চুল বাঁধছে।

ছোট রাজপুত্রের মনে পড়লো রূপকথার গল্প—সে গল্পে শুনেছেন পরীর কথা···ব্যাঙ কি তবে রূপকথার পরী-কন্যা? দিনের বেলা ব্যাঙ হয়ে থাকে?

চুপটি করে তিনি শুয়ে রইলেন···দু' চোখের দৃষ্টি কন্যার উপর রেখে! কন্যা জানতে পারলো না, ছোট রাজপুত্র জেগে আছেন—তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেছে!

চুল বাঁধা হলে কন্যা নিলে টেবিলের উপর থেকে ফটিক পাত্র। ফটিক পাত্রে জল ছিল...সেই জল কন্যা ছিটিয়ে দিলে ঘরের দেওয়ালে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালে ফুটলে হাজার হাজার মণি-মুক্তো। সেই সব মণি-মুক্তো নিয়ে কন্যা খোঁপায় গুঁজতে লাগলো মাথার কাঁটা করে।

ছোট রাজপুত্র আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, পা-টিপে বিছানা থেকে নেমে ব্যাঙের খোলশটা কুড়িয়ে ঘরের কোণে ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছিল, দিলেন সেই ধূপের আগুনে ফেলে। আগুনের ছোঁয়া পেয়ে খোলশ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। খোলশ পোড়ার গন্ধে কন্যার চমক ভাঙলো। কন্যা চমকে এদিকে তাকালো! তাকিয়ে যা দেখলো, ভয়ে মুখ হলো কাগজের মতো সাদা।

ছুটে তিনি রাজপুত্রের কাছে এলেন···এসে তাঁর হাত ধরে কন্যা বললেন—এ কী করলে তুমি ছোট রাজপুত্র! আমার খোলশ পুড়িয়ে দিলে! কি করে আমি আমার ডোবায় আবার ফিরে যাবো?

ছোট রাজপুত্র বললেন—কি দুঃখে ডোবায় আবার ফিরবে কন্যা? আমি রাজপুত্র···তুমি আমার মনের মতো কন্যা...আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

কন্যা বললেন—আমাকে বিয়ে করলে তুমি কক্‌খনো সুখী হবে না। আমি তো মানুষ নই—আমি পরী।

ছোট রাজপুত্র বললেন—মানুষকে বিয়ে করলে তুমি ছোট হবে? তাতে তোমার অপমান হবে?

কন্যা বললেন,—না, না, আমি ছোট হবো না, আমার অপমান হবে না···তোমার অমঙ্গল হবে···আমার জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট, অনেক অশান্তি পেতে হবে।

ছোট রাজপুত্র বললেন—হোক অশান্তি, হোক কষ্ট···তবু আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

কন্যা বললেন—তোমার বাবা-মা যদি রাগ করেন? রাজ্য থেকে তোমাকে যদি তাড়িয়ে ছান?

ছোট রাজপুত্র বললেন—তবু আমি তোমাকে বিয়ে করবো। দেরী নয়।...আজ রাত্রেই এসো, আমাদের বিয়ে হোক।

কন্যা বললেন—বেশ।

ঘরে ছিল ফুল···সেই ফুল রাজপুত্র দিলেন কন্যার মাথায়...কন্যা দিলেন রাজপুত্রের মাথায় ফুল। দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে সুন্দরী বৌ নিয়ে ছোট রাজপুত্র এসে রাজা-রাণীর সামনে দাঁড়ালেন। বৌ দেখে রাজ-রাণী অবাক!...তাঁদের চোখ আর ফেরে না!

শেষে রাজা বললেন—করেছিস কি? এ্যাঁ···রাজার ছেলে হয়ে পরীকে বিয়ে! মানুষের কাছে পরিচয় দিতে পারবি নে যে! না পেলি যোতুক...না কোনো খাতির।···তোর দুই দাদাকে ছাখ দিকিনি, দুজনে দুই রাজকন্যা বিয়ে করে এলো—আর কত যোতুক পেয়েছে বিয়েতে। আর তুই?

ছোট রাজপুত্র বললেন—তাদের বৌয়েরা কি বৌ?···যেন বুনো হাতী···মোটা ধ্যাবড়া চেহারা।

কী!···রাজা উঠলেন রেগে···কিন্তু সে-রাগ প্রকাশ না করে রাজা বললেন,—বেশ, এখন যাও···দরবারের কাজ সেরে আমি যখন অন্দরে আসবো···তখন তুমি একলা এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। ফরমাশ আছে।

দরবারের পর রাজা এলেন অন্দরে···ছোট রাজপুত্র এলেন রাজার কাছে। রাজা বললেন—তোমার বৌ সত্যিকারের পরী কিনা, তার প্রমাণ চাই।

রাজপুত্র বললেন—কি প্রমাণ চান, বলুন···

রাজা বললেন—আমার কেল্লায় প্রায় লাখো ফৌজ···তাদের খোরাক জোগাতে জোগাতে আমার তোষাখানা প্রায় খালি হতে বসেছে। তোমার বৌকে বলো, পরীস্তানে চাঁদের মতো, সূয্যির মতো বড় বড় তরমুজ ফলে···সেই তরমুজ একটা আনিয়ে দিতে হবে···আজই। সে তরমুজের গুণ, তার একটাতেই লাখো ফৌজের খাওয়া চলে···আর খাওয়ানোর পর সে-তরমুজ যেমন, আবার

ঠিক তেমনি থাকে। মানে, সে তরমুজের ক্ষয় নেই। ঐ একটি তরমুজে আমার ফৌজ-খাওয়ানোর হাঙ্গাম চুকবে। তোমার বৌ যদি এ তরমুজ আনিয়ে দিতে পারে, তবেই তোমরা দুজনে এ-পুরীতে থাকতে পাবে…না হলে তোমার আর তোমার পরী-বৌয়ের এ-পুরীতে ঠাঁই হবে না।

বাপের কথা শুনে রাজপুত্রের চক্ষুস্থির! বিরস বিবর্ণ মুখে তিনি এলেন নিজের ঘরে।

তাঁর মুখ দেখে ছোট বৌ-রাণী উতলা হলেন, বললেন—কি হলো গো তোমার? মুখ এমন শুক্‌নো!

নিশ্বাস ফেলে ছোট রাজপুত্র বললেন—বাপ-রাজার ফরমাশের কথা।

ছোট বৌ-রাণী বললেন—এর জন্য আবার ভাবনা কিসের? এখনি আমি উপায় করছি।

ছোট রাজপুত্রের দু'চোখে আতঙ্ক…বিস্ময়…ছোট বৌ রাণীর দিকে তিনি তাকালেন।

ছোট বৌ-রাণী বললেন—তোমার ঘোড়ায় চড়ে তুমি এখনি যাও সেই জলার ধারে…যে-ডোবা থেকে আমি এসেছি, সেই ডোবার পাশেই জলা। জলায় থাকে আমার দিদি পেসরিয়ানা। গিয়ে তার নাম ধরে ডেকো। তোমার পরিচয় দিয়ে দিদিকে সব কথা বলো। দিদি তখনি তোমাকে দেবে ঐ চাঁদের মতো সূয্যির মতো প্রকাণ্ড একটা তরমুজ!

ছোট রাজপুত্র আর একদণ্ড দাঁড়ালেন না—ঘোড়ায় চড়ে তখনি ছুটলেন জলায়।

জলার ধারে এলেন। এসে ডাকলেন পেশরিয়ানা দিদিকে। দিদি এলো। ছোট রাজপুত্র পরিচয় দিয়ে দিদিকে সব বৃত্তান্ত বললেন।

শুনে দিদি বললে—তা এর জন্য আবার ভাবনা কিসের? সে তরমুজ আমি এনে দিচ্ছি। সে তরমুজ তোমার বাবা তাঁর লাখো ফৌজকে রোজ রোজ খাওয়ালেও দশ' হাজার বছরে তরমুজ ফুরোবে না। ও তরমুজ শুকোয় না, হাজে না, মজে না, পচে না…ওর ক্ষয় নেই কস্মিন কালে!

ঐ কথা বলে' দিদি প্রকাণ্ড একটা তরমুজ নিয়ে এলো। এত বড় তরমুজ যে জলা-জঙ্গলের ও-দিকটা তরমুজের আড়ালে চাপা পড়লো! দিদি বললে—তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপুরীতে চলে যাও। হাওয়ায় উড়িয়ে আমার লোক এ-তরমুজ তোমার বাবার পুরীতে পৌঁছে দেবে। তোমার পুরী পৌঁছুবার আগেই আমার তরমুজ গিয়ে সেখানে পৌঁছুবে।

তাই হলো। তরমুজ দেখে রাজার দুচোখ কপালে উঠলো!…তবু রাগের চোটে তিনি যা নয় তাই বললেন। বললেন—এ তো সামান্য একটা তরমুজ! তরমুজ আনা থেকে পরীর পরীত্ব প্রমাণ হয় না। এখন আমার চাই ঐ লাখো ফৌজের জন্য রোজ এক কোটী করে আঙুর। তোমার বৌ যদি এমন আঙুরের ব্যবস্থা করতে পারে, তবেই বুঝবো, পরী…আর তাহলেই তোমরা পুরীতে থাকবে…নাহলে আমার রাজ্যে তোমাদের ঠাঁই হবে না!

ছোট রাজপুত্র এসে ছোট বৌ-রাণীকে এ কথা বললেন। শুনে ছোট বৌ-রাণী হাসলেন। হেসে তিনি বললেন—তুমি এক কাজ করো—যে-জলায় গিয়েছিলে আমার বড়দির কাছে…সেই জলার

পরেই দেখবে প্রকাণ্ড নদী···সেই নদীতে থাকে আমার মেজদি দারিয়ানা···তাকে ডেকে পরিচয় দিয়ে এ-কথা বলো। তোমার বাবার ফৌজের জন্য আঙুরের ব্যবস্থা সে করবে।

ছোট রাজপুত্র তখনি ছুটলেন ঘোড়ায় চড়ে নদীতে মেজদি দারিয়ানার কাছে। পরিচয় দিয়ে তাকে সব কথা বলতে মেজদিদি দিলে আঙুর-গাছ···ঠিক রাজা যেমন চেয়েছিলেন।

আঙুর গাছ আর সে-গাছে আঙুরের ফলন দেখে রাজা শুধু অবাক হলেন না...তাঁর মনে জাগলো ভয়। পরী নিয়ে এক-পুরীতে বাস ···তার উপর সেই পরীকে তিনি চটিয়ে দেছেন! কখন কি করে' কি ফ্যাশাদ বাধাবে···

কিন্তু ভালো কথায় বিদায় করেন কি করে'? আকাশ-পাতাল অনেক ভেবে রাজা করলেন এক বেয়াড়া ফরমাশ। বললেন—বেশ, আমার তরমুজ এলো···আঙুর-গাছ এলো···এবার আমাকে এনে দাও সেই বাঁটুলকে। শুনেছি, ঐ পরী-রাজ্যে থাকে বাঁটুল। মাথায় এক-আঙুল লম্বা···এই এতটুকুনটি! কিন্তু তার মুখে তিনকোশ-লম্বা দাড়ি...তার সে দাড়ির ভয়ে তিনদশে-তিরিশ কোশের মধ্যে শুনেছি কোনো দুশমন ঘেঁষতে পারে না! সেই বাঁটুলকে এনে দিতে পারলে আমার রাজ্য নিরাপদ হবে...আর তোমরা পাবে এ রাজ্যে ঠাঁই। না হলে দুজনকে গর্দ্দানা দিতে হবে!

ফরমাশ শুনে ছোট রাজপুত্রের প্রাণ গেল উড়ে! বাঁটুলের গল্প তিনিও শুনেছেন...ছেলে-বেলায় দিদিমার কাছে। সে একেবারে একের-নম্বর বদমায়েস দৈত্য। দেখতে এতটুকুনটি হলে কি হয়, তার ঐ তিন তিনকোশ লম্বা দাড়ি বুলিয়ে সে হাজার হাজার মানুষের জান্ নিতে পারে!

মলিন মুখে ছোট রাজপুত্র এসে ছোট বৌ-রাণীকে এ কথা বললেন। শুনে তিনিও নিশ্বাস ফেললেন। নিশ্বাস ফেলে বললেন—তাইতো! এবারকারের এ ফরমাশ যে ভয়ানক শক্ত রকমের। ···তা যাক, বসে ভাবলে চলবেনা। তুমি এক কাজ করো···আমার বাবার কাছে যাও। আমার বাবা হলো কট্‌কটে-ব্যাঙ···ঐ সব জলা-ডোবা-নদীর রাজা। গিয়ে আমার বাবাকে তুমি সব কথা বলো। বাবা ঠিক এর বিহিত করে দেবে। ···মেজদি যে-নদীতে থাকে, সেই নদীর মোহনায় থাকে বাবা। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! শুনেছি, ঐ বাঁটুল দৈত্য এমন যে কারো পানে যদি চোখ তুলে চায়, সে-লোক তখনি দম বন্ধ হয়ে মরে যায়। আবার বাঁটুলের পানেও কারো চাইবার জো নেই···এমন ভয়ঙ্কর তার মুখ যে দেখেছো কি, বুক ফেটে মরেছো!

ছোট রাজপুত্র বেরুলেন ঘোড়ায় চড়ে শ্বশুর কটকটে ব্যাঙের উদ্দেশে।···গিয়ে শ্বশুরকে সব কথা বললেন। শ্বশুর বললে—হুঁ···বাঁটুলকে আমি এখনি ধরে আনছি। তুমি কিন্তু তার পানে যেন, খবর্দ্দার, চোখ তুলে চেয়োনা—চাইলে আর বাঁচতে হবেনা!

ছোট রাজপুত্র বললেন—তাহলে···

শ্বশুর বললে—মস্ত-বড় পাগড়ি দিয়ে তোমার চোখ চেপে বেঁধে রাখো...তাহলে দেখবার লোভ হলেও তুমি তাকে দেখতে পাবেনা।···

ছোট রাজপুত্র বললেন—বেশ…

শ্বশুর বললে—চোখ বেঁধে তুমি তোমার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসো। তোমার ঘোড়ার ল্যাজের সঙ্গে আমি তার দাড়ি কষে চেপে বেঁধে দেবো। আমার বাঁধা যেমন শেষ হবে, অমনি তুমি তোমার ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। খবর্দ্দার, পথে কোথাও দাঁড়াবেনা। বাড়ী পৌঁছে ঘোড়ার ল্যাজ থেকে বাঁটুলের দাড়ির বাঁধন খুলে সেই দাড়ি তুমি চটপট তার মুখে জড়িয়ে দেবে …জড়িয়ে একটা কেলে হাঁড়ির মধ্যে বাঁটুলকে পুরে রাখবে তিনদিন তিনরাত…তাহলেই তার চোখের বিষ যাবে কেটে, আর সে তোমার গোলাম হয়ে থাকবে। বুঝেচো?

—বুঝেচি। বলে চোখে পাগড়ি বেঁধে কানামাছি হয়ে ছোট রাজপুত্র নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন।

তার পর শ্বশুরের ইশারায় যেই বুঝলেন ঘোড়ার ল্যাজের সঙ্গে বাঁটুলের দাড়ি টাইট্ করে বাঁধা হয়েছে, অমনি তিনি ঘোড়া দিলেন ছুটিয়ে।
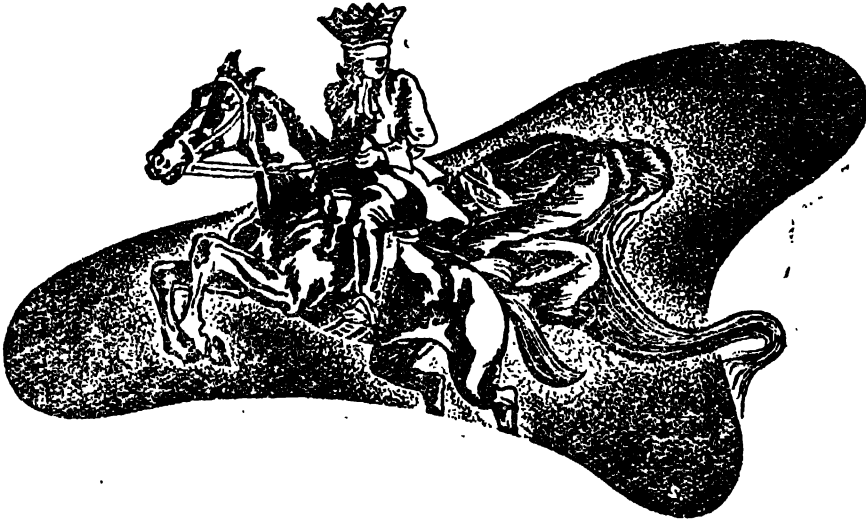
বেদম ছুটে ঘোড়া এসে দাঁড়ালো রাজপুরীর দেউড়িতে। সবে তখন ভোরের আলো ফুটছে! না জেগেছে দেউড়ির শান্ত্রী-পাহারা, না রাজপুরীর দাস-দাসীরা। ভোরে ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে রাজা এসে দাঁড়ালেন একা…দেউড়ির দিকের উপরের বারান্দায়।

ঘোড়া থামার সঙ্গে সঙ্গে ছোট রাজপুত্র শুনলেন বাপ-রাজার চীৎকার…আর সে-চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু থেকে খুব ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ! কি হলো? দেখবার জন্য চোখের বাঁধন তিনি খুললেন না—ঘোড়া থেকে নামলেন; নেমে শ্বশুর যেমন বলে দেছে, ঘোড়ার ল্যাজ থেকে দাড়ির বাঁধন খুলে বাঁটুলের মুখ ঢেকে সেই দাড়ি কষে জড়িয়ে দিলেন। তারপর একটা কেলে হাঁড়ি আনিয়ে সেই হাঁড়ির মধ্যে বাঁটুলকে পুরে হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়ে নিজের চোখের পাগড়ি খুললেন…খুলে

দেখেন, সর্ব্বনাশ! বাপ-রাজা মাটীতে পড়ে আছেন···উপর তলার বারান্দা থেকে পড়েছেন... পড়েই মাথা ফেটে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি!···শ্বশুর যা বলেছিল, তাই ঘটে গেছে!

হৈ-চৈ গোলমাল শুনে শাস্ত্রী-পাহারারা এলো, দাস-দাসীরা এলো...মন্ত্রী-সভাসদ-সেনাপতি কোটাল, পাত্র-মিত্ররা এলো···প্রজারাও এলো দলে দলে···

রাজাকে কবর দিয়ে এসে নতুন রাজার অভিষেক! সকলে বললে—বড়-মেজো দুজন ওঁদের শ্বশুরের রাজ্য পাবেন। কাজেই এখানকার সিংহাসনে ওঁদের বসানো হবে না...এখানকার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসবেন ছোট রাজপুত্র।

ছোট রাজপুত্র রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন। ছোট বৌ-রাণী বসলেন তাঁর পাশে···এ-রাজ্যের রাণী হয়ে।

আর বাঁটুল? সে এখন ছোটর গোলাম! এ-রাজ্যের সে বড়-কোটাল। তার দৌলতে রাজ্য একেবারে নিরাপদ...কোনো দুশমনের সাধ্য নেই, এ-রাজ্যে ঘেঁষে!

এক রাজ্য। রাজ্যের রাজা মারা গেছেন। যুবরাজ বসেছেন সিংহাসনে। নতুন রাজা। নতুন রাজার বয়স বেশী নয়···এখনো তাঁর বিয়ে হয়নি। সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছেন...এখন রাজার চাই রাণী।

নতুন রাজার মা এখনো বেঁচে। তিনি বললেন—রাজা-রাজড়াদের ঘরে খবর নি···যে-রাজা সবচেয়ে বড়, তার কন্যার সঙ্গে আমি আমার ছেলের বিয়ে দেবো।

নতুন রাজা বললেন—না, না···বড় রাজার কন্যা যদি কালো কুচ্ছিৎ হয়? মোটা টিপসী হয়? খেঁদি বুঁচি হয়? তাকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে!

মা দিলেন ধমক···বললেন—হোক কালো, হোক কুচ্ছিৎ, হোক খেঁদি বুঁচি মোটা টিপসী, তবু সব-চেয়ে বড় রাজার কন্যা তো! সে-কন্যাকে বিয়ে করলে কত মান, কত খাতির হবে!

নতুন রাজা বললেন—হুঁ... কালো কুচ্ছিৎ নাকি আবার রাজার রাণী হয়? তাকে কেউ রাজকন্যা বলে না! বলে, পেত্নী! পেত্নীকে আমি বিয়ে করবো না।

নতুন রাজা ঘোষণা দিলেন রাজ্যে-রাজ্যে দেশে-বিদেশে···গ্রামে-গ্রামে সহরে সহরে—কার ঘরে বিয়ের যুগ্যি কন্যা আছে, সে-কন্যার ছবি পাঠাও···ছবি দেখে যে-কন্যাকে পছন্দ হবে, নতুন রাজা তাঁকে বিয়ে করবেন।

ঘোষণা শুনে দেশে-বিদেশে যেখানে যত বিয়ের যুগ্যি কন্যার বাপ ছিল, সকলে পাঠালো নতুন রাজার কাছে নিজের নিজের কন্যার ছবি। রোজ হাজার হাজার ছবি আসে···রাজা বসে বসে ছবি দেখেন। ছবি দেখে কোনো কন্যা আর তাঁর পছন্দ হয় না!

এমনি করে এক বচ্ছর কাটলো। শেষে ছবির উপর রাজার ঘেন্না ধরে গেল। রাজা তখন করলেন কি, সামান্য পথিক সেজে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন...একা...নিজের চোখে পছন্দ-সই কন্যা যদি দেখেন, এমন কন্যার সন্ধানে...

পথে পথে ঘুরে তিন মাস কেটে চার মাস সুরু হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখেন, সামনে এক বাড়ীর জানলার ধারে বসে তিনটি কন্যা···সুতো নিয়ে তিনজনে মোজা বুনছে...আর সেই সঙ্গে নিজেরা কি-সব কথাবার্তা কইছে।

পা টিপে টিপে রাজা এসে দাঁড়ালেন সেই জানলার নীচে...তাদের কথা শুনবেন বলে।

তিন কন্যাই রূপসী। বড় কন্যার চুল মেঘের মতো কালো...বড় কন্যা বললে—রাজার বিয়ের জন্য কন্যা জুটচেনা···ত্রিভুবন খুঁজে! আমার সঙ্গে যদি রাজার বিয়ে হয়, তাহলে রাজা দেখবে, আমার যে-ছেলে হবে, সে হবে ত্নুনিয়ার সব চেয়ে বড় বীর!

মেজো কন্যার মাথার চুল রূপোর মতো...সাদা ঝক্‌ঝক্ করছে। মেজো কন্যা বললে,—রাজা যদি আমাকে বিয়ে করেন, তাহলে আমার মেয়ে হবে...সে-মেয়ের রূপে ভুবন আলো হয়ে থাকবে!

ছোট কন্যার মাথার চুল সোনার বরণ···ছোট কন্যা বললে—রাজা যদি আমাকে বিয়ে করেন, তাহলে আমার ত্নুটি ছেলে হবে···ছেলেদের মাথার চুল হবে সোনা-ঝকঝকে।

তিন কন্যার কথাই রাজা শুনলেন···শুনে তিনি রাজপুরীতে ফিরলেন।

সে রাত্রে রাজার চোখে আর ঘুম নেই। রাজা ঐ তিন কন্যার কথা ভাবতে লাগলেন। ভেবে ভেবে ঠিক করলেন, ছোট কন্যাকেই তিনি বিয়ে করবেন...ছোট কন্যার হবে ত্নুটি ছেলে···সে ছেলেদের মাথার চুল হবে সোনা-ঝক-ঝকে!

পরের দিন সকালে উঠে সভায় এসে রাজা জানালেন, কন্যা তাঁর পছন্দ হয়েছে—গৃহস্থ-ঘরের কন্যা···কন্যার মাথায় সোনার বরণ চুল।

কন্যার বাপের কাছে রাজার দূত ছুটলো। আর বিয়ের কথা পাকা করে সেই মাসেই হলো মহা-ধুমধামে গৃহস্থ-ঘরের সেই সোনার-বরণ-চুল ছোট কন্যার সঙ্গে রাজার বিয়ে।

বিয়েয় সকলে খুশী···খুশী হলো না শুধু পয়সাওলা ক'জন মেয়ের বাপ আর রাজার মা। মা একেবারে রেগে আগুন! যে-আসনে তিনি ছিলেন রাণী, সে-আসনে রাণী হয়ে বসবে কোথাকার এক গরীব গৃহস্থ-ঘরের কন্যা! ছেলের এত বড় আস্পর্দ্ধা, মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে! এত সব রাজার কন্যা···তাদের পছন্দ হলো না! মা রাগে গর্‌গর্ করতে লাগলেন।

কিন্তু রেগে কি-বা করবেন? ছেলে এখন রাজা...তার হুকুমে রাজ্য চলছে! মনের রাগ মনে চেপে বৌকে তিনি হাসি-মুখে বরণ করে ঘরে তুললেন···বৌকে আদর-যত্ন করলেন!

তারপর দিন যায়, বছর যায় কেটে। রাণীকে নতুন রাজা নিত্য এনে দেন দামী-দামী পোষাক, দামী-দামী গহনা···আরো কত রকম-বেরকম উপহার। দেখে রাণী তেলে-বেগুনে জ্বলতে থাকেন ...মুখে কিছু বলতে পারেন না! ছেলে এখন রাজা···বৌ এ-রাজ্যের রাণী!···বৌকে ত্নুটো ধমক দেবেন, কি, বৌয়ের গায়ে ছিঁচ্‌কে পুড়িয়ে ছঁ্যাকা দেবেন, সে জোটি নেই!

তারপর আরো দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়···শেষে শোনা গেল, নতুন রাণীর ছেলে হবে। নতুন রাণীকে রাজা তখন আরো বেশী বেশী যত্ন-আদর করতে লাগলেন···আরো বেশী বেশী জিনিষ কিনে উপহার দিতে লাগলেন।

কিন্তু হঠাৎ এক বিভ্রাট। পাশের রাজ্যের রাজার সঙ্গে হলো ঝগড়া···তার ফলে লড়াই।

রাজাকে যেতে হবে লড়াইয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। বেরুবার সময় রাজা মাকে বললেন—নতুন রাণীকে তোমার হাতে রেখে গেলুম মা। ওঁকে দেখো...যত্ন করো···তোমার উপর ওঁর সব ভার।

মায়ের মন আনন্দে নেচে উঠলো! মা বললেন—হ্যাঁ বাবা, দেখবো বৈ কি, যত্ন করবো বৈ কি! আমার ঘর-আলো-করা বৌ···যাও, তুমি নিশ্চিন্ত মনে লড়াই করতে যাও।

রাজা লড়াই করতে গেলেন। তিনি চলে গেলে রাণীমা বললেন,—এ বাড়ীর নিয়ম হলো, ছেলে হবার সময় রাণীকে থাকতে হয় পুরীর বাইরে কুঁড়ে-ঘর বেঁধে, সেই কুঁড়ে-ঘরে।

পুরীর বাইরে কোথায় ছিল একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে···রাণীমার হুকুমে নতুন-রাণীকে সেই কুঁড়েয় রেখে আসা হলো। বৌয়ের সঙ্গে রাণীমা পাঠালেন তাঁর নিজের খাশ দাসীকে···রাণীমা মাঝে মাঝে গিয়ে বৌকে দেখে আসেন।

তারপর সেই কুঁড়ে-ঘরে নতুন-রাণীর হলো দুটি ছেলে···রূপে চাঁদ ঠিকরে পড়ছে যেন!···দুজনের মাথায় সোনা-ঝকঝকে চুলের রাশ! ছেলেদের মুখ দেখে নতুন রাণী আনন্দে বিহ্বল!

রাণীমা এলেন নাতি দেখতে। দেখে ছেলেদের চাদরে ঢেকে নিয়ে বেরুলেন···বৌকে বললেন,— ঠাকুর-দেবতার আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে আনতে হবে বৌমা, এ রাজ্যের তাই নিয়ম।

ছেলেদুটিকে নিয়ে রাণীমা এলেন রাজপুরীর পিছনে যে-বাগান, সেই বাগানে। বাগানের কোণে নিজের হাতে মস্ত গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তে ছেলেদুটিকে পুঁতে গর্ত্তে মাটী চাপা দিলেন···তারপর পথ থেকে দুটো লেড়িকুত্তোর বাচ্ছা কুড়িয়ে সেই বাচ্ছাদুটোকে চাদরে ঢাকা দিয়ে নতুন-রাণীর কুঁড়ে-ঘরে রেখে গেলেন। বৌ-রাণী তখন ঘুমোচ্ছেন......দেখতে পেলেন না, জানতে পারলেন না—কি হয়ে গেল এদিকে!

পরের দিন রাণীমা আবার এলেন নাতিদের দেখতে। বৌ তখনো ঘুমোচ্ছেন। কুকুরের বাচ্ছাদুটোর কাণ ধরে টেনে রাণীমা বলে উঠলেন—ওমা, ওমা···এ কি অভাগ্যি! কাল দেখে গেলুম চাঁদ-পানা দুই নাতি—আর আজ দেখি, ন্যাংলা দুটো কুকুর-ছানা হয়ে গেছে তারা!

শাশুড়ী-রাণীর কথা শুনে নতুন রাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল···চোখ মেলে তিনি দেখেন, তাইতো! এ কি সর্ব্বনাশ! অমন দুই খোকা···তার বদলে দুটো কুকুর-ছানা! নতুন রাণীর চোখের সামনে সব কেমন ঝাপশা হয়ে এলো··· ছেঁড়া কাঁথার উপর তিনি অজ্ঞান হয়ে ঢুলে পড়লেন!

রাণীমা এদিকে করলেন কি···ঘোড়-সওয়ার দূত পাঠালেন ছেলে-রাজার কাছে। দূতের হাতে পত্র দিলেন। পত্রে লিখলেন—

> বড় দুঃখের কথা বাবা, রাণী-বৌমার পেট থেকে দুটো ন্যাংলা কুকুর ছানা বেরিয়েছে। তুমি-আমি রাজ্যে আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। সকলে ছি-ছি করছে।
>
> তোমার রাণী-মা

লড়াইয়ের তাঁবুতে বসে এ-পত্র পড়ে রাজা রাগে অন্ধ হলেন। তখনি ফ্যাঁশ-ফাঁশ করে' জবাব লিখলেন। লিখলেন,—

> এ পত্র পাবামাত্র ও বৌকে আঁধার-গুহা গারদে বন্ধ করে' রাখবে। এমন ছোট-লোকের মেয়ে! আমাদের উঁচু মাথা হেঁট করালো! ও বৌয়ের আমি মুখদর্শন করতে চাইনা।

ছেলের পত্র পেয়ে রাণী-মা আল্লাদে আটখানা! তখনি সহর-কোতোয়ালকে ডেকে রাজার পত্র দেখিয়ে রাজার এ-হুকুম তামিল করতে বললেন।

কোতোয়াল হুকুমের চাকর! হুকুম পাবামাত্র হুকুম তামিল করলে......শান্ত্রী ডেকে নতুন রাণীকে নিয়ে গিয়ে সে পুরে দিয়ে এলো আঁধার-গুহা গারদে।

আঁধার-গুহায় নতুন রাণীর দিন কাটে। দুচোখে সারাক্ষণ জলের ধারা! কেন তাঁর এমন হলো? রাজপুরী থেকে অন্ধকার গুহায় নির্বাসন? বেচারী কিছুই বুঝতে পারেনা! রাণীমা নিজে থেকে দাঁড়িয়ে—লোকজনের খাওয়া চুকলে তাদের পাতে যে এঁটো-কাঁটা পড়ে থাকে···সেই এঁটো-কাঁটা কুড়িয়ে নিয়ে আঁধার গুহায় পাঠান···বৌ খাবে!

অন্ন যেমন হোক, নতুন রাণীর সহ্য হয়। কিন্তু রাজা...আর চাঁদের মতো সেই দুই খোকা? এদের অদর্শন তাঁর কিছুতে সহ্য হয় না!

নতুন রাণীর বুক নিশ্বাসে ভরে' ওঠে···দু চোখের ধারা আর শুকোয় না!

দিন কাটে। দিনের পর দিন···কত দিন কাটলো।···

এমনি দিন কেটে কেটে দু-বছর কাটলো। দু-বছর পরে লড়াই জিতে রাজা ফিরলেন পুরীতে। প্রজারা আনন্দ করবে কি, আঁতুড়ে রাণীর হয়েছে খোকা নয়, দুটো কুকুর-ছানা······ঘেন্নায় তারা মুখ ফিরিয়ে সরে-সরে গেল।

প্রজাদের ভাব দেখে রাজা নিঃশব্দে পুরীতে ঢুকলেন। ছেলেকে দেখে রাণীমা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন—এবারে আমার কথা শোন্ বাবা···রাজার ঘর থেকে আমি কন্যা দেখে আনি, তুই সেই কন্যা বিয়ে কর্।

নিশ্বাস ফেলে রাজা বললেন্—না। বিয়ে আর আমি করবো না।

রাজার মন বিরস উদাস। রাজ্য ঐশ্বর্য্য বিলাস··· মনে হয়, এ সব বিষ! রাজপুরী শেষে আগুনের মতো তপ্ত মনে হলো! কোথায় যাবেন? পথে বেরুবেন, সে উপায় নেই! প্রজাদের চোখে ঘৃণার বিষ! পুরীর পিছনে যে-বাগান...দিনের বেলাটা রাজা সেই বাগানে গিয়ে বসেন।

হঠাৎ একদিন নজরে পড়লো, বাগানের ও-কোণে ঝোপ-ঝাড়ের বুক ঠেলে উঠেছে চমৎকার দুটি গাছ।···গাছের ডালপালাগুলো ঝক্-ঝক্ করছে সাদা মার্বেল পাথরের মতো। গাছে রূপোর পাতা

…সোনার ফুল, ফলগুলো সব থোলো থোলো মুক্তো। আশ্চর্য্য গাছ! এমন গাছ রাজা জন্মে কখনো দেখেন নি।…

রাজা এলেন সেই গাছ দুটির তলায়। গাছ দুটির পানে চেয়ে চেয়ে রাজার মন মুগ্ধ হলো। দিব্যি বাতাস বইছে…রাজা সেই গাছ দুটির তলায় বসলেন।…

মুগ্ধ চোখে গাছ দুটির পানে রাজা চেয়ে আছেন …ডালে ডালে পাখীরা গান গাইছে!

রাজার ভারী আরাম বোধ হলো! এমন আরাম রাজা অনেক দিন পান নি!

তার পর থেকে রাজা রোজ এসে 'বাগানে এই গাছ দুটির তলায় বসেন…গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় হাত বুলোন…গাছ দুটির ফুলগুলি ছুঁয়ে নিশ্বাস ফেলেন! একটি ফুল ছেঁড়েন না… ছেঁড়ার কথা মনে হলে মন কেমন ছাঁৎ করে' ওঠে!…ভাবেন, আহা, না, এই ফুলগুলি হলো গাছের প্রাণ…ফুল ছিঁড়ে গাছের মনে ব্যথা দেওয়া মহাপাপ।…

ছেলের ভাব দেখে মা-রাণী ওদিকে উতলা হলেন। ছেলে তাঁর কথা শুনে বিয়ে করছে না! রাজা-মানুষ…সে কি না দীন-দুঃখীর মতো বাগানে গিয়ে ঐ ঝোপের পাশে চুপটি করে' বসে থাকে!…

খবর নিলেন। খবর নিয়ে জানলেন, বাগানের কোণে যেখানে সেই খোকাদের পুঁতেছিলেন, সেইখানে উঠেছে দুটি গাছ···আশ্চর্য্য রকমের গাছ। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি···গাছের পাতা রূপোর, ফুল সোনার আর ফলগুলো মুক্তোর থোলো!

মা-রাণী প্রমাদ গণলেন। হুঁ...এ ভালো কথা নয়!...তিনি তখন এক ফন্দি আঁটলেন। করলেন কি, হি-হি করে' শীতে কেঁপে লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুলেন। উহুহুহু··· বড় অসুখ গো, বড় অসুখ।

কত বদ্যি এলো...হকিম এলো...ওঝা এলো...মা-রাণীকে দেখলো...নাড়লো-চাড়লো...কি-রোগ কেউ ঠাওর করতে পারলো না। তা না পারলেও, রোগ যখন···আর যার-অর রোগ নয়, মা-রাণীর রোগ···তখন তারা কতরকম দাওয়াই দিলে...প্রলেপ দিলে—কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হয় না! মা-রাণীর রোগ আর সারে না!

রাজা শুনলেন। হাজার হোক মা—দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছিলেন! সেই মার এমন রোগ! রাজার টনক নড়লো। রাজা এলেন মা-রাণীকে দেখতে।

জিজ্ঞাসা করলেন—কি তোমার অসুখ মা? বদ্যি হকিমরা কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছে না!

ককিয়ে ককিয়ে মা-রাণী বললেন—কাল রাত্রে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি বাবা...যেন বিধাতা-পুরুষ এসে মাথায় শিয়রে দাঁড়ালেন...দাঁড়িয়ে বললেন, এত কেন ভাবছিস রে? বাগানের কোণে ঐ যে দুটো ভূতুড়ে গাছ—ঐ গাছ দুটো কেটে ঐ-গাছের তক্তায় পালঙ তৈরী করিয়ে সেই পালঙে তিন দিন তিন রাত শুয়ে থাকলেই তোর সব রোগ সেরে যাবে।

ঐ দুটি গাছ? রাজার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো! যা-কিছু আরাম তিনি এখন পান, সে ঐ গাছ দুটির তলায় বসে! সে গাছ কাটতে হবে?...রাজা শিউরে উঠলেন! কিন্তু মা, গর্ভধারিণী মা···মায়ের চেয়ে নিজের সখের দুটো গাছের দাম কি বেশী? উঁহু!...মায়ের প্রাণ আগে, তার পর নিজের সখ!

রাজা হুকুম দিলেন। গাছ দুটো কাটা হলো। কেটে ও-দুই গাছের তক্তায় মায়ের জন্য তৈরী হলো পালঙ। সেই পালঙে শুয়ে মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু এ-স্বস্তিতেও বিধাতা বাদ সাধলেন।...রাত্রে কারা কথা কয়! তাদের সে-কথার আওয়াজে মায়ের ঘুম গেল ভেঙ্গে। মা শুনলেন পালঙের পায়া ডাকছে,—দাদা গো দাদা, চুপ করে আছো কেন? এত ডাকছি, শুনতে পাও না?

পালঙের ছৎরী দিলে জবাব। বললে—আমি ভাই, দুঃখিনী মায়েব কথা ভাবছি।...বিনা-দোষে পরের চক্রান্তে মা আমাদের আঁধার-গুহায় বন্দিনী!

কথা শুনে রাণী-মার চক্ষুস্থির! এ কথা যদি প্রকাশ পায়, ছেলে-রাজার কাণে ওঠে যদি?... দুর্ভাবনায় রাত কাটলো...চোখে ঘুম নেই।

সকালে ছেলেকে ডেকে রাণী-মা বললেন—আবার এক কাণ্ড বাবা!

ছেলে রাজা বললেন—কি হলো আবার ?

রাণী-মা বললেন—কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, ভগবান এসে রাগ করে' বলছেন...এ পালঙে শুলে অসুখ সারবে না। এর কাঠগুলো পুড়িয়ে সারা রাত জেগে বসে তার ধোঁয়া নিতে হবে—তবে সারবে তোর শক্ত ব্যাধি।

ছেলে-রাজা বললেন—বেশ, তাই হোক তবে।

তাই হলো। রাজার হুকুমে চাকররা কুড়ুল এনে পালঙ চোলয়ে জ্বালানি কাঠ করে' দিলে... সেই সব কাঠ জড়ো করে' তাতে ছোঁয়ানো হলো আগুন। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে···মা অপলক চোখে চেয়ে আছেন সেই আগুনের দিকে। জ্বলে-জ্বলে আগুন যখন নিব-নিব হয়ে এসেছে, তখন মা দেখেন, ও-থেকে দু-টুকরো আগুন···বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ছিটকে ঠিকরে জানলা দিয়ে বেরিয়ে রাজপুরীর উঠোনে গিয়ে পড়লো।...

মা ভাবলেন, আগুন এমন ঠিক্‌রোয় ? আশ্চর্য্য কাণ্ড তো ! যাক্ গে, পুড়ে ছেলে দুটো তো ছাই হলো, তবে আর দুর্ভাবনা কিসের ?···

এখন উঠোনের যেখানে সেই দু' টুকরো আগুন ঠিকরে পড়েছিল···সেখানে সকালে চুপটি করে' বসে আছে ছোট ছোট দুটি হরিণের-ছানা ! তাদের গায়ের চামড়া যেন সোনা-মোড়া !...

রাজা যাচ্ছিলেন উঠোন দিয়ে বাহিরে সভাগৃহে...সোনার-চামড়াওয়ালা হরিণের-ছানাদুটিকে উঠোনে দেখে তিনি অবাক্ ! এ তো তাঁর হরিণ নয় ! কাদের হরিণ এলো ? হুকুম দিলেন লোকজনকে,—ভালো খাঁচা এনে সেই খাঁচায় এদের রাখো...এদের খাবার-দাবার দাও···যত্ন করো... আর ক'জনে যাও হরিণ-ছানাদের মালিকের খোঁজে। পরের হরিণ-ছানা। যত্নের ত্রুটি না হয়-যেন !

রাজা গেলেন সভায়...ভৃত্যরা সারা রাজ্য তোলপাড় করে তুললো হরিণ-ছানাদের মালিকের সন্ধানে। পনেরো-ষোল দিনেও সন্ধান মিললো না। কেউ এলো না হরিণ-ছানাদুটির তত্ত্ব নিতে।

ছানাদুটিকে রাজার ভারী ভালো লেগেছে···রোজ এসে তিনি নিজের হাতে খাবার দেন খেতে··· দাঁড়িয়ে থেকে স্নান করান, ব্রাশ দিয়ে গা মলে দেন। সব তিনি নিজের চোখের সামনে করান।

রাণী-মা শুনলেন হরিণ-ছানাদের কথা। তারপর রাজা যখন সভায়, তিনি এলেন ছানাদের দেখতে। যেমন দেখা সোনার চামড়া, অমনি প্রমাদ গণলেন ! এ তো ভালো আপদ ! মরেও মরেনা ! ব্যাপার কি ?

আবার তিনি অসুখ বলে' শয্যা নিলেন। এবারে খুব বেশী অসুখ। না পারেন খেতে, না পারেন বসতে। চব্বিশ-ঘণ্টা শুধু পালঙে শুয়ে আছেন। বদ্যিরা হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল। হকিমরা মাথা নেড়ে রায় দিয়ে গেল, এ রোগের কথা কোনো শাস্ত্রে নেই, পুরাণে নেই মহারাজ। আপনি রাণী-মার অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করুন !

রাজার বুকখানা হুলে উঠলো। হাজার হোক, মা···সেই মা মৃত্যুশয্যায় !···মায়ের কাছে এসে তিনি ডাকলেন—মা···

মা বললেন—কেন বাবা ?

ছেলে-রাজা বললেন—আর একবার ভগবানকে ডাকো মা। আবার যদি তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে প্রতিকারের কোনো উপায় বলে দেন !

মা বললেন—বেশ, বাবা। তুমি বলচো···ভগবানকেই ডাকি তাহলে।

পরের দিন তিনি বললেন ছেলে-রাজাকে—ভগবান বলেছেন, সোনার হরিণছানা হুটোকে কেটে ওদের মাংসর ঝোল খেলে সেরে উঠবো।

ছেলে-রাজার হুকুমে তখনি হরিণ-ছানাদের কাটা হলো। কাটা হলে রাজার রাঁধুনি রেঁায়গুলো ধুয়ে সাফ করবার-জন্য কাটা-মাংস নিয়ে গেল রাজপুরীর লাগাও নদীর ঘাটে। কচ্‌লে কচ্‌লে মাংস ধুচ্ছে, হঠাৎ তার হাত ফশ্‌কে মাংস গেল ভেসে···

সর্ব্বনাশ ! ভয়ে রাঁধুনির প্রাণ উড়ে গেল। জলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু জোয়ারের এমন জোর-টান যে সে-টানে মাংস গেল ভেসে—রাঁধুনির সাধ্য কি, সে মাংসর নাগাল পাবে।...

খালি-হাতে ফিরে রাঁধুনি কাঁদতে কাঁদতে রাজার কাছে করলে বৃত্তান্ত নিবেদন। শুনে রাজা রেগে তার পিঠে জোরে ক'ঘা চাবুক কষিয়ে দিলেন।

ওদিকে নৌকোয় করে এক শিকারী মাছ ধরতে বেরিয়েছে···তার জালে কী ঠেকলো ! শিকারী ভাবলো, নিশ্চয় বেশ বড় মাছ। মহাখুশী হয়ে জাল টানলো। টেনে দেখে, ওমা ! মাছ নয়, একটা কাঠের বাক্স···আর সে বাক্সয় শুয়ে চমৎকার-সুন্দর হুটি ছেলে। তাদের মাথার চুল সোনার। ছেলেহুটিকে বুকে নিয়ে শিকারী বাড়ী এলো। তার ছেলে নেই···এই ছেলেহুটি হলো শিকারীর প্রাণ।

তারপর জলের মতো বছরের পর বছর গড়িয়ে বারো বছর কাটলো···ছেলে হুটি ডাগর হয়েছে। ···ভারী ভালো ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে···শিকারে পটু···সাহসী, বীর। তাছাড়া হুজনে খাশা গান গায়···বাঁশী বাজায়। ছেলেদের দেখে শিকারী ভাবে, নিশ্চয় খুব বোনেদী ঘরের ছেলে ! নাহলে এত-গুণ হয় !···শিকারীকে ছেলেরা 'কাকা' বলে ডাকে।

একদিন ছেলেরা শিকারীকে বললে—আমাদের হুটো ভিখিরীর পোষাক দাও কাকা···আমরা পৃথিবী দেখতে বেরুবো।

শিকারীর বুকখানা হুলে উঠলো। এদের অদর্শনে নিজের খুব কষ্ট হবে···তা বলে ওদের আনন্দে বাধা দেবো ? শিকারী বললে—ভিখিরীর বেশ কেন, বাবা ? এমন পোষাক করে দেবো হুজনকে···সে-পোষাক দেখে পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে তোমাদের পানে চেয়ে থাকবে !

তারা জেদ ধরলে,—না, কাকা, না...আমাদের ভিখিরীর পোষাক চাই।

তাদের কথায় শিকারী 'না' বলতে পারলো না। দিলে দুজনকে ভিখিরীর পোষাক করিয়ে।···সেই পোষাক পরে দুজনে বেরুলো পৃথিবী ঘুরতে···দুজনে সঙ্গে নিলে শুধু দুটি বাঁশী!

পথে বসে দুজনে বাঁশী বাজায়, গান করে। যে শোনে, সে-ই আদর করে, যত্ন করে। দুজনের এতটুকু দুঃখ নেই, কষ্ট নেই।···

ঘুরতে ঘুরতে দুজনে এলো বাপ্-রাজার রাজ্যে। পুরীর দেউড়িতে এসে যখন পৌঁছুলো, তখন সন্ধ্যা হয়েছে। দ্বারীকে বললে,—রাতের মতো আমাদের একটু আশ্রয় দেবে ভাই, এখানে?

ছেলেদুটির চেহারা দেখে দ্বারীর ভারী ভালো লাগলো। দ্বারী বললে,—বেশ, আমার ঘরে থাকো।

এখন রাজার মা কি-কাজে দেউড়ির দিকে আসছিলেন। তিনি দেখেন, দেউড়িতে সোনার চাঁদ দুটি ছেলে! তাদের মাথার চুলে সোনা ঝকঝক্ করছে। দেখে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! দ্বারীকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন—খবর্দ্দার...নোংরা পোষাকপরা কোথাকার হাঘরে দুটো ভিখিরী—ওদের তাড়িয়ে দে। এখানে ওদের ঠাঁই হবে না!

দ্বারী বেচারী হতাশ দৃষ্টিতে ছেলেদুটির পানে চেয়ে নিশ্বাস ফেললে।

ছেলেরা বললে—দুঃখ করোনা ভাই দ্বারী। রাণী-মা ঠিক কথা বলেছেন...হাঘরেদের কি রাজপুরীতে ঠাঁই হয়?

ছেলেরা দেউড়ি ছেড়ে চলে আসবে, এমন সময়···রাজা কোথায় গিয়েছিলেন, দেউড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নামলেন। নেমে দেখেন, সামনে দুটি ছেলে। কি সুন্দর দেখতে! রাজার মন মুগ্ধ হলো। জিজ্ঞাসা করলেন,—কে তোমরা?

ছেলেরা বললে,—আমরা ভিখিরী, মহারাজ।

—কোথায় চলেছো?

—একটু আশ্রয়ের সন্ধানে।

রাজা বললেন,—এসো, আমি তোমাদের আশ্রয় দেবো।

ছেলেদুটিকে নিয়ে রাজা পুরীতে এলেন। ছেলে দুটিকে নিয়ে এলেন নিজের বসবার ঘরে। নফরকে বললেন,—এদের মুখ-হাত ধোবার ব্যবস্থা করো।—ভালো পোষাক দাও পরতে···তারপর আমার সঙ্গে বসে এরা খাওয়া-দাওয়া করবে!

খাওয়া-দাওয়া চুকলে রাজা ছেলেদুটিকে নিয়ে ঘরে বসলেন। তাদের হাতে বাঁশী দেখে রাজা বললেন—বাঁশী বাজাতে পারো?

ছেলেরা বললে,—পারি, মহারাজ।

বড় ছেলে বাঁশীতে দিলে ফুঁ···ছোট ধরলো বাঁশীর সুরে গান।

ছোট গাইলো,—

রাজার এ মস্ত পুরী···ছাদে তার একটি কোণে
বেঁধে নীড় ছিল সুখে পাখী এক খুশী-মনে!
বুকে তার রিষ ছিল না, বিষ ছিল না···নীড়ের পাখি···
কালো কাক এলো পাশে···টক্‌টকে তার রক্ত আঁখি!
ঠোঁটে কাক ঠোকর দিয়ে ভাঙ্গে নীড় এক-নিমেষে।
নীড়হারা পাখীটি হায়, উড়ে যায় কোথায় ভেসে।
বেচারী ছোট পাখী! রাজা তার খোঁজ রাখে কি?
বসে খায় ক্ষীরের চাঁছি কালো-কাক পাজীর ঢেঁকি!

আবেগ-মেশানো মধুর কণ্ঠ! গান শুনে রাজা মুগ্ধ হলেন। গান থামলে সজল কণ্ঠে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—এ গানের মানে কি?

ছেলেরা মানে বললে। দুজনের মাথায় মস্ত পাগড়ি...খুলে রাজাকে দেখালো মাথার চুল।

রাজা দেখেন, সোনার-সুতোর ঝালর যেন!

ছেলেরা সব কথা খুলে বললে রাজাকে···তাদের জন্মের আগে দুঃখিনী মাকে রাজার মা কি-ছলে ভুলিয়ে ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘরে নিয়ে গিয়েছিল···সেখান থেকে সুরু করে হরিণ হওয়া পর্য্যন্ত সব বৃত্তান্ত খুলে বললে।

শুনে রাজার মনে যেমন রাগ হলো, তেমনি দুঃখ। রাজা মায়ের শয়তানী আর নতুন-রাণীর দুঃখ-দুর্দ্দশার-কথা চিন্তা করে তখনি হুকুম দিলেন কোতোয়ালকে,—বন্দী করো রাণীমাকে... পরে তাঁর অপরাধের বিচার করবো।

এ কথা বলে ছেলেদের নিয়ে রাজা ছুটে গেলেন আঁধার-গুহা-কারায়···নিজের হাতে বাঁধন খুলে নতুন-রাণীকে করলেন মুক্ত। মুক্ত করে তাঁকে নিয়ে পুরীতে এলেন।···বললেন,—আমি কিছু জানতুম না রাণী, আমায় তুমি ক্ষমা করো।

মায়ের বিচার হলো। মাকে দিলেন শাস্তি। রাজা বললেন—তুমি মা নও, রাক্ষসী! মা বলে তোমায় শাস্তি যদি না দি, তাহলে সিংহাসন টলবে, রাজ-কর্ত্তব্য ভঙ্গ হবে। তুমি আজীবন বন্দী থাকবে ঐ আঁধার-গুহা-কারায়।...

রাণী চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। দ্বারীরা তাঁকে নিয়ে গেল আঁধার-গুহা-কারায়।

তারপর সেই শিকারীকে আনিয়ে রাজা বললেন,—ভাগ্যে তুমি এদের আশ্রয় দিয়েছিলে, নাহলে এ-জন্মে আর ছেলেদের পেতুম না। ছেলেরা তোমাকে কাকা বলে ডাকে—তুমি আমার ভাই। সত্যি, বড় উপকার করেছো তুমি। আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে রাজপুরীতে... আমার বন্ধু হয়ে, ভাই হয়ে।

তারপর? তারপর সকলে হলেন সুখী! রাজা নতুন-রাণীকে পেলেন, ছেলেদের পেলেন। রাজ্যের প্রজারাও সুখী হলো।
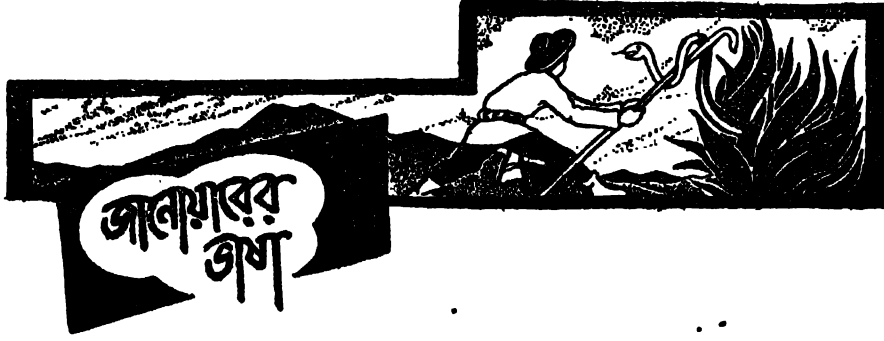
ধনী জোতদার। তার অনেক জমি। সেই-সব জমি সে মাহিনা-করা চাষী দিয়ে চাষ করায়। জোতদারের অনেক লোক। অনেক ছাগল ভেড়া। মাহিনা-করা রাখালরা সেই সব ছাগল-ভেড়াদের নিয়ে নিত্য মাঠে যায় চরাতে…চরিয়ে আবার ফিরিয়ে আনে।

সেদিন জোতদারের ছাগল নিয়ে চলেছে চরাতে এক রাখাল…বনের ধার দিয়ে। হঠাৎ একটা ঝোপের কাছে এসে শোনে—হিশ-হিশ শব্দ। সেই সঙ্গে কে বলছে,—আমায় বাঁচাও গো… আমায় রক্ষা করো! আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলুম!

রাখাল চম্‌কে সেই দিকে চাইলো। চেয়ে দেখে, দূরে একটা শুকনো ঝোপ্ দাউ-দাউ করে জ্বলছে আর ঝোপের ভিতর থেকে ফণা তুলে একটা সাপ চ্যাঁচাচ্ছে,—রক্ষা করো, রক্ষা করো।

রাখালের মনে মমতা হলো। হোক সাপ। ভগবানের তৈরী জীব! আহা!

রাখালের হাতে ছিল লোহার একটা ছড়ি। সেই ছড়িখানা টুক করে এগিয়ে দিলে সেই জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে সাপের সামনে। সাপ অমনি ছড়িটা ধরলো কুণ্ডলী করে জড়িয়ে…রাখাল তাকে আগুনের ভিতর থেকে টেনে বার করে আনলো।

বেরিয়ে এসে ছড়ি ছেড়ে সাপ জড়ালো রাখালের একখানা পা—কুণ্ডলী পাকিয়ে। রাখাল ভয়ে অস্থির। বললে—ভারী মজার সাপ তো তুমি! আমি তোমাকে আগুন থেকে তুলে বাঁচালুম, আর তুমি আমায় জড়িয়ে ছোবল দিতে চাও!

সাপ বললে,—ভয় করোনা বন্ধু। ছোবল দেবো বলে আমি তোমার পা জড়াইনি…আমি তোমার পা জড়িয়েছি এই জন্য যে তুমি চলে যেতে পারবে না।…

রাখাল বললে,—বারে, আমার কাজ নেই বুঝি? এইখানেই আমি দাঁড়িয়ে থাকবো?

সাপ বললে,—শোনো, সব কাজ ফেলে আগে তুমি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো। আমার বাবা হলো নাগরাজ…সাপেদের রাজা!

রাখাল মিনতি করতে লাগলো,—না, আমি যাচ্ছি মনিবের ছাগল চরাতে। এর জন্য মনিব আমাকে মাস-মাস মাহিনা দেয়। আমার কি এখন তোমার বাবার কাছে যাবার ফুরসৎ আছে?

সাপ বললে—অবুঝ হয়ো না। ছাগলের জন্য কোনো ভয় নেই। এইখানে ছাগল রেখে তুমি আমার সঙ্গে চলো। ছাগলরা এখানে নিরাপদে চরে বেড়াবে'খন। তাদের কোনো

বিপদ-আপদ হবে!...তাছাড়া বাবার ওখানে তোমার একটুও দেরী হবে না...দেখা করে চলে আসবে।

রাখাল বললে—কিন্তু তোমার বাবার কাছে যাবার দরকার আমার?

সাপ বললে,—আছে দরকার। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো...তোমাকে দেখলে বাবা খুশী হবে।

নিরুপায়! সাপ ছাড়বে না! রাখালকে যেতে হলো সাপের সঙ্গে।...

বন-বাদাড় ভেঙ্গে চলে দুজনে এলো উঁচু এক পাহাড়ের সামনে। পাহাড়ের গায়ে মস্ত ফটক। ফটকে প্রায় এক হাজার সাপ ফণা তুলে ফোঁশ্-ফোঁশ্ করে দেউড়ি চৌকি দিচ্ছে। দেখেই রাখাল ভয়ে একেবারে এতটুকুন্!

সাপ বললে,—ভয় নেই। ওরা তোমার কিচ্ছু করবে না, আমি সঙ্গে আছি।

সাপের সঙ্গে রাখাল ফটকে ঢুকলো। ফটকে ঢুকে সাপ বললে—আমার কথা শোনো...আমাকে বাঁচিয়েছো শুনে আমার বাবা তোমাকে বখশিস দিতে চাইবে ...অনেক সোনা মণি হীরে পান্না জহরৎ। মানে, তুমি যা চাইবে, তাই দেবে। কিন্তু সে-সব তুমি নিয়ো না। খবর্দার! তুমি বলো, বখশিস দেবে যদি তো আমাকে সেই বিদ্যা শিখিয়ে দাও, যে বিদ্যার জোরে পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝতে পারি। সে-বিদ্যা দিতে বাবা রাজী হবেনা। তুমি কিন্তু সে-বিদ্যা ছাড়া আর কোনো-কিছু নিয়ো না। কক্‌খনো না...বুঝলে?

মজা মন্দ নয় তো! রাখাল ঘাড় নেড়ে সাপের কথায় সায় দিলে।

তারপর রাখালকে সঙ্গে নিয়ে সাপ নাগরাজের ঘরে ঢুকলো।...

মোটা বালিশে কুণ্ডলী পাকিয়ে নাগরাজ বসে আরাম করছে। সাপকে দেখে বললে,—এই যে... এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কি করছিলে?

সাপ তখন বাপকে বললে বিপদের কথা...বনে শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একটা ঝোপে গিয়েছিল...সে-ঝোপে কি করে আগুন লাগে। সে-আগুনে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল! ভাগ্যে এই রাখাল এসে দয়া করে জ্বলন্ত ঝোপ থেকে তাকে টেনে আনে!

নাগরাজ খুশী হয়ে রাখালকে বললে—আমার ছেলের তুমি প্রাণ রক্ষা করেছো...বলো, এর জন্য কি তুমি চাও?

রাখাল বললে—কিছু যদি দেবে নাগরাজ, তাহলে সেই বিদ্যা দাও ..যে-বিদ্যার জোরে আমি পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝতে পারি।

নাগরাজ বললে,—উঁহু! তা হবে না রাখাল। তার কারণ, তোমায় যদি সে-বিদ্যা দিই, সে-বিদ্যা তুমি নিশ্চয় আর কাকেও দেবে! সে আবার আর-একজনকে দেবে! এমনি করে সে গূঢ় বিদ্যা

নরলোকের সকলে জানবে। আর তা জানলে আমাদের আর যত পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গের এর পর দিন চালানো ভারী মুস্কিল হবে। তুমি অন্য কিছু চাও…মণি রত্ন সিংহাসন রাজ্য!

রাখাল বললে—না নাগরাজ, ঐ বিদ্যা ছাড়া আমি আর কিছু চাইনা।

নাগরাজ বললে,—এ-বিদ্যা এমন যে এ-বিদ্যা তুমি জানো, সে-কথা বললে তখনি তোমার মৃত্যু হবে।…তুমি অন্য কিছু চাও রাখাল…

—না নাগরাজ, ঐ বিদ্যা ছাড়া আর কোনো কিছু আমি চাইনা। আর কিছু আমি নেবো না। তাছাড়া কোনো-কিছু পাবার প্রত্যাশায় আমি তোমার ছেলের প্রাণ রক্ষা করিনি…মমতাবশে করেছি। আমার কোনো-কিছুতে কাজ নেই…আমি আসি।

এ কথা বলে রাখাল চলে আসবে, নাগরাজ দারুণ চিন্তিত হলো! তাইতো, মানুষটা এত-বড় উপকার করলে…আর শুধু-হাতে…কিছু না নিয়ে সে চলে যাবে!

নাগরাজ বললে—এসো তবে। তুমি আমাদের বন্ধু…তুমি যখন সে-বিদ্যা শিখবেই, তোমার পণ—বেশ, সে-বিদ্যা আমি তোমাকে দেবো।…হাঁ করো।

রাখাল হাঁ করলে…নাগরাজ তখন ফণা তুলে রাখালের মুখে জোরে দিলে এক ফুঁ!

তারপর নাগরাজ বললে—এবারে আমি হাঁ করি, তুমি দাও আমার মুখে ফুঁ!

রাখাল তাই করলে—নাগরাজ বললে,—আবার হাঁ করো তুমি।

রাখাল আবার হাঁ করলে। নাগরাজ এবারেও রাখালের মুখের মধ্যে ফণা পুরে খুব জোরে আবার ফুঁ দিলে। দিয়ে ফণা বার করে রাখালকে বললে—ব্যস, বিদ্যা তোমায় দিয়েছি। এখন বাড়ী যাও। কিন্তু সাবধান, এ গুপ্ত বিদ্যার কথা কাকেও যদি বলো…বলবামাত্র তোমার মৃত্যু… মনে রেখো।

মন্ত্র-বিদ্যা নিয়ে রাখাল এলো ফিরে… সেই বনে। আসবার সময় সে কাণে শুনলো কত-রকম পাখীর ডাক…পোকা-মাকড়ের বুলি। সব মানে বুঝতে পারলো। পাখীদের মধ্যে কেউ চাইছে খাবার …কেউ বলছে, বেড়াতে যাবে! পোকা-মাকড়দের মধ্যেও ঠিক এমনি কথাবার্তা!

বনে এসে দেখে, ছাগলরা আপন-মনে চরে চরে ঘাস খাচ্ছে…একটিও খোয়া যায় নি।

রাখাল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো…এতখানি পথ হেঁটে এসেছে…বেজায় শ্রম…জিরিয়ে নেবার জন্য।

শুয়ে…ফুরফুরে বাতাসে তন্দ্রা এসেছে…এমন সময় শুনলো…কা-কা-কা … ক্ক-ক্ক-ক্ক…

দেখে, মাথার উপর গাছের ডালে একটা কাক আর একটা কাকিনী। কা-কা-কা কাক বললে—রাখাল যেখানে শুয়ে…জানিস কাকিনী…ঐখানে মাটীর নীচে কি আছে?…ক্ক-ক্ক-ক্ক…কাকিনী বললে—কি আছে রে কাক? কা-কা-কা…কাক বললে—সাতটা বড় বড় কলসী…সোনার মোহরে ভর্তি। শুধু মাটী খোঁড়া…আর কলসীগুলি তোলা! ব্যস…

কাক আর কাকিনীর কথা শুনে রাখাল অবাক! তার তন্দ্রা গেল ছুটে। তখনি চোখ খুলে সে উঠে বসলো।

তাকে বসতে দেখে কাক আর কাকিনী সে-গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে গিয়ে বসলো। রাখাল করলে কি, তার হাতের সেই লোহার ছড়ি দিয়ে খাবলে-খাবলে মাটী তুললো...খানিকটা মাটী তুলতেই দেখে, নীচে এত-বড় গর্ত্ত···আর সে-গর্ত্তে সার-সার সাতটা কলসী!

তাড়াতাড়ি মাটী চাপা দিয়ে ছাগল নিয়ে রাখাল মনিবের কাছে এলো। এসে মনিবকে চুপি চুপি জানালো মোহরের খবর।

শুনে মালিক বললে—চুপ-চুপ-চুপ...টুঁ-শব্দ করিস নে। রাত হোক···আজ অন্ধকার রাত। দুখানা ঠ্যালা-গাড়ী নিয়ে দুজনে তখন চুপি-চুপি যাবো! গিয়ে চুপি-চুপি মোহরের কলসী নিয়ে আসবো। খুব সাবধান···এ খবর যেন পাঁচ-কাণ না হয়!

তারপর অনেক রাত হলে চার দিক যখন নিশুতি—মনিব আর রাখাল দুজনে দুখানা ঠ্যালা-গাড়ী নিয়ে বনে সেই জায়গায় এলো। এসে মাটী খুঁড়ে ধরাধরি করে সাতটা কলসী গাড়ীতে তুলে গর্ত্তে মাটী চাপা দিয়ে গাড়ী নিয়ে দুজনে বাড়ী ফিরলো। দরজা-জানলা বন্ধ করে' ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে মোহর ঢাললো। অফুরন্ত মোহর...লাখো টাকার উপর দাম।

মনিব বললে—শোনো রাখাল, এ-সব মোহর খুব লুকোনো জায়গায় রাতারাতি পুঁতে রাখি। এ সব তোমার। তুমি সন্ধান পেয়েছো...এ মোহর আমি নেবো না। ভগবান আমাকে দেননি, এ মোহর তোমাকে দেছেন। কারো কাছে আর চাকরি করে খেতে হবে না তোমাকে। আস্তে আস্তে বাড়ী-ঘর কেনো...ব্যবসা-বাণিজ্য করো···বিয়ে-থা করো···সুখে থাকবে।

মনিবের কথা শুনে রাখাল তাই করলে। ব্যবসায় সাত কলসী মোহর একুশ কলসী হলো। রাখালের অনেক টাকা হলো। শুধু এই গ্রামে নয়, রাজ্য জুড়ে তার যেমন মান, তেমনি প্রতিপত্তি। রাখালের ক্ষেত-খামার হলো, বাগ-বাগিচা হলো। মাহিনা দিয়ে অনেক চাষী রাখলো। এখন তার তাঁবে কত লোক কাজ করে। তারপর রাখাল বেশ বড় ঘরের একটি সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করলে।···

বিয়ের পর রাখাল একদিন বৌকে বললে—আজ সারা রাত ধরে অনেক খাবার তৈরী করো। নানারকমের খাবার। কাল ক্ষেতে যাবো। আমাদের ক্ষেত-খামারে বাগিচায় কাজ করে প্রায় পাঁচশো লোক ··তাদের কাল পেট ভরে খাওয়াতে চাই...রকমারি খাবার।

লোকজন দিয়ে বৌ সারা রাত ধরে নানারকম খাবার তৈরী করালো।

পরের দিন সে-সব খাবার নিয়ে রাখাল গেল ক্ষেত-খামারে···লোকজনদের ডেকে বললে—এসো ভাই, আজ তোমাদের ছুটি। তোমরা এসে খাওয়া-দাওয়া করো, আমোদ-আহ্লাদ করো।··· তোমাদের হয়ে আমি দেবো রাতে ক্ষেত চৌকি।

তাই হলো। রাখাল একা ঘুরে-ঘুরে সব চৌকি দিচ্ছে···রাখালের গোয়ালে আছে একশো গরু, দুশো ছাগল, আর তিনশো ভেড়া। রাখাল ঘুরে ঘুরে চৌকি দিচ্ছে...দুপুর-রাতে গোয়ালের একটু দূরে রাখাল শুনলো নেকড়ের ডাক···সঙ্গে সঙ্গে গোয়াল চৌকি দেয় যে-সব কুকুর, তারা উঠলো ডেকে। রাখাল তাদের দু-পক্ষের ভাষা বুঝলো। নেকড়েরা হাঁক দিয়ে বললে—কিরে ভাই কুকুর, গোটাকতক ভেড়া দিবি আজ খেতে? তোদেরো ভাগ থাকবে রে। এ-হাঁকের জবাবে কুকুররা বললে—নিশ্চয়! চলে এসো চটপট। আজ মানুষের দল ভূরি ভোজ খাচ্ছে...আমরা কেন ফাঁক পড়ি!···

কিন্তু কুকুরদের দলে ছিল এক বুড়ো কুকুর···তার সব দাঁত গেছে পড়ে; আছে দুটি মাত্র দাঁত। সে বললে—বটে! মনিবের সঙ্গে বেইমানী! আমি বেঁচে থাকতে কোনো নেকড়ের সাধ্যি আছে··· ঢুকুক তো দেখি গোয়ালে!

রাখাল তাদের কথা শুনলো।···শুনে সে-রাত্রে কিছু করলে না।

পরের দিন সকাল হলে রাখাল চাকরদের দিলে হুকুম—বুড়ো কুকুরটা বাদে বাকী সব কুকুরকে এখনি মেরে ফ্যালো। দমাদ্দম লাঠি পিটে···

হুকুম শুনে চাকররা অবাক! বললে—এ সব কুকুর কিন্তু অনেক দাম দিয়ে কেনা!

রাখাল বললে—কুছ পরোয়া নেই! হোক দাম দিয়ে কেনা। দয়া নয়, মায়া নয়। আমি চাই এখনি ওদের জান নিতে।···

চাকরদের হুকুম দিয়ে বৌকে নিয়ে বাড়ী ফিরবে বলে রাখাল উঠে বসলো তার ঘোড়ার পিঠে। বৌ উঠলো ঘুড়ীর পিঠে।

ঘোড়া আর ঘুড়ী চলেছে রাখাল আর তার বৌকে নিয়ে···ঘোড়া চলেছে বেশ তড়বড়-তড়বড় করে···আর ঘুড়ী চলেছে ঠুমুক্ ঠুমুক্ চালে।

ঘুড়ীকে ডেকে ঘোড়া বললে—আমার মতো এমনি জোর্‌সে আয় না। ঘুড়ী বললে—হুঁ! কি করে যাবো? তুমি চলেছো মনিবকে নিয়ে···তাঁর সরল মন, দরাজ ছাতি···তাই ভার লাগছে না। আমি চলেছি মনিব-ঠাকরুণকে নিয়ে...হুজুগে মেয়েমানুষ...সকলের উপর তম্বি ধমক···মনে যেমন দেমাক, তেমনি ময়লা···ভারী লাগছে কি রকম!

ঘোড়া আর ঘুড়ীর কথা শুনে রাখাল হাসি চেপে রাখতে পারলো না···হো-হো করে হেসে উঠলো। রাখালের হাসি শুনে ঘুড়ীকে চাবুক মেরে পায়ের গুঁতো মেরে বৌ খট্‌খট্ করে ঘুড়ী চালিয়ে রাখালের কাছে এলো। এসে জিজ্ঞাসা করলে,—হাসলে কেন গো হঠাৎ অমন হা-হা করে? কি হয়েছে?

রাখাল বললে—এমনি হেসেছি···হাসি পেলো, তাই হেসেছি।

বৌয়ের মুখ উঠলো ফুলে! বৌ বললে—এমনি বুঝি মানুষের হাসি পায় কখনো? কি যে ন্যাকা বোঝাও আমাকে! নিশ্চয় কিছু হয়েছে...তাই হেসেছো। বলো আমাকে, কেন হাসলে?

রাখাল বললে—সত্যি কথা বলছি বৌ। এমনি···শুধু শুধু হেসেছি। হাসবার মতো কিছু হয়নি। সত্যি-সত্যি-সত্যি···তিন সত্যি করছি।

চোখ ঘুরিয়ে বৌ বললে—থাক, থাক···আমি কচি খুকী নই যে যা-তা বলে আমাকে বোঝাবে!

রাখাল যত বলে, কিছু নয়! বৌ তত ফোঁশ্‌ ফোঁশ্‌ করে! কিছুতে'ই তার তাগিদ থামে না!

শেষে অতিষ্ঠ হয়ে রাখাল বললে—চুপ করে থাকো বৌ···আর জিজ্ঞাসা করো না। তোমায় যদি বলি, কেন হেসেছি···তাহলে তখনি আমার মৃত্যু হবে।

মুখ বাঁকিয়ে বৌ বললে—তাও না কি হয় কখনো? এমন কথা শুনিনি কোনোকালে!···

বৌ গজগজ করতে লাগলো...রাখাল আর কোনো কথা না বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে···

দুজনে বাড়ী এলো।···

বাড়ী ফিরেও বৌয়ের গজ্‌-গজ্‌ আর ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌নি···সারা রাত সে রাখালকে ঘুমোতে দিলে না। বেচারীর তন্দ্রা আসে, বৌ অমনি কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে—বলো না...কেন হেসেছিলে? না শুনলে আমার ঘুম হবে না···বিছানায় শুয়ে কেবলি আই-ঢাই করবো!

রাখাল বেচারা দাঁতে দাঁত দিয়ে জেগে কোনোমতে রাত কাটালো।

পরের দিন...সকাল হলে রাখাল ছুতোর ডাকিয়ে একটা কফিন তৈরী করালো।

সকলে অবাক! কে মরেছে? কাকে গোর দেবার জন্য কফিন বানানো?

কফিন তৈরী হলে সে-কফিন বাড়ীর ফটকের সামনে রেখে রাখাল বললে বৌকে,—এসো আমার সঙ্গে। কফিনে শুয়ে আমি বলবো, কেন তখন হেসেছিলুম। বলবামাত্র তো মৃত্যু...তাই কফিনে শুয়ে বলবো। মরে গেলে কষ্ট করে আর আমার দেহখানাকে কফিনে তুলতে হবে না!

এ কথা বলে' রাখাল কফিনের মধ্যে বসলো। বৌয়ের সেজন্য চিন্তা নেই। মন হালকা হবে··· এবারে শুনতে পাবে তো!

রাখালের লোকজন এসে সব কফিন ঘিরে দাঁড়ালো। কারো মুখে কথা নেই। সকলে একেবারে হতভম্ব! সেই বুড়ো কুকুরটাও এলো···তার চোখে জল···চুপ করে সে চেয়ে আছে মনিবের পানে।

রাখাল বৌকে বললে,—কুকুরটাকে খাবার এনে দাও। আমার সামনে ও খাবে...মরবার আগে আমি দেখে যাবো।

বৌ তখনি নিজে গিয়ে বুড়ো কুকুরের জন্য রুটী এনে প্লেটে করে তার সামনে দিলে ধরে।··· সে রুটীর পানে কুকুর তাকালো না···জল্‌জল্‌ চোখে চেয়ে রইলো মনিবের দিকে।...

ওদিকে একটা বড় মোরগ ঘুরছিল···প্লেটে রুটী দেখে কোক্‌-কোঁকোর-কোঁ করে পাখা ছড়িয়ে সে এলো ছুটে।

প্লেটে মুখ দেবে, কুকুর দিলে তাকে ধমক। বললে—বেইমান্‌...পেটের চেষ্টায় ঘুরছিস্‌ খালি! মনিব এদিকে মরতে চলেছে···

কুকুরের ধমক খেয়ে মোরগ তার পানে চেয়ে তাচ্ছল্যের হাসি হাসলো···হেসে মোরগ বললে— মরবে না তো কি! আহাম্মক মানুষের মরাই উচিত। আমার ঘরে আমার আছে একটা নয়, দুটো

নয়, একশো বৌ···একটি যবের শীষ পেলে সেই একশো বৌকে আমি ডাকি। তারা এসে আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা দাঁড়ালে তাদের সামনে তাদের সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি সেই যবের শীষ ঠোঁটে ধরে' নিজে খাই···কাউকে একটি দানা দিই না। বৌয়েদের মধ্যে কেউ যদি কিছু বলতে আসে, এ্যায়সা ঠোক্কর তাকে দি যে কেউ আর টুঁ করতে পারে না! হুঁঃ···মনিবের তো মোটে একটা বৌ! আমি একশো বৌকে দাবে রাখি, আর মনিব যখন তার ঐ একটা বৌকে দাবিয়ে রাখতে পারেনা, তখন বৌয়েয় খেয়াল মেটাতে মরবে না তো কি!

মোরগের কথা রাখাল শুনলো। যেমন শোনা, কফিন থেকে তড়াক্ করে উঠে বৌয়ের মাথার চুলের ঝুঁটি ধরলো চেপে—ধরে বৌকে এক আছাড়! আছাড় দিয়ে রাখাল বললে,—এখনো শোনবার সখ আছে, কেন আমি হেসেছিলুম? বলো···বলো···বলো···

বলতে বলতে বৌয়ের চুলের ঝুঁটি ধরে পাথরের উপর তার মাথা দিচ্ছে ঠুকে ঠকাঠক্ ঠকাঠক্!···

চীৎকার করে বৌ বলে উঠলো—না, না, না...ওগো...আমি শুনবোনা...শুনতে চাইনা! কক্খনো শুনতে চাইবো না, তুমি কেন হেসেছিলে!

ওষুধ ধরেছে দেখে বৌকে রাখাল দিলে ছেড়ে।···

তার পর থেকে বৌয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা। আর কোনো দিন সে রাখালের কথা অমান্য করেনি—কারো গোপন-কথা শোনবার জন্য বৌয়ের মনে ইচ্ছাও আর কখনো হয়নি!

খোঁড়া শেয়াল

সেই আদ্দিকালের কথা !

দানুব নদীর ধারে থাকে এক চাষা। চাষার তিন ছেলে। বড় ছেলের নাম পীটার, মেজোর নাম পল, আর ছোটর নাম মাইকেল। পীটার আর পল—এদের বেশ গ্যাটাগোটা চেহারা···মুখে কোঁকড়া গোঁফ...কালো কুচ্‌কুচে চাট্টি করে দাড়ি। দুজনে ভারী চালাক। সকলের সঙ্গে মেশে, সকল কথায় কথা কয়। ছোট মাইকেল কিন্তু চেহারায় আর স্বভাবে দাদাদের মতো নয়···রোগা ডিগডিগে শরীর ...মানুষ দেখলে সরে যায়···কথা কইতে পারে না। বড্ড লাজুক...বড্ড মুখচোরা। বাপ আর পাড়াপড়শী···এর জন্য সকলে তাকে বলে, বোকা ! ছেলেদের মা নেই। মা মারা গেছে··· ছেলেরা তখন খুব ছোট।

তিন ছেলে বাপের ক্ষেতে বেশ মন দিয়ে কাজ করে। তাদের কাজের গুণে এক্ষেতে যেমন ফশল ফলে, এমন আর ও-তল্লাটে কারো ক্ষেতে ফলে না। তাছাড়া এ ক্ষেতের আঙুর যেমন মিষ্টি···এমন আঙুর সারা বলকান-মুল্লুকে মেলে না।···

একদিন সন্ধ্যার সময় তিন ছেলে ক্ষেত থেকে কাজ সেরে বাড়ী ফিরলো...ফিরে দেখে, বাপের চেহারা যেন কেমন-কেমন ! অন্য দিনের মতো বাপের মুখে হাসি নেই। মুখ ভারী। আর বাপের দু-চোখের একটিতে হাসির ঝিলিক···আর এক চোখে হাপুশ ধারে জল ঝরছে।

দেখে তারা পা টিপে-টিপে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো, খাবার খেলে ; তারপর তিনজনে বসলো পরামর্শ করতে। বাপের কি হলো, সে সম্বন্ধে কে যাবে বাপের কাছে জিজ্ঞাসা-বাদ করতে ? শেষে পরামর্শে ঠিক হলো, পীটার সবার বড়—তার উচিত, খবর নেওয়া।

পরামর্শ-মতো পীটার গেল বাপের কাছে। গিয়ে চোয়াড়ের মতো জিজ্ঞাসা করলে বাপকে …এ আবার তোমার হলো কি? এক চোখ দিব্যি…অন্য চোখে জল! এমন তো কখনো দেখিনি, শুনিওনি!

পীটারের কথা শুনে বাপ উঠলো চটে…এর আগে বাপকে ছেলেরা কখনো চটতে দেখেনি কোনো দিন। বাপের মেজাজ চিরদিন ঠাণ্ডা। চটে বাপ করলে কি, পাশে ছিল একখানা ধারালো চাকু-ছুরি…সে-খানা তুলে ধাঁইসে মারলো ছেলে পীটারের রগ তাগ করে। পীটার দিলে ছুট! ছুরিখানা তার গায়ে লাগলোনা…তাগ ফশকে সেটা লাগলো ঘরের কপাটে। যেমন লাগা, ছুরিখানা কপাটে বিঁধে গেল টাইট্ হয়ে!

বড় এসে খবর দিলে না কিন্তু, কি হয়েছে।

মেজো বললে—কি হয়েছে…খবর পেলে দাদা?

বড় বললে,—না। তুই যা, জিজ্ঞাসা করে আয়।

তখন মেজো গেল বাপের কাছে।… বেশ বুক চিতিয়ে বাপকে জিজ্ঞাসা করলে—হয়েছে কি? খেটে খুটে এলুম, তোমার এমন হাঁড়ি-মুখ…একচোখে জল ঝরছে, আর এক চোখ শুক্‌নো!

কথা শেষ হলো না…বাপ কটমটিয়ে তাকালো মেজো ছেলের পানে। বাঁ দিকে পড়ে ছিল একখানা খুর্পী…সেখানা তুলে ছুড়লো মেজোর মাথা তাগ করে'। খুর্পী তুলতে দেখেই মেজো সরে পড়লো…খুর্পীখানা তার মাথায় না লেগে বিঁধলো দরজার আর একখানা কপাটে…মেজো দিলে ভোঁ-দৌড়।

মেজো এলো বড়র কাছে…তুজনে চোখ-চাওয়া-চাওয়ি হলো। তুজনেই চোখ টিপলো!

ছোট জিজ্ঞাসা করলে—খবর পেলে মেজদা?

মেজো বললে—না। বাবা ঢুলছে…আমার কথা শুনতে পেলে না। তুই গিয়ে একবার ছাখ —যদি খবর পাস।

ছোটকে ব্যাপারখানা বড় মেজো মোটেই খুলে বললে না। ছোট গেল বাপের কাছে। সরল মনে জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার কি হয়েছে বাবা? ডান চোখে জল নেই, বাঁ চোখে জল… মুখ এমন শুক্‌নো…

বাপ কটমটিয়ে তাকালো ছোটর পানে…চেয়েই…সামনে ছিল একখানা কাস্তে…সেই কাস্তেখানা ছুড়লো ছেলের বুক তাগ করে। তাগ ফশকালো! কাস্তেখানা ছোটর বুকে না লেগে লাগলো ঘরের ছ্যাঁচা বেড়ায়…লাগবামাত্র বেড়ায় আটকে সেটা ঝুলতে লাগলো।

ছোট পালালো না…আস্তে আস্তে বেড়া থেকে কাস্তেখানা খুলে বাপের হাতে এনে দিলে, দিয়ে বাপের পানে চেয়ে ডাকলো—বাবা…

বাপ এবার খুশী হলো। খুশী হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছোটকে বুকে টেনে বাপ বললে—তুমি ভালো ছেলে বাবা…তোমাকেই আমি বলবো আমার তুঃখের কারণ। আমার একচোখে জল নেই, হাসি, …এর মানে আমার তিন-তিনজন ছেলে…তিনজনেই কৃতী। কুড়ে নয়…বাপের কথা শোনে, কাজ

করে, ফাঁকি জানে না। এই আনন্দে আমার ডান চোখ হাসছে! আর বাঁ চোখ আমার কাঁদছে কেন, জানো? আঙুর-বাগ থেকে একটি আঙুর চুরি গেছে। সে-আঙুরের গুণ হলো, ঐ একটি আঙুরের রস থেকে বারো বালতি সেরা সরবৎ হয়। সে আঙুরটির উদ্ধার না হওয়া ইস্তক আমার এ-চোখের জল বন্ধ হবে না!

—বটে! ছোট বললে—আমরা রয়েছি তোমার তিন-তিন জন ছেলে। আমরা থাকতে তোমার আঙুর উদ্ধার হবেনা, এ কখনো হয়? আমরা যদি সে আঙুর না উদ্ধার করে আনতে পারি, তাহলে আমরা কুপুত্তুর।

ছোট এসে বড়-মেজোকে বললে বাপের দুশ্চিন্তা-দুঃখের কথা। শুনে মনে মনে তারা চটলো। ছোটর উপর তাদের আক্রোশ হলো। হুঁ···আমরা বড় মেজো···চালাক চতুর, কাজের মানুষ, আমাদের না বলে এই বোকাটাকে বাপ বলেছে তার দুঃখ-দুশ্চিন্তার কথা!

কিন্তু সে ভাব তারা চেপে গেল—প্রকাশ করলে না।

ছোট বললে—চলো, আমরা আঙুরের সন্ধানে বেরুই।

বড় মেজো বললে—নিশ্চয় বেরুবো।

তখন পরামর্শ হলো।···

পীটার বললে—বেরিয়ে একসঙ্গে আমরা সেই তেমাথা পর্য্যন্ত যাবো···তারপর ছাড়াছাড়ি। ছোট যাবে সোজা উত্তর দিকে···আমি বেঁকবো ডান দিকের রাস্তায়···আর মেজো যাবে বাঁয়ের পথে। তিনদিন তিন রাত্রি সমানে আমরা চলবো···আঙুরের সন্ধান পাই আর না পাই! চার দিনের দিন তিনজনে এসে একত্তর হবো ঐ তেমাথায়। তারপর যেমন-যেমন ঘটে, সেই রকম ব্যবস্থা হবে।...

ছোট মাইকেল বললে—বেশ! আমি তাহলে তৈরী হই। তোমরাও চটপট তৈরী হও।

বড় মেজো বললে—হ্যাঁ।...

ছোট চলে গেলে বড় বললে মেজোকে—ছোট যাক সোজা উত্তর দিকে। উত্তরে আছে গভীর বন। সে-বনে জন-মানবের চিহ্ন নেই। সেখানে শুধু বাঘ-ভাল্লুক বরা-সিঙ্গী আর দত্যি দানার বাস ...আমরা যে দুটো পথে যাবো, তার ডাইনে-বাঁয়ে দুটো পথই খানিক এগিয়ে পরে মিশে আবার এক হয়েছে। কাজেই আমরা দুজনে একসঙ্গেই যাবো বরাবর।

গ্রীষ্মকাল। শীতের বালাই নেই। তিন ভাই বেরুলো আঙুরের সন্ধানে।

তেমাথায় এসে পৌছুলো। এবার আর একসঙ্গে নয়···তিনজনে ছাড়াছাড়ি। বাড়ী থেকে রুমালে বেঁধে খাবার এনেছিল, মাংস আর রুটী···তিনজনে খেতে বসলো।...

খাচ্ছে···হঠাৎ একটা ল্যাজ-কাটা শেয়াল-ছানা এসে খাবারের কাছে ঘুর-ঘুর করতে লাগলো। শুধু ল্যাজ কাটা নয়, তার আবার একটা ঠ্যাঙও ভাঙা।

তিন-ঠ্যাঙে সে এসে তিন ভাইয়ের সামনে দাঁড়ালো একটুকরো রুটির প্রত্যাশী হয়ে। জুল্-জুল্ চোখে কি গভীর মিনতি!···ভাইয়েরা তাকে কিছুই দিলে না। দিতে মায়া হয়...বাড়ীর তৈরী এমন চমৎকার রুটী...সে রুটী থেকে একটা খোঁড়া শেয়াল-ছানাকে ভাগ দেওয়া চলে না! যত তাকে তাড়া দেয় 'যা-যা' বলে, শেয়াল-ছানা তত আসে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে···শেষে ইট ছুড়ে বড়-মেজো দুই ভাই তাকে দিলে তাড়িয়ে। মারের ভয়ে শেয়াল-ছানা পালিয়ে গেল।

তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকলে তিনজনের তিন দিকে যাত্রা।

ছোট ভাই চলেছে গভীর বনে···খানিক যাবার পর এ পথে লোকালয়ের চিহ্ন নেই,···শুধু ধূ-ধূ মাঠ···তারপর জলা বিল, ঝোপ ঝাড় আর বন জঙ্গল।

চলে চলে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় ছোট বসলো এক ঝর্ণার ধারে···বসে জিরিয়ে নিয়ে সে রুমাল খুললো খাবার খাবে বলে।

মুখে খাবার তুলবে, সেই খোঁড়া শেয়াল-ছানা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে হাজির। তার দুচোখে মিনতি!

ছোটর মায়া হলো! আহা, বেচারী···খিদের জ্বালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! নিজের মুখের খাবার সে দিলে শেয়াল-ছানার মুখে···দুজনে ভাগ করে খাবার খেলে।

খেয়ে খুশী হয়ে শেয়াল-ছানা জিজ্ঞাসা করলে—গভীর অরণ্যে তুমি কোথায় চলেছো গো? কি কাজে?

ভারী মিষ্টি মেয়েলি-গলা। শেয়াল-ছানার মুখে মানুষের ভাষা শুনে ছোট একেবারে অবাক! সে তখন শেয়াল-ছানাকে সব কথা খুলে বললে।

শুনে শেয়াল-ছানা বললে,—বুঝেছি। কিন্তু চোরাই-আঙুর কি করে' তুমি পাবে! যে চুরি করেছে, নিশ্চয় সে খেয়ে ফেলেছে। তবে হ্যাঁ, এক উপায় আছে...

ছোট বললে—কি উপায়?

শেয়াল-ছানা বললে,—এখান থেকে অনেক অনেক দূরে···উত্তর দিকে গেলে মস্ত এক নদী পাবে—সেই নদীর ধারে আছে এক রাজা···সেই রাজার বাগানে আঙুর গাছ আছে। সেই গাছের একটা ডালে···যে-আঙুরের খোঁজ করছো···সেই জাতের আঙুর পাবে। তার একটি আঙুরের রসে বারো বালতি সরবৎ হয়।...সেইখানে পাবে তোমার আঙুর···কিন্তু পাওয়া মুস্কিল। রাজার এই আঙুর-বাগের ফটকে বারো জন কালো দ্বারী দিন-রাত পাহারা দিচ্ছে। তাদের নজর এড়িয়ে আঙুর-বাগে ঢুকতে হলে ফিকির চাই—নাহলে ঢোকা যাবে না। তারা আবার চোখ খুলে ঘুমোয়। তারপর সে আঙুর পাড়া! দেখবে, গাছের গোড়ায় আছে দুটি আঁকশি—তার একটা সোনার, আর-একটা কাঠের। সোনার আঁকশি দিয়ে যদি আঙুর পাড়ো, তাহলে গাছ শীষ দিয়ে উঠবে। সে শীষের শব্দে দ্বারীরা উঠবে জেগে।...তুমি যদি আমার ল্যাজ ধরে গাছের গোড়ায় যাও, তাহলে আমি দেখতে পারি!···

মাইকেল বললে—বেশ, তাই যাবো।

খোঁড়া শেয়াল বললে—ধরো তবে আমার ল্যাজ।

ল্যাজ তার কাটা···একরত্তি···মাইকেল ধরলো সেই ল্যাজের ডগা! যেমন ধরা, শেয়াল দিলে ছুট। ছোটা, না, ওড়া! মাইকেলের চোখের সামনে গাছপালা, বন-বাদাড়, জলা-বিল খাল-নদী ···পাহাড়-পর্ব্বত···যেন কুয়াশায় ঢাকা ছবির মতো হাওয়ার গতিতে সরে সরে যেতে লাগলো!

ক'ঘণ্টার মধ্যে শেয়াল তাকে এনে পৌঁছে দিলে রাজার বাগানের ফটকে। পৌঁছে দিয়ে বললে—যা বলে দিয়েছি...ঢোকো তুমি ফটকে। আমি দূরে ঐ ঝোপের পিছনে থাকবো।

খোঁড়া শেয়াল গিয়ে ঢুকলো ঝোপে···মাইকেল ঢুকলো বাগানের ঝুলন ফটকের মধ্যে··· পা টিপে টিপে চললো। বারো জন কালো দ্বারী তার পানে চেয়ে দেখলো কটমট করে···মাইকেল তাদের পানে তাকালো না···তাদের পাশ দিয়ে সোজা বাগানে এলো—আঙুর-গাছের সামনে। এসে দেখে, আঙুর গাছের বিরাট ঝাঁক···আর এ সব গাছের আঙুর ফেটে রস ঝরছে ফোয়ারার মতো...শত-সহস্র ধারে! সে-ধারা জমছে বারোটা বড় বালতি পাতা আছে, সেই বারোটা বালতির মধ্যে।···গাছের কাছে পড়ে আছে দুটো আঁকশি···একটা সোনার, আর-একটা কাঠের।···

দেখে মাইকেল খুব-খুশী। এত ভয়ানক খুশী যে খোঁড়া শেয়ালের কথা সে ভুলে গেল। ভুলে সোনার আঁকশি হাতে নিলে। যেমন সে আঁকশি নেওয়া, অমনি গাছ-ভরে শীষের আওয়াজ। সে শব্দে গাছের পাহারাদাররা জেগে উঠে মাইকেলকে ধরে তার হাত পা কষে বেঁধে ফেললো।

বেঁধে তাকে নিয়ে এলো রাজার সভায় রাজার কাছে। মাইকেলের বরাত ভালো...রাজা সদ্য তখন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে রুটী খেয়ে খুশী-মনে সভায় এসে বসেছেন, মেজাজ বেশ সরীফ্। তিনি বললেন—ব্যাপার কি? একে বেঁধে আনবার মানে?

পাহারাদাররা বললে—লোকটাকে আঙুর-বাগে পাওয়া গেছে। সোনার আঁকশি হাতে নিয়ে আঙুর চুরি করছিল।

শুনে রাজা বললেন মাইকেলকে,—এমন খেয়াল হলো কেন তোমার?

মাইকেল তখন আঙুর নেবার বৃত্তান্ত খুলে বললে।

শুনে রাজা বললেন—বেশ, তোমাকে আমি আঙুর গাছ দেবো...কিন্তু সর্ত্ত আছে।

মাইকেল বললে—বলুন আপনার সর্ত্ত।

রাজা বললেন,—আমার সর্ত্ত, এ গাছ পেতে হলে তোমাকে আগে এনে দিতে হবে আমার জন্য একটি সোনার আপেল-গাছ···সে গাছে একদিনে আপেল ফলে।

রাজার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বারো জন কালো দ্বারী হাত-পা বাঁধা মাইকেলকে ধরে ছুড়ে ফেলে দিলে রাজপুরীর উঁচু পাঁচিলের বাইরে। পাঁচিল টোপকে মাইকেল ধুপ করে গিয়ে পড়লো শক্ত পাথরের উপর···পড়ে তার হাত-পা গেল ছেঁচে।

শব্দ শুনে শেয়াল এলো ছুটে। এসে দেখে, যা-ভয় করেছিল, তাই হয়েছে!

শেয়াল বললে—ছি ছি ছি...আমার কথা শোনোনি! গিয়ে নিশ্চয় সোনার আঁকশি তুলেছিলে! এখন কি হবে, বলো তো?

মাইকেল বললে তাকে রাজার সঙ্গে যে-কথা হয়েছে।

শুনে খোঁড়া শেয়াল বললে—ভয় নেই। এসো। অনেক দূর যেতে হবে। ধরো আবার আমার ল্যাজ, বেশ চেপে ধরো···যেন হাত না ফশ্‌কে যায়!···

মাইকেল চেপে ধরলো খোঁড়া শেয়ালের ল্যাজ। মাইকেলকে নিয়ে শেয়াল আবার ছুটলো··· এবার আরো জোরে ছুট···বাতাসের চেয়েও জোরে···

পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, সাগর পার হয়ে শেয়াল এসে দাঁড়ালো চমৎকার এক বাগানের সামনে। এমন সুন্দর বাগান···মাইকেল জন্মে কখনো ছাখেনি! কত রকমের ফুল···কত রকমের ফল··· ঝর্ণা আর বাতাসে কি চমৎকার গন্ধ...সে গন্ধে মানুষ সব কিছু ভুলে যায়।

শেয়াল বললে—চট্‌পট্ যাও এই বাগানের মধ্যে। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার···এখানেও ফটকে আছে বারো জন কালো দ্বারী···গাছ পাহারা দিচ্ছে। তারা চোখ চেয়ে ঘুমোয়। আর গাছের গোড়ায় দেখবে দুখানা কুড়ুল। একখানা কাঠের, আর একখানা সোনার। সোনার কুড়ুল খবর্দ্দার ছুঁয়ো না···ছুঁলেই দ্বারীরা উঠবে জেগে, আর তোমায় করবে গ্রেফ্‌তার। কাঠের কুড়ুলটা নিয়ে মেরো আপেল গাছের গায়ে কোপ···তাহলেই...বুঝলে?

মাইকেল বললে—বুঝেছি। এবারে খুব হুঁশিয়ার হবো।

বাগানের ফটকে ঢুকলো মাইকেল। শেয়াল গিয়ে লুকোলো বাগানের বাহিরে এক গর্ত্তে।

বাগানে এসে গাছের কাছে মাইকেল দেখে, দু'ইখানা কুড়ুল...একখানা সোনার, আর একখানা কাঠের। গাছের পানে চেয়ে মাইকেল দেখে, গাছে থোলো থোলো আপেল ঝুলছে···কি চমৎকার আপেলের খোশবু আর কি টুকটুকে রঙ!

মাইকেল একেবারে মোহিত!...মোহিত হয়ে ভুলে সে সোনার কুড়ুল হাতে নিলে।

যেমন সোনার কুড়ুলে হাত···দ্বারীরা উঠলো জেগে···মাইকেলকে ধরে তার পিঠে শপাৎ-শপাৎ করে চাবুক! চাবুক মেরে পিছমোড়া করে বেঁধে তাকে নিয়ে বাগানের রাজার কাছে এলো।

সদ্য খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজা সভায় বসেছেন। মেজাজ তাই ভালো...মাইকেলকে দেখে তিনি বললেন—ব্যাপার কি?

দ্বারীরা বললে ব্যাপার।···

রাজা বললেন,—কি হে ছোকরা—দ্বারীদের কথা সত্য?

মাইকেল বললে—হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা বললেন,—এমন মতি কেন হলো তোমার?

মাইকেল তখন বললে তার বৃত্তান্ত।

শুনে রাজা বললেন—আপেল গাছ তোমায় দিতে পারি···কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে

—বলুন আপনার সর্ত্ত।

রাজা বললেন—আমাকে একটি সোনার পক্ষীরাজ ঘোড়া এনে দিতে হবে...সে-ঘোড়ার পিঠে থাকবে দুখানি সোনার ডানা'!

রাজার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাইকেলকে তুলে দ্বারীরা ছুড়ে দিলে বাগানের উঁচু পাঁচিলের ওধারে।

খোঁড়া শেয়াল এসে আবার ধমক দিলে। বললে—ছি-ছি-ছি, এমন তোমার ভোলা মন!... এবারেও সেই ভুল করেছো!

মাইকেল বললে—হ্যাঁ।

তারপর মাইকেল বললে শেয়ালকে এখানকার সর্ত্তের কথা।

শুনে খোঁড়া শেয়াল বললে—ধরো আমার ল্যাজ। যেখানে সোনার ঘোড়া পাবে, নিয়ে যাই। সে ঘোড়ার আস্তাবলের সামনে নিয়ে গিয়ে আমি তোমায় নামিয়ে দেবো। এ ঘোড়া যদি আনতে না পারো, তাহলে তোমায়-আমায় ছাড়াছাড়ি। আর আমি তোমার কোনো কাজ করতে পারবো না—নিজের বাসায় চলে যাবো।...বুঝলে?

মাইকেল আবার খোঁড়া শেয়ালের ল্যাজ ধরলো চেপে...

সাত দিন সাত রাত ছুটে ছুটে আট দিনের দিন খোঁড়া শেয়াল মাইকেলকে এনে পৌঁছে দিলে সোনার ঘোড়ার আস্তাবলের সামনে। দিয়ে বলেল—তোমার জন্য আমি বসে থাকবো দূরে ঐ গাছতলায়। তুমি মোদ্দা খুব হুঁশিয়ার,...এখানেও দেখবে বারো জন কালো দ্বারী—চোখ চেয়ে তারা ঘুমোয়। ঘুমোতে ঘুমোতে ঘোড়া পাহারা দেয়। তাদের পাশ দিয়ে গিয়ে আস্তাবলে ঢুকবে। সেখানে গিয়ে দেখবে, ঘোড়া আছে। আর দেখবে, ঘোড়ার পাশে দুশেট জিন-লাগাম। এক শেট সোনার, আর এক শেট চামড়ার। সোনার জিন-লাগাম নিলে ঘোড়া জেগে উঠবে...চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডাকবে। সে ডাকে দ্বারীদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে আর তাদের ঘুম ভাঙ্‌লেই ঘটবে সর্ব্বনাশ! খুব হুঁশিয়ার মোদ্দা!

হুঁশিয়ার হয়ে আস্তাবলে ঢুকলো মাইকেল। দ্বারীদের পাশ দিয়ে আস্তাবলে এসে ঘোড়া দেখলো। ধপধপ করছে সাদা রঙ...ঘাড়ের লোমে সোনালি আভা!...দেখে এবারো এমন খুশী হলো মাইকেল যে শেয়ালের কথা ভুলে গেল। ভাবলো, এমন চমৎকার ঘোড়া...এ ঘোড়ার অঙ্গে চামড়ার জিন চাপালে মানাবে কেন! এই ভেবে সে দিলে সোনার শেটে হাত!

যেমন হাত দেওয়া, ঘোড়া উঠলো ডেকে—চিঁ-হিঁ-হিঁ।

সে ডাকে দ্বারীদের ঘুম ভাঙ্‌লো। দ্বারীরা উঠে মাইকেলকে ধরে গোবড়েন দিলে, দিয়ে কষে বাঁধলো...বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে এলো।

রাণীর সঙ্গে পাশা খেলায় রাণীকে হারিয়ে রাজা সদ্য তখন সভায় এসে বসেছেন, মেজাজ খুব ভালো—এমন সময় সভায় বন্দী মাইকেলকে নিয়ে দ্বারীদের প্রবেশ।

রাজা সব বৃত্তান্ত শুনলেন। শুনে বললেন—বেশ, এ ঘোড়া তোমায় দিচ্ছি। এ ঘোড়ায় চড়ে আমার জন্য তোমাকে নিয়ে আসতে হবে সোনার বরণ কন্যা—রোদে-জলে-হিমে সে কন্যার সোনার

রং এতটুকু মলিন হয়নি। এনে দিতে যদি না পারো, আমার ঘোড়া আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে,—নিয়ে যেতে পাবে না! ছাখো, রাজী?

মাইকেল বললে,—বেশ, আমি রাজী।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাইকেল বেরুলো রাজপুরী থেকে···খোঁড়া শেয়াল বললে—কি করে এলে?

মাইকেল বললে রাজার সঙ্গে যে সর্ত্ত হয়েছে, সেই কথা।

শুনে খোঁড়া শেয়াল চটে আগুন...দাঁত খিঁচিয়ে ল্যাজ নেড়ে মাইকেলকে দিলে ধমক···বললে—তুমি ভয়ানক আহাম্মক! তোমার জন্য আমি আর কিছু করবো না...সোজা আমি বাড়ী চলে যাবো।

মাইকেল অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, বললে—শেষ বারের মতো, লক্ষ্মীটি...এই শেষবার···আর আমার ভুল হবে না।

কাকুতিতে খোঁড়া শেয়ালের রাগ গেল পড়ে। সে বললে—বেশ, কিন্তু এবার শেষ-বার—মনে রেখো।

মাইকেল বললে—মনে থাকবে।

মাইকেলকে নিয়ে খোঁড়া শেয়াল তখন চড়ে বসলো সোনার সেই পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে···ঘোড়া ছুটলো বাতাসের বেগে সোনার বরণ কন্যার রাজ্যে।

খোঁড়া শেয়াল বললে—কন্যা শুয়ে আছেন রাজপুরীর তিন-তলায় সোনার ঘরে সোনার পালঙ্কে ...বাতাস কি রোদ না গায়ে লাগে, তার জন্য সব সময়ে থাকেন সোনার-জালি-মশারির মধ্যে···খুব সাবধানে তাঁকে আনতে হবে, নাহলে রোদ-বাতাস গায়ে লাগলে কন্যার গায়ের রঙ্ মলিন হবে।

পক্ষীরাজ উড়ে চললো সাত সমুদ্রের উপর দিয়ে···সাত রাজ্য পার হয়ে...সাত পাহাড়ের পারে সোনার কন্যার বাপ-রাজার রাজ্যে। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর রাজপুরী...আগাগোড়া সাদা পাথরে তৈরী।

রাজপুরীর ফটকে ঘোড়া থামিয়ে খোঁড়া শেয়াল বললে—ফটক দিয়ে তুমি ঢোকো পুরীর মধ্যে···ঘোড়া নিয়ে আমি থাকবো ঐ বড় দেবদারু গাছের নীচে। সাবধান, যা বলি, অক্ষরে-অক্ষরে মানা চাই। ভুল হলেই বিপদ।

মাইকেল বললে—বলো···এবারে আমি আর ভুল করবো না।

তখন খোঁড়া শেয়াল বললে—এখানেও দেখবে পুরী রক্ষা করছে কালো কালো বারোজন দ্বারী···এরাও চোখ চেয়ে ঘুমোয়। তাদের-পাশ দিয়ে খুব সাবধানে তুমি যাবে। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে হবে। উঠে ডান দিকে সোনার কন্যার ঘর। কন্যার পাশে আছে দুখানা খাটিয়া···তার একটা সোনার, আর একখানা কাঠের। সাবধান, সোনার খাটিয়া ভুলেও ছুঁয়ো না...কাঠের খাটিয়ায় ঘুমন্ত কন্যাকে তুলবে। তুলে পুরীর বাহিরে আনতে হবে।

খোঁড়া শেয়ালের কথা মেনে মাইকেল এলো সোনার কন্যার ঘরে···এসে সোনার কন্যাকে দেখলো ···সোনার রঙ্···রঙের ছটায় মাইকেলের চোখ গেল ঝলসে। তারপর মাইকেল দেখে, দুখানা খাটিয়া। ভাবলো, তাইতো—এমন সোনার কন্যাকে কাঠের খাটিয়ায় তুলবো! শক্ত কাঠ···কন্যার গায়ে বাজবে। ...সোনার অঙ্গ যদি ছড়ে যায়? সঙ্গে সঙ্গে তখনি মনে পড়লো খোঁড়া শেয়ালের কথা...পই-পই করে সে বলে দেছে, সোনার খাটিয়া ছোঁয়া নয়—কাঠের খাটিয়ায় তুলতে হবে। নাহলে বিপদ।...তিন তিনবার বিপদ হয়েছে খোঁড়া শেয়ালের কথা ঠেলে,...এবারে আর ভুল নয়।···

কাঠের খাটিয়ায় ঘুমন্ত কন্যাকে তুলে সে খাটিয়া নিয়ে মাইকেল এলো পুরীর বাহিরে। বাহিরে আসতেই সোনার কন্যার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে চাইলেন···চেয়ে হাসলেন। কন্যার নীল দুটি চোখ···নীলার মতো···হাসিতে ভরা দুটি ঠোঁট···যেন টক্‌টকে রাঙা পলা।···

সোনার কন্যা বললেন,—এত কষ্ট করে সোনার পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় করে নিয়ে গিয়ে শেষে বুড়ো রাজার হাতে আমায় দেবে?

কথা শুনে মাইকেলের মনে খুব দুঃখ হলো। মাইকেল চাইলো খোঁড়া শেয়ালের পানে।

খোঁড়া শেয়াল বললে—আগে তো সেখানে চলো, তারপর দেখা যাবে, কি বিহিত করতে পারি?···

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তিনজনে এলো ঘোড়া-রাজার রাজ্যে। পুরীর বাহিরে ঘোড়া থামিয়ে খোঁড়া শেয়াল বললে—এক কাজ করি···আমি কন্যা সাজি...আমাকে নিয়ে তুমি যাবে রাজার কাছে ···আর সোনার কন্যা থাকবেন ঘোড়ার পাশে...ঐ ঝোপের পিছনে।

এ-কথা বলে খোঁড়া শেয়াল পক্ষীরাজের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো···ঘুরতে ঘুরতে শেয়ালের দেহ খশে বেরুলো রূপসী এক কন্যা···তার সোনার বরণ···ঝকঝক করছে রঙ্! হুবহু সোনার কন্যার মতো...চোখ দুটি শুধু রয়ে গেল শেয়ালের চোখের মতো।

শেয়াল-কন্যাকে নিয়ে মাইকেল এসে বুড়ো রাজার কাছে দাঁড়ালো। কন্যাকে রাজা অনেকক্ষণ ধরে ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন ··সভাসদরাও দেখলেন।

একজন সভাসদ বললেন··তোমার কন্যা দেখছি চমৎকার···সোনার বরণ, সোনার ধরণ···কিন্তু চোখ দুটি শেয়ালের চোখের মতো লাগচে কেন?

এ কথা যেমন শোনা, কন্যার মূর্ত্তি গেল বদলে...কন্যার হলো খোঁড়া শেয়ালের মূর্ত্তি! সে মুর্ত্তি হবামাত্র···খোঁড়া শেয়াল দে ছুট।

কন্যা অদৃশ্য হলো দেখে রাজা চটে উঠলেন তাঁর সেই সভাসদের উপর। রাগে তখনি সভার মধ্যেই রাজা নিলেন সে-সভাসদের গর্দ্দানা।

গোলমালের মধ্যে মাইকেল এলো পুরীর বাহিরে...এসে দেখে, পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই!

খোঁড়া শেয়াল এসে বললে—কি ভাবছো?

মাইকেল বললে—আপেল রাজার পুরীতে যেতে হবে...কিন্তু ঘোড়া? সোনার কন্যাকে এতখানি পথ হেঁটে যেতে হবে, তাই ভাবছি।

খোঁড়া শেয়াল বললে—ভাবতে হবে না···ছাখো, আমি কি করি।

তিনবার চক্কর দিয়ে ঘুরে শেয়াল ধরলো পক্ষী-রাজের রূপ, ধরে মাইকেলকে বললে,—চলো, এবার আমায় নিয়ে তোমার আপেল-রাজার পুরীতে।

মাইকেল এলো আপেল-রাজার পুরীতে। পক্ষীরাজ-শেয়ালকে দেখে রাজা মহা খুশী। সভাসদ-সহিস-ঘেসেড়া-সকলকে নিয়ে ঘোড়া দেখতে লাগলেন। একজন সহিস বললে,—ঘোড়া তো দেখছি, বেশ—কিন্তু এর ল্যাজটা এমন শেয়ালের ল্যাজের মতো কেন?

এ-কথা যেমন শোনা, সহিসকে পিছনের পায়ের এক-চাট মেরে খোঁড়া শেয়াল নিজের মূর্ত্তি ধরে দে ছুট!

মাইকেল এলো বাহিরে···বললে—সোনার কন্যা কি করে যাবে? আপেল গাছ তো পেলুম, কিন্তু এ গাছ আঙুর-বাগের রাজাকে দিতে হবে তো।

খোঁড়া শেয়াল বললে—ভেবো না। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

এ কথা বলে, খোঁড়া শেয়াল ধরলো সোনার আপেল গাছের মূর্ত্তি···গাছে থোলো-থোলো সোনার আপেল ঝুলছে—আপেলগুলো দেখতে কিন্তু শেয়ালের মুখের মতো।

আপেল-গাছ নিয়ে মাইকেল এলো আঙুর-রাজের রাজ্যে...আপেল গাছ দেখে রাজা খুব খুশী ···মাইকেলকে তখনি দিলেন আঙুর গাছ। তার পর সভাসদদের সঙ্গে নিয়ে রাজা আপেল দেখতে লাগলেন।

রাজা বললেন—এ কি রকম আপেল···গোল নয়···দেখতে শেয়ালের মুখের মতো!

যেমন বলা, গাছ ধরলো শেয়ালের-মূর্ত্তি···শেয়ালের মূর্ত্তি ধরেই ছুট। গাছ নেই দেখে রাজা তখনি নিলেন মালীর গর্দ্দানা।

মাইকেল নিয়ে এলো আঙুর গাছ···এসে শেয়ালকে আর দেখতে পেলেনা·· সোনার কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মাইকেল তন্ন-তন্ন খুঁজলো···দুজনের কাকেও পেলেনা। নিশ্বাস ফেলে আঙুর গাছ নিয়ে তখন সে ফিরলো বাড়ীতে বাপের কাছে।···এসে দেখে...বাড়ীতে তার আগেই এসে পৌঁছে গেছে সেই সোনার আপেল গাছ...সোনার পক্ষীরাজ ঘোড়া···আর সোনার বরণ কন্যা।

বাড়ীতে খুব ধুমধাম···আঙুর গাছ দেখে চাষার চোখের জল গেল উবে···দু চোখে হাসির ঝর্ণা ঝরলো।

চাষার শ্রীবৃদ্ধি হলো। সোনার পক্ষীরাজকে রাখা হলো আস্তাবলে···সোনার আপেল-গাছটিকে পোঁতা হলো বাড়ীর উঠোনে···আর আঙুর গাছ রাখা হলো বাগানে।···

আঙুর থেকে রোজ মিষ্টি সরবৎ ভরতি হয় বারো বালতি...সোনা-বরণ কন্যা সোনার আপেল গাছের তলায় বসে হাতীর দাঁতের তৈরী চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ান...

দিন যায়···অনেকদিন পরে বড় ছেলে মেজো ছেলে বাড়ী ফিরলো শুধু হাতে···কোনো খানে তারা আঙুর পায়নি—আঙুর গাছও পায়নি।

ছোটর জয়-জয়কার দেখে হিংসায় বড় মেজোর গা উঠলো জ্বলে···ছোট শুধু আঙুর গাছ আনেনি ···সোনার আপেল গাছ, সোনার পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার বরণ কন্যা এনেছে!

দুজনে পরামর্শ করে একদিন ছোটকে বললে—চলো, ঐ যে বড় দীঘি আছে, আমরা সেখানে মাছ ধরতে যাই।

ছোটর মনে সন্দেহ নেই—সে রাজী হলো।

তিন ভাই গেল মাছ ধরতে...ছোট বসে মাছ ধরছে...এমন সময় পা টিপে-টিপে পিছন থেকে এসে বড আর মেজো তাকে দিলে ধাক্কা। সে ধাক্কায় ছোট জলে পড়ে গেল। দীঘিতে অথৈ জল... আচমকা জলে পড়ে ছোট ডুবে যায় আর কি,···এমন সময় ঘাসে-পাতায় উঠলো খড়-খড় শব্দ! বড় মেজো ভাবলো, কে আসছে...ধরা পড়ে যাবে। ···তারা ছুটে পালিয়ে যাবে দীঘির ধার থেকে, এমন সময় খড়-খড় শব্দ করে দীঘির ধারে এলো সেই খোঁড়া শেয়াল···এসেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাইকেলকে ডাঙ্গায় টেনে তুললো...

ডাঙ্গায় উঠে মাইকেল দেখে, কোথায় সে খোঁড়া শেয়াল! দেখতে দেখতে শেয়াল হলো তার সামনে পরমা সুন্দরী কন্যা! মাইকেল অবাক্···মনে হলো, স্বপ্ন দেখছে!

হেসে কন্যা বললে—অবাক হয়ে গেছ...ভাবছো স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন নয়···আমি আসলে শেয়াল নই...পরী-রাজার কন্যা। বাবার এক শত্রুকে আমি গারদ থেকে খালাশ করে দিয়ে ছিলুম। বাবা জানতে পেরে আমাকে শাপ দিয়ে খোঁড়া শেয়াল করে দেয়। বলেছিল, কোনো দিন যদি কাকেও তুমি মহা'বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারো, তবেই আবার পরী হবে; নাহলে চিরকাল খোঁড়া শেয়াল হয়ে তোমাকে থাকতে হবে।...

এ কথা বলে ডানা মেলে পরী-কন্যা গেল আকাশে উড়ে···

মাইকেল বাড়ী এলো। তার পর···সুখের আর সীমা নেই। ভালো দিন দেখে সোনার কন্যার সঙ্গে চাষা দিলে মাইকেলের বিয়ে। বড় মেজো ছেলেদের কীর্ত্তির কথা শুনে বাপ দিলে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে···মাইকেল হলো চাষার ক্ষেত-খামার বাগ বগিচা...সব-কিছুর মালিক।

মণ্টিনিগ্রোর রাজা। রাজার তিন ছেলে আর তিন মেয়ে। রাজার মরণ-সময় উপস্থিত। তিন ছেলেকে রাজা ডাকলেন তাঁর কাছে। তিন রাজপুত্র এলেন। রাজা তখন তাঁদের বললেন, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। মৃত্যুর আগে তিন কন্যার ভালো ঘরে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলুম না— সে দুঃখ আমার মরেও যাবে না! কিন্তু উপায় কি? মৃত্যু তো আমার কথা শুনবেনা। তাই তাদের বিয়ের ভার তোমাদের তিন ভাইয়ের উপর দিয়ে বলে যাচ্ছি—প্রথম যে-পাত্র দোরে এসে যে-কন্যাকে বিয়ে করতে চাইবে, তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না…তার সঙ্গেই সে-কন্যার বিয়ে দেবে। এ কথা যদি না মানো, তাহলে আমি শাপ দিয়ে যাচ্ছি…আজীবন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে।

রাজা মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর দু-মাস পরে এক দিন নিশুতি-রাতে রাজবাড়ীর বন্ধ দেউড়িতে পড়লো ঘা…বার-বার…অনেক বার।

সে শব্দে দেউড়ির দ্বারীর ঘুম গেল ভেঙ্গে। দ্বারী উঠে পুরীর ফটক খুললো। ফটক খুলতে বিদ্যুতের ঝক্‌মকে আলোয় তার চোখ গেল ঝলশে…ভয়ানক শব্দে বাজ উঠলো গর্জ্জন করে… বাহিরে একেবারে প্রলয় ঝড়…

ঝড়ের বিকট গর্জ্জন ঠেলে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল—কোথায় গো রাজপুত্তুররা …ফটক খুলে বেরিয়ে এসো। বড় রাজকন্যাকে নিয়ে এসো। আমি এসেছি বড় রাজকন্যাকে বিয়ে করবো বলে!…চট্‌পট এসো। দাঁড়িয়ে থাকবার ফুরসৎ আমার নেই…আর আমার সঙ্গে যদি বিয়ে না দাও তো এসে সে-কথা বলে যাও!…আমি চলে গেলে আর আসবোনা কিন্তু।

সে-আওয়াজে রাজপুরীর মজবুত দেওয়ালগুলো কেঁপে উঠলো…পুরীর ঘরে ঘরে জ্বলছিল বেলোয়ারি ঝাড়ে হাজার হাজার বাতি…সে-চীৎকারে বেলোয়ারি ঝাড়গুলো ঠোকাঠুকি হয়ে ঝনঝন্

শব্দে ভেঙ্গে গেল। রাজপুত্র-রাজকন্যাদের ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুম ভেঙ্গে তাঁরা শুনলেন ফটক থেকে-ভেসে আসা সে ডাক।

বিছানায় বসেই বড় রাজপুত্র বললেন—যে মানুষকে চোখে দেখছি না···যে মানুষ এই দুর্যোগের রাতে আসে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে···সে চোর...পাত্র নয়! দেবো না আমি তার সঙ্গে বড় রাজকন্যার বিয়ে।

মেজো রাজপুত্র বললেন—ফটক নাড়া দিয়ে ডাকাত আসে—বর আসেনা বিয়ে করতে! চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে রাজকন্যাকে যে বিয়ে করতে চায়, তার হাতে বড় রাজকন্যাকে দেবো না...প্রাণ থাকতে নয়!

ছোট রাজপুত্র বলে উঠলেন—করছো কি বড়দা, মেজদা? বাবার কথা মনে নেই? বাবা মরবার সময় বলে গেছেন, প্রথম যে-পাত্র আসবে, তাকে ফেরাবে না। ফেরালে বাবার অভিশাপ...মনে নেই তোমাদের?

এ কথা বলে' ছোট রাজপুত্র ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। বড় রাজকন্যা তাঁর বিছানায় বসে কাঁদছেন...সে-কন্যাকে তুলে তাঁর হাত ধরে ছোট রাজপুত্র দেউড়িতে এলেন, এসে অদৃশ্য পাত্রের উদ্দেশে বললেন,—এনেছি বড় রাজকন্যাকে—তাঁকে বিয়ে করে' দুজনে সুখে থাকো ভগবানের আশীর্ব্বাদে!

বড় রাজকন্যা ফটকের বাহিরে দাঁড়ালেন...সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চোখ-ঝলশানো ঝলকানি আর বাজের কড়কড় আওয়াজ...ছোট রাজপুত্রের চোখ গেল ঝলশে! তিনি চোখ বুজলেন। তারপর আবার যখন চোখ খুললেন, দেখেন, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে···নিথর নিস্পন্দ আকাশ...আকাশে রাশ-রাশ নক্ষত্র জ্বলছে···বড় রাজকন্যার চিহ্নও নেই!

তার পরের দিন দুপুর-রাত্রে আকাশে আবার তেমনি দুর্য্যোগ···ঝড় জল বজ্র বিদ্যুৎ। পৃথিবী যেন চুরমার হয়ে যাবে! এ দুর্য্যোগে ফটকে আবার জোর ধাক্কা···সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গলায় বিরাট রকমের আহ্বান—কোথায় গো তিন রাজপুত্তুর, মেজো রাজকন্যাকে এনে দাও। আমি এসেছি তাঁকে বিয়ে করবো বলে। আমার ফুরসৎ কম...শীগ্‌গির আনো। আর এ বিয়ে যদি না দাও, এসে বলো···আমি চলে যাই। গেলে কিন্তু আর ফিরে আসবো না।

ঘুম ভেঙ্গে বড় রাজপুত্র আগের রাতের মতো বিছানায় বসে গর্জ্জন তুললেন—যে মানুষকে চোখে দেখছি না,...না, তার হাতে রাজকন্যাকে দেবো না...কক্‌খনো না।

মেজো রাজপুত্র বললেন—একে বিয়ে করতে আসা বলেনা···একে বলে, ডাকাতি করতে আসা! এ বিয়ে দেবো না।

ছোট রাজপুত্র আবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন। বললেন,—উহুঁ, বাবার আদেশ···সে আদেশ আমি অমান্য করতে পারবো না।

এ কথা বলে' মেজো রাজকন্যাকে এনে পুরীর ফটকের বাহিরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আবার সেই বিদ্যুতের ঝলক...বাজের গর্জ্জন···ছোট রাজপুত্র চোখ বুজলেন।···চোখ খুলে দেখেন, ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে...সঙ্গে-সঙ্গে মেজো রাজকন্যা গেছেন বাতাসে মিলিয়ে!

তিনদিনের দিন রাত দুপুরে আবার সেই ব্যাপার···তেমনি দুর্য্যোগ আর ফটকে অদৃশ্য-মানুষের ডাক। বড় মেজো দুজন তেমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন...ছোট রাজপুত্র এবারেও তাঁদের মতে সায় দিলেন না। ছোট রাজকন্যা তাঁর বড় আদরের বোন···তাঁকে এমন দুর্য্যোগে মিশিয়ে দিতে ছোট

রাজপুত্র পারবেন কি?—তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, না। এ বিয়ে দেবো না! কিন্তু তা বলতে পারলেন না। মনে পড়লো রাজার অন্তিম আদেশ। ধড়মড়িয়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন···উঠে ছোট রাজকন্যার হাত ধরে ফটকে এনে তাঁকেও দিলেন সেই দুর্য্যোগে ঝড়ে-জলে বিসর্জ্জন!

সে রাত্রে তিনি আর ঘুমোতে পারলেন না···ছোট রাজকন্যার জন্য শোকে ছটফট করলেন।

পরের দিন সকাল হলে ছোট রাজপুত্র বেরুলেন তাঁর ঘোড়ার পিঠে চড়ে···ছোট রাজকন্যা আর

তাঁর বরের সন্ধানে।…অনেক পথ ঘুরলেন। কারো কোনো সন্ধান মিললো না। সজল চোখে ছোট রাজপুত্র পুরীতে ফিরে এলেন।

রাত্রে তিন রাজপুত্র বসলেন পরামর্শ করতে। তিনজনেই বললেন—দেখলুম না, জানলুম না… কোথা থেকে কারা এসে বিয়ে করতে চাইলো তিন বোনকে…বাড়ী থেকে অমনি তাদের বার করে দিলুম! কোথায় তারা গেল…কেমন আছে…বেঁচে আছে, না, মরে গেছে…খবর নিতে হবে! রাজা বাপের কথা তো অমান্য করা হয়নি! বোন তিনটির খবর নিতে তো বাপের মানা নেই!

তিন ভাই ঠিক করলেন, তিনজনেই বেরুবেন পরের দিন……তিন বোনের সন্ধানে। দেরী করা নয়। তাদের সন্ধান না নিয়ে কেউ রাজ্যে ফিরবেন না।

তিনজনে বেরুলেন তিন ঘোড়ায় চড়ে…সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম।

প্রথম দিন চলে চলে' সন্ধ্যার সময় তিনজনে এসে পৌঁছুলেন অজগর বিজন বনের মধ্যে মস্ত এক ঝিলের সামনে। রাত্রে থাকবার জন্য সেখানে তাঁবু ফেললেন। কথা হলো, এ রাত্রে মেজো আর ছোট রাজপুত্র ঘুমোবেন…বড় জেগে পাহারা দেবেন।

তাঁবুর বাহিরে আগুন জেলে সেই আগুনের সামনে হাতিয়ার হাতে বড় রাজপুত্র বসলেন… তাঁবুর মধ্যে মেজো ছোট দুজনে ঘুমোচ্ছেন…রাত তখন দুপুর, হঠাৎ ঝিলের থির জলে উঠলো বড় বড় ঢেউ। বড় রাজপুত্র ঝিলের দিকে চেয়ে আছেন কাঠ হয়ে! হঠাৎ দেখেন, গায়ে রূপোর মতো ঝক্‌ঝকে কাঁটা…প্রকাণ্ড এক কুমীর ঝিলের জলে ভেসে তাঁর দিকে আসছে। দেখবামাত্র তিনি তলোয়ার খুলে তাগ করে'…কুমীর কাছে এসে যেমন হাঁ করেছে, অমনি সজোরে তিনি তার মুখে মারলেন তলোয়ারের চোট। সে-চোট লেগে কুমীরের ধড় থেকে মুণ্ডুটা কেটে ছিটকে পড়লো। বড় রাজপুত্র তার মুণ্ডু থেকে কাণ দুটি কেটে নিয়ে নিজের বগলিতে রাখলেন, রেখে কুমীরের ধড় আর কাণ-কাটা মুণ্ডুটা দিলেন ঝিলের জলে ফেলে।

পরের দিন ভোর হলো। মেজো ছোট ঘুম থেকে উঠলেন। রাতের ব্যাপার বড় তাঁদের বললেন না মোটে। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে তিনজনে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আবার চলা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় তিনজনে এসে পৌঁছুলেন মস্ত এক জলার ধারে। রাত্রে এইখানেই তাঁবু পড়লো। এ রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোতে গেলেন বড় আর ছোট রাজপুত্র…মেজো তাঁবুর বাহিরে আগুন জেলে সেই আগুনের সামনে হাতিয়ার-হাতে পাহারায় রইলেন।

রাত তখন প্রায় দুপুর, জলে হলো ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। সে-শব্দ শুনে মেজো রাজপুত্র জলার দিকে চেয়ে দেখেন, জল কেটে ভেসে উঠলো প্রকাণ্ড এক কুমীর—কুমীরের দু-দুটো মাথা! কুমীরটা আসছে জলের বুক বেয়ে ভেসে মেজোর দিকে! দেখে মেজো তাঁর তলোয়ার খুলে তাগ করে দাঁড়ালেন—কুমীর কাছে এলো…দু'মুখে দুটো হাঁ …যেমন আসবে খেতে, অমনি

তার মুখে মেজো মারলেন দুই চোট। চোট খেয়ে ধড় থেকে তার মুণ্ডু দুটো কেটে লুটিয়ে পড়লো··· কুমীরের ভবলীলা হলো শেষ। মেজো তখন তার মুণ্ডু দুটো থেকে দুটো করে চারটে কাণ কেটে বগলিতে পুরে মরা কুমীরটাকে ছুড়ে জলার বুকে ফেলে দিলেন। এ-কথা ভায়েদের কাছে তিনিও প্রকাশ করলেন না।

পরের দিন ভোরে আবার ঘোড়ায় চড়ে তিন রাজপুত্রের যাত্রা সুরু। ধূ-ধূ প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনজনে সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছুলেন প্রকাণ্ড এক নদীর ধারে। সামনে রাত্রি। কাজেই এখানে তাঁবু ফেলে রাত্রির জন্য বিশ্রাম। আজ ছোট বসলেন তাঁবুর বাহিরে হাতিয়ার হাতে পাহারায়—বড় আর মেজো গেলেন তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ঘুমোতে।

তাঁবুর সামনে আগুন জেলে ছোট রাজপুত্র পাহারা দিচ্ছেন...হঠাৎ রাত-দুপুরে নদীর জল ফেঁপে ফুলে উঠলো···নদীর কূল ছাপালো। অবাক হয়ে নদীর দিকে ছোট রাজপুত্র চেয়ে আছেন। দেখেন, নদীর বুকে ভেসে উঠলো প্রকাণ্ড এক কুমীর—কুমীরের তিনটে মাথা। কুমীরটা মাথা তুলে উঠে···ছোট রাজপুত্র দেখেন, তাঁর দিকেই আসছে তেড়ে। ছোট রাজপুত্র তলোয়ার খুলে তাগ করে দাঁড়ালেন—ডাঙ্গার কাছে এসে তিন মুখে প্রকাণ্ড তিনটে হাঁ করে' কুমীর যেমন তাঁকে খেতে যাবে, ছোট রাজপুত্র ধাঁইসে কুমীরের গলায় মারলেন তলোয়ারের চোট। এক চোটেই কুমীরের তিন-তিনটে মাথা ধড় থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ছোট রাজপুত্র তার তিন মাথা থেকে ছটা কাণ কেটে বগলিতে রেখে দেহখানা নদীতে ফেলে দিলেন।

এ কাজ চুকিয়ে ছোট রাজপুত্র দেখেন, রাত পোহাতে দেরী আছে...পাহারার বিরাম নেই! বসে পাহারা দিচ্ছেন, দেখেন, আগুন নিব-নিব...কাঠ চাই...নাহলে আগুন নিবে যাবে। ছোট রাজপুত্র কাঠের সন্ধানে বেরুলেন। কাছাকাছি কোথাও কাঠ পেলেন না। অনেকখানি এগিয়ে এসে দেখেন, দূরে এক পাহাড়···সেই পাহাড়ের কোলে দাউ-দাউ করে আগুন জলছে।

আগুন দেখে ছোট রাজপুত্র এগিয়ে চললেন। কাছাকাছি এসে দেখেন, সর্ব্বনাশ। উনুনের আগুন। প্রকাণ্ড কূয়োর মতো উনুন আর সে উনুন জলছে গন্-গন্ করে। উনুনের উপর বারো হাত উঁচু কড়া চাপানো...সেই কড়ায় দেড়শো মানুষের মাথা সিদ্ধ হচ্ছে। উনুনের সামনে বসে ন-জন বিকটাকার দৈত্য।

দৈত্যরা ছোট রাজপুত্রকে দেখলো। ছোট রাজপুত্র ভাবলেন, ওরা যখন দেখে ফেলেছে, তখন আর সরে যাওয়া চলবে না! ওরা ভাববে, ভয় পেয়ে পালাচ্ছে! তা হবে না!

ছোট রাজপুত্র করলেন কি...সাহসে ভর করে বুক ফুলিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন,—তাইতো গো বন্ধুরা···আজ ক'বছর ধরে তোমাদের কি খোঁজাই না খুঁজছি···দুনিয়ার সর্ব্বত্র। তা তোমরা এখানে বসে গুলতান করছো!

দৈত্যরা বেশ সহজ ভাবে জবাব দিলে—বটে! বটে! বন্ধু বলছো তুমি। যদি সত্যই বন্ধু হও, তাহলে বলি, তোমার মঙ্গল হোক।

ছোট রাজপুত্র বললেন—তোমাদের দলে থাকবো বলে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।

এ-কথা শুনে দৈত্যদের সর্দ্দার বললে—দলে যদি থাকবে, তাহলে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে বসে এক-পাতে মানুষের মাংস খাবে, আর আমাদের মতো মানুষ শিকার করতে বেরুবে।

নিরুপায়! ছোট রাজপুত্র বললেন—নিশ্চয়!···

মাংস রান্না হয়ে গেল। দৈত্যরা পাতলো দশখানা পাতা···এক একখানা পাতা বিশ হাত লম্বা আর দশ হাত চওড়া। পাতে-পাতে দেওয়া হলো মানুষের মাংসর চপ কাটলেট ··নাড়ী-ভুঁড়ির রোষ্ট ···মাথার ঘীয়ের বড়া। দৈত্যরা হাপুশ হাপুশ করে খাচ্ছে···ছোট রাজপুত্র কি করেন, মুখে পুরতে লাগলেন...হাপুশ-হাপুশ শব্দে···আর ওদের নজর এড়িয়ে রান্নাগুলো পাচার করতে লাগলেন··· তাঁর পিছনে ছিল এক পগার, সেই পগারের মধ্যে।

খাওয়া শেষ হলে সর্দ্দার-দৈত্য বললে—এবার আমরা শিকার করতে বেরুবো···কালকের খাবারের জোগাড়! তবে বেশী দূরে যেতে হবে না। এখান থেকে ক-মাইল দূরে এক রাজার রাজ্য ···সে রাজার সঙ্গে সর্ত্ত আছে, মাসে একদিন করে আমাদের ভোজের জন্য রাজা পাঠাবে পাঁচ-নাম্ পঁয়তাল্লিশ জন করে মোটাসোটা মানুষ।···

কথা শেষ করে···বলা নেই, কওয়া নেই, ছোট রাজপুত্রকে সর্দ্দার-দৈত্য নিলে তার কাঁধে তুলে, —নিয়ে দলের দৈত্যদের হুকুম দিলে —চলো সব।

হু-হু করে বাতাসে উড়ে দৈত্যর দল আধঘণ্টার মধ্যে এলো সে-রাজার রাজ্যের সদর-ফটকে। এসে দুটো প্রকাণ্ড লম্বা ফার-গাছ ওপড়ালো! উপড়ে উঁচু পাঁচিলে একটা গাছ ঠেকিয়ে রাখলো। রেখে ছোট রাজপুত্রকে সর্দ্দারকে বললে—উঠে পড়ো সড়সড় করে এ-গাছের মটকায়। মটকায় উঠলে অন্য গাছটা তোমায় দেবো ছুড়ে···সেটাকে ধরে পাঁচিলের ওদিকে নামিয়ে ওদিককার দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখবে,—রেখে সেটা বয়ে নেমে যাবে রাজ্যের মধ্যে। তার পর আমরা উঠবো একজন-একজন করে'।···

যেমন হুকুম, ছোট রাজপুত্র উঠলেন গাছ ধরে তার মটকায়···উঠে সাড়া দিলেন—এসেছি। তখন অন্য গাছটা ছুড়ে দিয়ে সর্দ্দার বললে—এটা ধরে ওদিকে নামিয়ে দাও ওদিককার দেওয়ালে ঠেকিয়ে···

গাছ ছুড়লো। ছোট রাজপুত্র সেটা ধরলেন, ধরে নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন—ভয়ানক ভারী গাছ। একা নামাতে পারবো না। আর একজন কেউ মটকায় ওঠো—দুজনে মিলে ওদিকে এ-গাছ নামাবো।

ছোট রাজপুত্রের কথা শুনে দলের এক-নম্বর দৈত্যকে সর্দ্দার বললে—তুই ওঠ্...

এক-নম্বর তখন উঠলো মটকায়। উঠে অন্য গাছটা ধরে ওদিকে দিলে নামিয়ে...যেমন নামানো, ছোট রাজপুত্র অমনি তলোয়ার দিয়ে কুচ করে তার গলাটি কেটে ধড়টা আর গলাটা ফেললেন সেদিকে—দৈত্যর দল টেরও পেলে না!...

তারপর ছোট রাজপুত্র বললেন—এবার এসো আর একজন। একজন-একজন করে' এসে ওদিকে নামবে।...

দৈত্যদের মনে সন্দেহ নেই। একজন-একজন করে তারা উঠতে লাগলো মটকায়...আর যেমন ওঠা, ছোট রাজপুত্র অমনি কুচ্ করে তার গলা কাটেন...কেটে ধড় আর মুণ্ডু ফেলে দেন দেওয়ালের ওদিকে।...

এমনি করে দৈত্যর দল হলো সাবাড়—সর্দ্দার সমেত।

সাবাড় করে' ওদিকে নেমে দড়ি দিয়ে দৈত্যদের বেঁধে ছোট রাজপুত্র সার-সার ঝুলিয়ে দিলেন উঁচু পাঁচিলের গায়ে।

তারপর তিনি পথে বেরুলেন। সারা রাজ্যে কারো সাড়া নেই! ব্যাপার কি?

...ছোট রাজপুত্র চলেছেন। চলতে চলতে যে বাড়ীতে খবর নেন, দেখেন, বাড়ী খালি। ঘুরে ঘুরে দেখলেন, সব বাড়ী খালি...জিনিষপত্র বাড়ীতে ঠিক ঠিক সব সাজানো...অথচ কোনো বাড়ীতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। বুঝলেন, দৈত্যদের ভয়ে লোকজন সব পালিয়েছে।

তখন তিনি হাঁটতে হাঁটতে এলেন রাজপুরীতে। রাজপুরীর দেউড়ি খোলা...দেউড়িতে সেপাই-শান্ত্রী...কেউ নেই!

রাজপুত্র ঢুকলেন পুরীর মধ্যে...বড় বড় ঘরের মধ্য দিয়ে চললেন। ঘর দোর চমৎকার সাজানো ...ঝাড়ে ঝাড়ে বাতি...কিন্তু লোকজনের চিহ্ন নেই কোনো ঘরে!

মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ছোট রাজপুত্র উঠলেন পুরীর দোতলায়...সাতখানা বড় বড় ঘর পার হয়ে আর একটা ঘরে এলেন। সে ঘরে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানা পাতা...আর সে বিছানায় শুয়ে পরমাসুন্দরী এক কন্যা! কন্যা ঘুমোচ্ছেন...

ছোট রাজপুত্র দেখেন, খোলা জানলা দিয়ে ঘরে এক অজগর সাপ ঢুকছে। এত বড় তার হাঁ...জিভটা লকলক করছে। অজগর সাপ...হাঁ করে রাজকন্যাকে খেতে আসছে। চোখের পলকে খাপ থেকে ধারালো ছোরা বার করে' রাজপুত্র মারলেন তার মাথা তাগ করে'। সাপের মাথা বিঁধে ছোরাখানা দেওয়ালে গেল গেঁথে। ...সাপটা ঘাড় কাৎ করে মরে গেল।

ছোট রাজপুত্র তখন আকাশের দিকে হাত তুলে ভগবানের উদ্দেশে নতি জানিয়ে বললেন—হে ভগবান, আমি ছাড়া এ-ছোরা যেন আর কেউ না দেওয়াল থেকে খুলতে পারে...এইটুকু দয়া করো।

চক্ষের পলকে এমন নিঃশব্দে এ ব্যাপার ঘটে গেল যে কন্যার ঘুম ভাঙ্গলো না...কন্যা তেমনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।...

ছোট রাজপুত্র তখন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এলেন সে ঘর থেকে বেরিয়ে। তারপর পুরী ত্যাগ করে' সেই গাছ বয়ে রাজ্যের বাহিরে এসে চলে চলে এলেন সেই পাহাড়ের ধারে...যেখানে এই সব দৈত্যর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। সেখান থেকে একগাদা শুকনো কাঠ জোগাড় করে' ছোট রাজপুত্র ফিরে এলেন নদীর ধারে তাঁদের সেই তাঁবুর সামনে।

তখনো রাত পোহাতে বাকী। আগুনে শুকনো কাঠ দিয়ে তিনি বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।

কাছে যদি কুমীরের কাণগুলো না থাকতো...তাহলে যা যা ঘটেছে, ছোট রাজপুত্র ভাবতেন, এ সব বুঝি সত্য ঘটেনি···বসে বসে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন!

সকাল হলো···আকাশে সূর্য্য উঠলো। তাঁবুর মধ্যে বড় আর মেজো রাজপুত্রের ঘুম ভাঙলো।

রাত্রে যা যা ঘটে গেছে, ছোট রাজপুত্র তার বিন্দু-বিসর্গ দাদাদের বললেন না...সব কথা চেপে গেলেন। মুখ-হাত ধুয়ে খাবার খেয়ে তিন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়লেন...চড়ে তিনজনে এলেন সেই রাজার রাজত্বে।

রাজ্যেয় রাজা ওদিকে সকালে উঠে জনহীন পথে ঘুরছেন···মুখ মলিন···কি করে' প্রজাদের আবার রাজ্যে ফিরিয়ে আনবেন, সেই চিন্তায় আকুল।...ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন রাজ্যের উঁচু পাঁচিলের সামনে। এসে যা দেখলেন···অবাক! পাঁচিলে ঝুলছে দড়িতে বাঁধা নটা দৈত্যর ধড় আর কাটা মুণ্ডু। ভাবলেন, স্বপ্ন না কি? চোখ রগড়ালেন বার-বার—চোখ রগড়ে বার-বার দেখলেন···দেখে বুঝলেন, স্বপ্ন নয়···সত্য! সত্য। তাঁর গায়ে কাঁটা দিলে···খুশীতে মন উঠলো ভরে'। রাজা ভাবলেন, কে? কোন বীর এ কাজ করলে?

রাজা নিজের হাতে ঢেঁড়া পিটে চীৎকার করে জানালেন—এসো···এসো সকলে রাজ্যে ফিরে। দৈত্যরা মরেছে...রাজ্য নিষ্কণ্টক।

ঢেঁড়া শুনে প্রজারা দলে দলে রাজ্যে ফিরলো।

রাজা এলেন পুরীতে কন্যার খবর নিতে···রাজ্য জুড়ে তখন জয়ধ্বনি উঠেছে!···

কন্যার ঘরে ঢুকবেন, কন্যার দাসী ছুটে এসে রাজাকে খবর দিলে, রাজকন্যা প্রাণে প্রাণে খুব রক্ষা পেয়েছেন! তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি মহারাজ, তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন, আর বিছানার পাশে মেঝেয় পড়ে গলায় ছোরা বেঁধা প্রকাণ্ড এক মরা অজগর সাপ।

শুনে রাজা কন্যার ঘরে এলেন। এসে দেখেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার!

কন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তখনি তাঁকে জাগালেন···কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কে এ কাজ করেছে মা?

কন্যা অবাক···বললেন—আমি কিছুই জানি না বাবা। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলুম···যেন মস্ত এক অজগর আসছে আমায় গিলতে···আর পরম সুন্দর এক রাজপুত্র এসে যেন সাপটাকে মেরে চলে গেলেন!

রাজা বললেন—স্বপ্ন নয় মা...অজগর তো ঐ মরে রয়েছে। তার মাথা আর দেয়াল একসঙ্গে বেঁধা ঐ ছোরায়।

রাজ্যময় হুলস্থুল কাণ্ড। রাজা সভায় বসেছেন···পাত্রমিত্র অমাত্য প্রজা সকলকে নিয়ে। রাজা বললেন,—কে বীর এসে রাজকন্যার প্রাণ রক্ষা করেছে? দৈত্যদের মেরে রাজ্য আর প্রজাদের

নিরাপদ করেছে ? সে বীরের খবর যে দিতে পারবে, তাকে দেবো আমি এক হাজার সোনার মোহর···বখশিস্।

ঘোড়ায় চড়ে তিন রাজপুত্র সন্ধ্যাবেলায় এসে পৌঁছুলেন জনহীন সেই মরু রাজ্যে। রাজ্য এখন কল-কোলাহলে ভরা···প্রজারা যে যার ঘরে ফিরে এসেছে···ন- নজন দৈত্য মরেছে···আর কোনো ভয় নেই! পথে ঘাটে মানুষের ভিড়। সকলের মুখে দৈত্যদের গল্প! রাজপুত্ররা এসে এক সরাইয়ে উঠলেন।

সরাইওলার বয়স হয়েছে···গলাবাজি করে' সে শোনাচ্ছে সকলকে—জোয়ান বয়সে কী জোয়ান সে ছিল...এক-এক চড়ে কত-কত দৈত্য মেরেছে! এমন নেহাৎ নাকি বয়স হয়েছে, তাই। নাহলে...হুঁঃ!

তিন রাজপুত্রকে দেখে সরাইওলা বললে—তোমাদের দেখছি বেশ জোয়ান ছোকরা...সঙ্গে আবার হাতিয়ার! কি বীরত্ব দেখিয়েছো বাপু, বলতে পারো?

সরাইওলার কথায় বড় রাজপুত্র বললেন তাঁর বীরত্বের কাহিনী।···এখানে আসতে আসতে পথে এক ঝিলের ধারে তাঁবু ফেলেছিলেন সন্ধ্যার পর···রাত্রে তাঁর মেজো-ছোট দু-ভাই তাঁবুর মধ্যে ঘুমোচ্ছেন...রাত তখন দুপুর...তিনি দিচ্ছেন তাঁবুর বাইরে বসে আগুন জেলে পাহারা, এমন সময় ঝিলের বুকে জল চিরে বেরুলো ইয়া এক কুমীর...এত বড় তার মুখ...সে মুখে এত বড় হাঁ! রাজপুত্রকে দেখে হাঁ করে কুমীরটা এলো তেড়ে। যেমন কাছে আসা, তলোয়ালের একটি ঘায়ে রাজপুত্র নিলেন তার মুণ্ডু কেটে। কুমীরটা তখনি মরে গেল! বিশ্বাস না হয়...বড় রাজপুত্র তাঁর বগলি থেকে কুমীরের কাটা কাণ দুটো বার করে' দেখালেন...বললেন—প্রমাণ করতে এ দুটি কাণ কেটে কাছে রেখে দিয়েছি।···

বড়র কথা শেষ হলে সরাইওলা তাকালো মেজোর পানে, বললে,—তোমার বীরত্ব ?

মেজো তখন তাঁর কথা খুলে বললেন,—জলার ধারে তাঁবু...তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন বড় আর ছোট দুই ভাই...নিশুতি রাত···জনপ্রাণীর সাড়া নেই···তিনি দিচ্ছেন তাঁবুর বাইরে আগুন জেলে বসে পাহারা···এমন সময় জলার বুক ফুঁড়ে অজগরের মতো ঢেউ তুলে বেরুলো এক কুমীর—তার দু-দুটো মাথা। কুমীরটা তাঁকে দেখে দু-মুখে দুটো হাঁ···তোড় এলো তাঁকে খেতে। যেমন কাছে আসা, তলোয়ার বার করে' মেজো দিলেন তলোয়ারের দুই চোট...সেই দুই চোটে তার দু-দুটো মাথা কেটে···রক্তারক্তি ব্যাপার! কুমীরটা মোলো...মেজো তার দুটো মুণ্ডু থেকে চারটি কাণ কেটে বগলিতে রাখলেন···প্রমাণ। বিশ্বাস না হয়...বগলি থেকে কুমীরের চারটে কাণ বার করে মেজো দেখালেন।

সরাইওলার দু-চোখ এত বড়···মাথা নেড়ে বললে,—সাবাস...বীরত্ব বটে···মানি! তারপর ছোটর পানে চেয়ে সরাইওলা জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কোনো কাহিনী আছে ?

ছোট তখন বললেন তাঁর কাহিনী···বললেন, নদীর ধারে তাঁবু···বড় মেজো শুয়ে ঘুমোচ্ছেন তাঁবুর

মধ্যে, তিনি দিচ্ছেন পাহারা আগুন জ্বেলে তাঁবুর বাইরে বসে—নদী ফুলে ফেঁপে জল থেকে উঠলো প্রকাণ্ড কুমীর...তার আবার তিন-তিনটে মাথা। ছোটকে দেখে তিন মুখে তিন হাঁ...কুমীর এলো
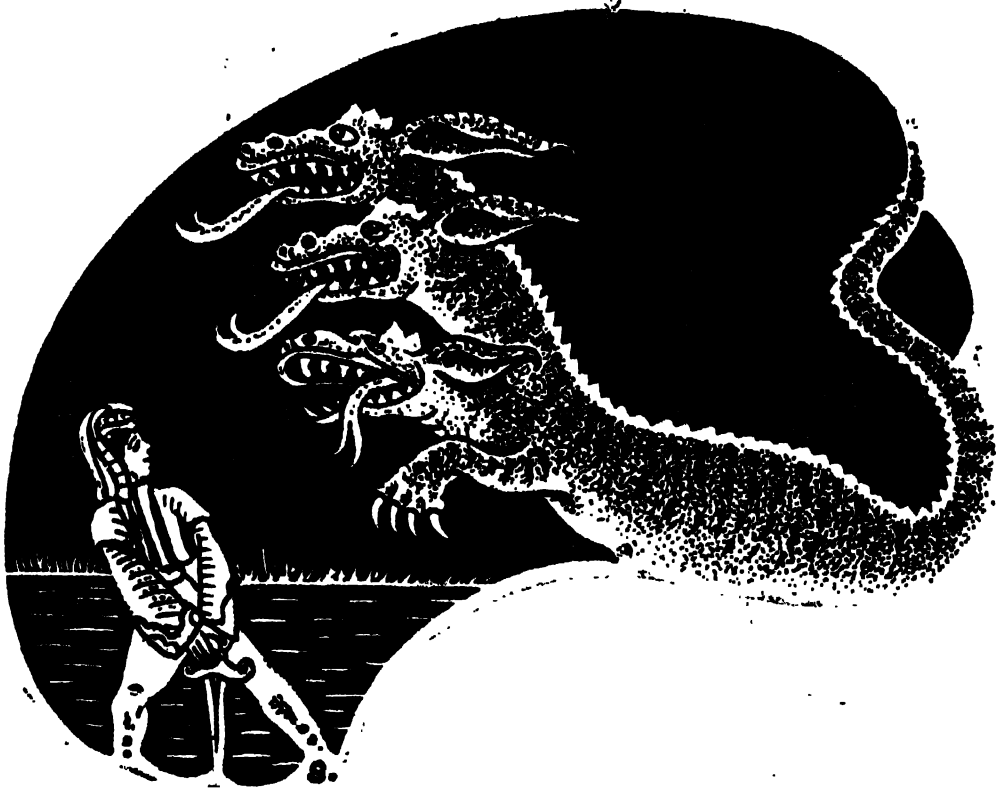
গিলতে! রাজপুত্র তলোয়ারের ঘায়ে তিন মাথা কেটে তাকে করলেন সাফ! প্রমাণ চাও? বগলি থেকে কুমীরের তিন মাথা থেকে কাটা ছটা কাণ ছোট রাজপুত্র বার করে দেখালেন।

সরাইওলা বললে—আরে ব্যস্! একটা কুমীরের ধড়ে তিন-তিনটে মাথা! এক চোটে সাফ! তাজ্জব ব্যাপার!

ছোট বললেন,—এইখানেই আমার কাহিনীর শেষ নয়!···তার পর...

ছোট রাজপুত্র বললেন,—আগুন নিবে যাচ্ছে দেখে তিনি কাঠের সন্ধানে চললেন। চলে চলে অনেক দূরে এসে দেখেন, পাহাড়ের মাথায় আগুন। আগুন নেবেন বলে কাছে এসে দেখেন, উনুন জ্বলছে গন্-গন্ করে, আর উনুনের ধারে নটা দৈত্য বসে মানুষ রান্না করছে...এত মানুষের মাংস! তিনি তাদের দলে ভিড়ে গেলেন···তারা দিলে মানুষের মাংস খেতে। রাজপুত্র খেলেন না···তাদের লুকিয়ে মাংস দিলেন ফেলে। তারপর তারা আসবে সেই রাত্রে এ রাজ্যের রাজার সঙ্গে সর্ত্ত মতো প্রজা নিতে ···পরের দিন খাবে বলে'। বললেন, লম্বা গাছ ধরে তাঁকে কি করে' তারা রাজ্যের বাইরে যে উঁচু পাঁচিল, সেই পাঁচিলে ওঠালো...তারপর তিনি কি করে' একটি একটি করে' ন-জন দৈত্যকে গলা কেটে মেরে ফেললেন। বললেন, দৈত্যদের মেরে দড়িতে তাদের মুণ্ডু বেঁধে পাঁচিলের এদিকে মুণ্ডুমালা

সাজিয়ে রাজ্য দেখে বেড়ালেন। পথ খাঁ খাঁ করছে···লোক নেই, জন নেই···বাড়ী-ঘর সব খালি পড়ে ···জন-মানবের চিহ্ন নেই। পথে পথে ঘুরে তিনি এলেন রাজপুরীতে। পুরী শূন্য···দেউড়ির দোরে শান্ত্রী-পাহারা নেই। দেউড়ি খোলা। তিনি পুরীতে ঢুকলেন। ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে এলেন উপরের তলায় রাজকন্যার ঘরে। ঘরে এসে দেখেন, পালঙ্কে শুয়ে রাজকন্যা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন···হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে খোলা জানলা দিয়ে ঢুকলো প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ...ঢুকেই ফণা তুলে রাজকন্যাকে খেতে যাচ্ছিল···হাতের ছোরা ছুড়ে তিনি মারলেন সাপের ফণা তাগ্ করে'···সে-ছোরা সাপের গলা বিঁধে ঘরের দেওয়ালে গেল টাইট হয়ে গেঁথে। তিনি তখন নিঃশব্দে বেরুলেন পুরী থেকে··· বেরিয়ে নদীর ধারে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলেন। তারপর···

আর তারপর! এই অবধি যেমন শোনা···সরাইওলা উঠে তখনি ছুটলো রাজপুরীতে। রাজার ঘোষণা শুনেছে, এ বীরের সন্ধান যে দেবে, রাজা তাকে দেবেন নগদ এক-হাজার সোনার মোহর··· বখশিস।

রাজপুরীতে সভায় বসেছেন রাজা...পাত্র-মিত্রদের নিয়ে, সরাইওলা এসে খবর দিলে—দিন মহারাজ বখশিস। আমি এনেছি সেই বীরের সন্ধান।

রাজা বললেন,—তাকে সভায় আনো। তাকে দেখি, তার কথা শুনি···

সরাইওলা তখনি গিয়ে তিন রাজপুত্রকে সভায় নিয়ে এলো। ছোট রাজপুত্রকে দেখিয়ে সরাইওলা বললে,—এই সেই বীর মহারাজ।

রাজার কথায় ছোট রাজপুত্র সভায় বললেন সব বৃত্তান্ত।

শুনে রাজা বললেন,—প্রমাণ?

ছোট রাজপুত্র বললেন,—রাজকন্যার ঘরে চলুন...সাপের ফণাশুদ্ধ দেওয়ালে গাঁথা ছোরা··· সে-ছোরা আমি ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবে না, মহারাজ···শত চেষ্টাতেও নয়!

সকলকে নিয়ে রাজা এলেন কন্যার ঘরে। এসে দেখেন, ঘরের দেওয়ালে অজগরের মাথা বিঁধে ছোরা রয়েছে দেওয়ালে গাঁথা।

ছোট রাজপুত্র এসে যেমন টেনেছেন, ছোরা খশে তাঁর হাতে এলো—অজগরের মাথাটা অমনি ধুপ করে' মেঝেয় পড়লো লুটিয়ে।

সকলে জয়ধ্বনি করে উঠলো। ছোটকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাজা বললেন—তুমি বীর বটে! রাজ্য রক্ষা করেছো। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো···আর যৌতুক দেবো অর্দ্ধ-রাজ্য।...

বিবাহ হলো মহা ধুমধামে? বিয়ের পর ছোট রাজ-পুত্র এইখানেই রইলেন...বড় মেজো ফিরলেন নিজেদের রাজ্যে।...

রাজার আদরে স্নেহে ছোট রাজপুত্র সুখে আছেন কন্যাকে বিয়ে করে···মুখ কিন্তু সব সময় বিরস মলিন। তিন বোনের সন্ধান মেলেনি! সন্ধান করে তাদের বার করা চাই!

শ্বশুর-রাজাকে বার-বার বলেন,···বোনদের সন্ধানে বেরুবেন...রাজা কিন্তু ছাড়তে চান না··· বলেন,—তারা স্বামীর ঘরে ভালোই আছে···ভেবো না।

ছোট রাজপুত্রের মন তাতে সায় দেয় না···তাঁর আকুলতা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

একদিন শ্বশুর-রাজা শিকার করতে বেরুবেন,···বেরুবার সময় ছোট রাজপুত্রের হাতে একগোছা চাবি দিয়ে বললেন—এ গোছায় পুরীর নানা ঘরের চাবি আছে...তোমার কাছে রাখো। এ সব চাবি হলো গুপ্ত ঘরের চাবি। এর-মধ্যে আটটা চাবি দিয়ে আটটা ঘর খুলতে পারো। সে সব ঘরে আমার হীরে জহরত আছে ঠাশা! এ সব জহরত···আমি মরে গেলে তোমার হবে। এ ছাড়া এই যে দেখছো ন-নম্বরের চাবি···এ চাবি দিয়ে ন-নম্বরের ঘর খোলা যায়। সে-ঘর কিন্তু খবর্দ্দার, খুলো না, ককখনো না। খুললে মহাবিপদ ঘটবে। বুঝলে!

মাথা নেড়ে ছোট রাজপুত্র বললেন,—বুঝেছি।

এ কথা বলে ছোট রাজপুত্রের হাতে নটা চাবি দিয়ে রাজা বেরুলেন দলবল নিয়ে শিকার করতে।

রাজা বেরুলেন, ছোট রাতপুত্রের আর ত্বর সইলো না! চাবি নিয়ে তিনি গিয়ে খুললেন এক নম্বর ঘরের দরজা। দরজা খুলে দেখেন, ঘরে সোনার মোহর জড়ো হয়ে আছে। কত, তার সংখ্যা নেই। মোহরের পাহাড় যেন! ক্রমে দু-নম্বর তিন-নম্বর করে' আট-নম্বর ঘরের দরজা খুললেন,—সব ঘর মণি-রত্নে ঠাশা। কোনোটায় সোনা-রূপোর বড় বড় বাট...কোনোটায় শুধু রাশ-রাশ হীরে পান্না, কোনোটায় চুণী···কোনোটায় শুধু মুক্তো ডাঁই-করা। চোখ ঝলশে যায়···এত ঐশ্বর্য্য! তারপর তাঁর হাত সুড়সুড় করতে লাগলো···ন-নম্বরের ঘর খোলবার জন্য।

কিন্তু শ্বশুর বারণ করে গেছেন। বলেছেন, ও ঘর খুললে ভয়ানক বিপদ হবে। একদিন গেল, দু-দিন গেল...তিন দিন গেল...চার দিনের দিন ছোট রাজপুত্র অস্থির হয়ে উঠলেন···ও-ঘর না খুললে সোয়াস্তি নেই।...পা টিপে টিপে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ন-নম্বরের চাবি খুললেন। চাবি খুলে দরজা ঠেলে ঘরে যা দেখলেন, চমকে উঠলেন! দেখেন, প্রকাণ্ড ঘর···ঘরের মাঝখানে পা-পর্য্যন্ত ঝোলা-লম্বা-দাড়ি এক বিরাট বিকট দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে...তার হাতে পায়ে লোহার মোটা শিকল আঁটা। সে শিকল আবার চার কোণে পোঁতা মোটা চারটে লোহার থামের গা জড়িয়ে দৈত্যের গলায় পাক দিয়ে ঘোরানো···নড়বার চড়বার উপায় নেই, এমন টাইট করে' বাঁধা। দৈত্যর সামনে একটা ফোয়ারা...ফোয়ারা দিয়ে ফটিকের মতো জলের ধারা ঝরছে...ফোয়ারার কাছে পড়ে আছে মস্ত একটা পেয়ালা!···

দৈত্য আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা...রাজপুত্র ভালো করে তার পানে চেয়ে দেখলেন। দৈত্যর মুখে-চোখে যাতনার চিহ্ন···হাঁ করছে আর মুখ বুজছে! রাজপুত্র দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছেন, দৈত্য তখন চি-চিঁ

করে মিনতি জানিয়ে বললে—দোহাই তোমার…কত বছর ধরে পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে …গলা শুকিয়ে কাঠ! ঝর্ণা থেকে এক পেয়ালা জল নিয়ে আমায় খেতে দাও গো।

ছোট রাজপুত্র বললেন—তোমার চেহারা যা দেখছি,—তাতে বুঝছি, বিকট দৈত্য! জল দিয়ে শেষে ফ্যাসাদে পড়বো!…

দৈত্য বললে,—না, না, না—আমি তিন সত্যি করে বলছি—ভগবান তোমাকে একটিমাত্র প্রাণ দেছেন, তুমি আমায় এক পেয়ালা জল খাওয়াও…আমি তোমাকে আর একটা বাড়তি প্রাণ দেবো। তাহলে তোমার দুটো প্রাণ হবে। মরণের ভয় কিছু কমবে।

ছোট রাজপুত্র ভাবলেন, মন্দ কি! দত্যি-দানাদের সঙ্গে বিরোধ তো লেগেই আছে…দুটো প্রাণ থাকলে সাহস হবে আরো বেশী। তাছাড়া মমতা হলো…হোক দৈত্য…তেষ্টার জল চাইছে …আহা!

পেয়ালাটা কুড়িয়ে নিয়ে তাতে ঝর্ণার জল ভরে' ছোট রাজপুত্র দৈত্যর মুখে ধরলেন…এক চুমুকে দৈত্য পেয়ালার জল নিঃশেষ করে দিলে।

রাজপুত্র চলে আসছিলেন, দৈত্য বললে—যেয়োনা গো। আর এক পেয়ালা খাওয়াও…কত বছরের তেষ্টা…এক পেয়ালা জল যেন তপ্ত জালির উপর পড়লো! চোঁ করে' শুষে নিলে!…আর এক পেয়ালা দাও। তোমাকে আর একটি প্রাণ আমি দিচ্ছি। তোমার তিনটে প্রাণ হবে।

রাজপুত্র বললেন,—দেবো জল…তার আগে বলো, তোমার নাম কি?

দৈত্য বললে—আমার নাম হলো বাশ শেলিবাস। যার মানে, খাঁটী ইস্পাত। আমার গা খাঁটী ইস্পাতের তৈরী…গণ্ডারের চামড়ার চেয়েও শক্ত আমার গায়ের চামড়া!…আমি হলুম দৈত্যরাজ।

পরিচয় শুনে রাজপুত্র হতভম্ব!…আর এক পেয়ালা জল দিলেন তিনি…দৈত্য এক চুমুকে সে পাত্রও খালি করলে।

তার পর আবার এক পেয়ালা। রাজপুত্রকে দৈত্য দিলে আর একটা প্রাণ…রাজপুত্রের হলো চার চারটে প্রাণ।

তিন পেয়ালা জল খেয়ে দৈত্য বিকট এক চীৎকার তুললো। তার গায়ে শক্তি এলো ফিরে। হাত-পা নাড়লো…যেমন নাড়া, ঝন-ঝন-ঝনাৎ করে' লোহার শিকল গেল ছিঁড়ে। এক লাফ দিয়ে রাজপুত্রকে ঠেলে খোলা দরজা দিয়ে দৈত্য বেরুলো…বেরিয়ে দে ছুট…একেবারে রাজপুরীর দোতলায়। রাজপুত্র ছুটলেন তার পিছনে পিছনে।

দোতলায় খোলা জানলার ধারে তাঁর বৌ-রাজকন্যা বসে রোদে চুল শুকোচ্ছেন, দৈত্য তাঁকে ক্যাঁক করে' ধরে' বগলে পুরে খোলা জানলা দিয়ে গলে' হুশ্ করে উড়ে আকাশে উঠলো…উঠেই এক নিমেষে উধাও!

ধনুকে তীর লাগিয়ে রাজপুত্র ছুড়লেন…ছুরি ছুড়লেন…ছোরা ছুড়লেন…কোনোটা লাগলো না দৈত্যর গায়ে।…রাজপুত্র তখন বৌয়ের শোকে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

আহার নেই…নিদ্রা নেই…মেঝেয় পড়ে গড়াচ্ছেন। এক দিন গেল, দু-দিন গেল…দিনের পর

দিন গিয়ে চল্লিশ দিনের দিন শ্বশুর রাজা ফিরলেন মৃগয়া করে' পুরীতে। ফিরে বৃত্তান্ত শুনে তিনি বসে পড়লেন। রাজপুত্রকে বকলেন না—বেচারী ছেলেমানুষ! তার লোভ হয়েছিল দেখতে। বোঝেন, এ বয়সে ও লোভ সামলানো একরকম অসম্ভব!

নিশ্বাস ফেলে ছোট রাজপুত্র শ্বশুর রাজাকে বললেন—আমায় আপনি অনুমতি দিন···আমি বেরুবো...পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বৌ-রাজকন্যাকে উদ্ধার করে' আনবো।

রাজা বললেন—পাগল হয়েছো! খাঁটী ইস্পাত হলো সবচেয়ে ভীষণ দৈত্যরাজ...পৃথিবীর কোনো বীর তার সঙ্গে পারেনি। চার চার লক্ষ সৈন্য নিয়ে কতবার আমি তার সঙ্গে লড়াই করেছি—শেষে তিন লক্ষ সৈন্য মরবার পর ওকে বন্দী করে এনে ওর গলায় আর হাতে-পায়ে লোহার শিকল জড়িয়ে ওকে ঐ ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলুম।

রাজপুত্র বললেন—তা হোক, তবু আমি যাবো...আপনি যাবার অনুমতি দিন।

রাজার চোখ ছলছলিয়ে এলো। রাজা বললেন—আমার একটি মাত্র মেয়ে ছিল, বাবা—সেটিকে হারিয়েছি! জামাই হলেও তোমায় আমি দেখি নিজের ছেলের মতো! তোমায় হারালে আমি বাঁচতে পারবো না।

ছোট রাজপুত্র বললেন—কিন্তু বৌ-রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে না পারলে আমি মরে যাবো। তাছাড়া দৈত্য আমাকে তিন-তিনটে প্রাণ দিয়ে গেছে।···তার উপর ভগবানের দেওয়া একটা প্রাণ...আমার চারটে প্রাণ আছে···চট করে মরবো না।

ছোট রাজপুত্রের ধনুর্ভঙ্গ-পণ,···টলবে না! শ্বশুর-রাজা কি করেন, নিশ্বাস ফেলে দিলেন তিনি জামাই-রাজপুত্রকে যাবার অনুমতি।

ছোট রাজপুত্র তখন ঘোড়ায় চড়ে বেরুলেন বৌ-রাজকন্যার সন্ধানে।

অনেক দিন ধরে চলে চলে একদিন বিকেলে তিনি এসে পৌছুলেন প্রকাণ্ড বনের শেষে মস্ত এক প্রাসাদের সামনে। ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী প্রাসাদ। এ পাথর আবার কাঁচের মতো স্বচ্ছ···বাইরে থেকে প্রাসাদের ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যায়। রাজপুত্র ক্লান্ত···ঘোড়া হাঁফাচ্ছে। ...রাজপুত্র ভাবলেন, আজ রাত্তিরটা জিরিয়ে নি। ঘোড়াকে প্রাসাদের পাশে বড় একটা গাছে বেঁধে তিনি এলেন প্রাসাদের সামনে। সাদা পাথরের মধ্য দিয়ে ভিতর-দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ দেখেন, ওদিকে দোতলার ঘরে জানলার সামনে তাঁর বোন...বড় রাজকন্যা! দেখে রাজপুত্র আনন্দে বিহ্বল...তখনি প্রাসাদের মধ্যে ঢুকলেন। ঢুকে সিঁড়ি বয়ে একেবারে দোতলার সেই ঘরে···ঘরে ঢুকে ডাকলেন—বড়দি···

বড় রাজকন্যা বাহিরের দিকে চেয়ে ছিলেন ··রাজপুত্রের দিদি-ডাকে চমকে ফিরে চাইলেন। চাইবামাত্র দেখেন, আদরের ছোট ভাই ছোট রাজপুত্র। বড় রাজকন্যা ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,—ছোটরে, ছোটরে বলে অনেক আদর করলেন।

বড় বোনের রাণীর সাজ···মাথায় সোনার মটুক, পরণে মণি-মুক্তো আঁটা জমজমে পোষাক... মুখে-চোখে হাসি···দেখে ছোট বললেন—বিয়ে করে তুমি তাহলে সুখেই আছো বড়দি!

বড় বোন বললেন—হ্যাঁ ছোট...আমি সুখে আছি। দুঃখ এই যে বাপের বাড়ী যেতে পাইনা ···তোদের সঙ্গে দেখা হয় না।

ছোট বললেন—তোমার বর কি করেন? তিনি কে?

বড় বোন বললেন—তিনি হলেন রাক্ষসদের রাজা···রক্ষরাজ। বড় আর মেজো ভাইয়ের উপর তার ভয়ানক রাগ। বলে, তারা বিয়ে দিতে চায়নি···দেউড়ি থেকে হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। কখনো যদি তাদের দেখা পাই তো এক-কামড়ে দুজনকে চিবিয়ে খাবো। বলেন, ছোটকে কিছু বলবো না। সে খুব ভালো।...

ভাইবোনে সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছে···বাইরে ঝড়ের শব্দ। ব্যস্ত হয়ে বড় রাজকন্যা ছোট রাজপুত্রকে বললেন—তুই ভাই, ঐ পাশের ছোট ঘরে লুকিয়ে থাক্। মুখে একদিন যাই বলুক, জাতে তো রাক্ষস। কি জানি, সামনে দেখলে যদি তোকে খেয়ে বসে! তুই লুকিয়ে থাক...কথায় কথায় আমি ওর মনের ভাব জানি আগে...তারপর। কেমন?

ছোট বললে—বেশ।...

ছোটকে পাশের ছোট কুঠরীতে রেখে বড় রাজকন্যা কুঠরীর দরজা বন্ধ করে দিলেন। রক্ষরাজ এলো···পাহাড়ের মতো মূর্ত্তি। তার দেহের ভরে পুরী দুলে উঠলো।···এলো সে বড় রাজকন্যার ঘরে ···কুঠরীর দোরে যে চাবির ফুটো, সেই ফুটোয় চোখ রেখে ছোট রাজপুত্র দেখছেন। বড় ভগ্নীপতির মূর্ত্তি দেখলেন। ঘরে ঢুকে মাথার মস্ত খোলশ খুলে রক্ষরাজ রাখলো আনলার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো চাঁদের মতো কান্তি। দেবতুল্য সুন্দর মানুষ! দেখে ছোট রাজপুত্র খুশী হলেন। রাক্ষস মানে, বিকট-দাঁতওয়ালা রাক্ষস নয়। দিব্যি চমৎকার চেহারা!

পোষাক খুলে পালঙ্কে বসে নাক কুঁচকে কুঁচকে রক্ষরাজ জিজ্ঞাসা করলে—এমন কেন হচ্ছে রাণী? যেন মানুষের গন্ধ পাচ্ছি! মানুষ কে এখানে এলো?

বড় রাজকন্যা বললেন—মানুষ আর এখানে কে আসবে? কি করেই বা আসবে? তুমি বোধ হয় পৃথিবীতে গিয়েছিলে...জামায় মানুষের গায়ের গন্ধ লেগে আছে···সেই গন্ধ পাচ্ছো।

রক্ষরাজ বললে—তা হবে। হুঁ, আজ আমি নরলোকের দিকে গিয়েছিলুম একবার···

তারপর বড় রাজকন্যার সঙ্গে রক্ষরাজ রাজ্যের কথা কইতে লাগলো। সে কথার মধ্যে বড় রাজকন্যা নরলোকের কথা তুললেন, বললেন,—নরলোকে গিয়েছিলে তাই জিজ্ঞাসা করছি···বিয়ে হয়ে ইস্তক আমার তিন ভাইকে দেখিনি—যদি তারা এখানে আসে,···এখনো তোমার রাগ আছে?

রক্ষরাজ চোখ পাকিয়ে বললে—যদি এখানে আসে? বড়-মেজো এলে টুক্ করে তাদের গালে পুরবো। আমার সঙ্গে তারা তোমার বিয়ে দিতে রাজী হয়নি!···ছোট ভালো···সে যদি আসে, তাহলে তাকে মাথায় করে রাখবো।

—সত্যি ?

—নিশ্চয় ! রক্ষরাজ মিথ্যা বলে না কক্‌খনো।

এ কথা শুনে বড় রাজকন্যা কুঠরীর দোরে দিলেন আঙুলের টোকা···টোকা শুনে দরজা খুলে ছোট রাজপুত্র বেরিয়ে এলেন।

বড় রাজকন্যা বললেন—এই আমার ছোট ভাই···

—বটে ! বাঃ ! বলে' রক্ষরাজ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলে, বললে—আমার বন্ধু।···এখানে যখন এসেছো···বেশ কিছুদিন থাকতে হবে···ভোজ-টোজ খাও···আমোদ-আহ্লাদ করো। তার পর রাজ্যে ফিরবে।

ছোটকে মহাসমাদরে রাখলো রক্ষরাজ···ভোজ···নাচ-গান···আমোদ-প্রমোদ নিত্য নতুন নতুন।

চার দিনের দিন ছোট রাজপুত্র বললেন—খাঁটী ইস্পাত বলে দৈত্য আছে···সে কোথায় থাকে, জানো ?

দুচোখ বড় করে রক্ষরাজ বললে—সর্ব্বনাশ···হঠাৎ তার কথা কেন ?

—হঠাৎ নয় ! কারণ আছে। বলে' ছোট রাজপুত্র তাঁর বৃত্তান্ত বললেন। বললেন,—আমি বেরিয়েছি তার হাত থেকে আমার বৌ-রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।

রক্ষরাজ বললে—ও কথা মনেও এনো না। তার সঙ্গে লড়াই করে জিতবে, এমন বীর ত্রিভুবনে নেই। আমার সঙ্গে কতবার লড়াই হয়েছে—প্রত্যেক বার আমাকে হারিয়ে দেছে। তাই তাকে দেখলে অমি সরে থাকি...আর লাগতে যাই না।

ছোট রাজপুত্র বললেন—কিন্তু আমি তাকে চাই। তার জন্য যদি পৃথিবী তোলপাড় করতে হয়, তবু পেছপা হবো না।

—কিন্তু মারা যাবে, ভাই। তার চেয়ে আর একটি বিয়ে করো··· সোয়াস্তিতে বাঁচবে।

···না, না, না। আমি প্রাণের ভয় করি না। আমার চার চারটে প্রাণ। তার সঙ্গে আমি লড়বো···তার ওখানে আজই আমি বেরুতে চাই।

মানা তিনি শুনবেন না ! রক্ষরাজ বললে—বেশ, তাহলে বেরোও। মোদ্দা,···এই জিনিষ রাখো সঙ্গে···

এ কথা বলে নিজের পোষাক থেকে একটি পালক খুলে নিয়ে ছোটকে দিলে। দিয়ে বললে—যখনি বুঝবে আমার সাহায্য দরকার, বাতাসে এই পালকটি উড়িয়ে দিয়ো···আমি আমার রাক্ষস-সেনা নিয়ে তখনি তোমার সাহায্যে উদয় হবো গিয়ে।

পালক নিয়ে ছোট রাজপুত্র আবার বেরুলেন···ঘোড়া ছুটিয়ে। দু দিন তিন দিন অবিরাম ছুটে চার দিনের দিন সন্ধ্যার আগে তিনি এসে পৌঁছুলেন পাঁচিলের মতো লম্বা টানা এক উঁচু পাহাড়ের কোলে। পাহাড় টোপকে যেতে হবে...তা ছাড়া ওধারে যাবার অন্য পথ নেই।

ঘোড়া থেকে তিনি নামলেন। নেমে ঘোড়াকে পাহাড়ের নীচে একটা পাথরে বেঁধে চারদিকে চাইতে চাইতে তিনি দেখতে পেলেন, পাহাড়ের বুকের উপর···সবুজ মার্ব্বেল পাথরের তৈরী মস্ত এক পুরী। এ পুরীর পাথরের পাঁচিল দেওয়াল থাম···সব কাঁচের মতো স্বচ্ছ···পাঁচিল দেওয়াল ফুঁড়ে ভিতর দেখা যায়। রাজপুত্র ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন। শেষে দেখেন, পুরীর তিনতলার ঘরে খোলা জানলায় বসে মেজো-রাজকন্যা অর্থাৎ মেজদি! তখন আর এক-মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। পুরীর ফটক দিয়ে ঢুকে সবুজ মার্ব্বেল পাথরের সিঁড়ি বয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন মেজদির ঘরে···ডাকলেন,—মেজদি!

মেজদি আপন-মনে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন···চেনা গলায় মেজদি-ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালেন। তাকাবামাত্র দেখেন, আদরের ছোট ভাই।

ছুটে এসে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন,—তুই এখানে কি করে এলি ভাই?

ছোট রাজপুত্র তাঁর আসার ব্যাপার বলে' মেজদিকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। দেখেন, মেজদির মাথাতেও সোনার মুকুট···মুকুটে হীরে-মণি-মুক্তো জ্বল-জ্বল করছে···পরণে ঝক-মকে দামী পোষাক! বললেন,—কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো মেজদি···কিছুই জানলুম না!

মেজদি বললেন—আমার স্বামী পাখীদের রাজা···পক্ষীরাজ ঈগল। আমি বেশ সুখেই আছি... শুধু তোদের জন্য মন কেমন করে রে। খবর দিয়ে আনাবো, সে উপায় নেই!

ছোট রাজপুত্র বললেন—কেন?

মেজদি বললেন—বড়দা মেজদার উপর তোর ভগ্নীপতির ভয়ানক রাগ। বলে, বিয়ে দিতে চায়নি...দেখা পেলে নখে-ঠোঁটে ঠুকরে মুখ-নাক টুকরো-টুকরো করে দেবো।

—আমার কথা বলে নি?

—না।

ভাইবোনে সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছে···এমন সময় আকাশ জুড়ে কালো ছায়া...বাতাসে উঠলো ভয়ানক সাঁই সাঁই শব্দ।

আতঙ্কে মেজদি অস্থির! বললেন—উনি বাড়ী আসছেন। তুই এক কাজ কর, পাশের ঐ চোর-কুঠরীতে গিয়ে ঢোক্···আমি এধার থেকে দরজা বন্ধ করে দি···তারপর কথায় কথায় তোর কথা তুলবো! যদি তোর ভগ্নীপতি বলে, তোর উপরে রাগ নেই, তখন দরজা খুলে দেবো...তুই এসে ভাব করিস্।

এ কথা বলে' ছোট রাজপুত্রকে পাশের কুঠরীতে ঠেলে মেজো-রাজকন্যা দিলেন কুঠরীর দরজা বন্ধ করে'।

ঈগল-রাজ এলো ঘরে...এসেই নাক তুলে চারদিকে চাইলো, বললে,—নাকে বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছি কেন রাণী? যেন মানুষের গায়ের গন্ধ!

মেজো রাজকন্যা বললেন—নরলোক থেকে আসছো তো? তারি গন্ধ বোধ হয়।

ডানা-পালকের পোষাক খুলে ঈগল-রাজ পালঙ্কে বসলো···চমৎকার সুশ্রী মানুষের মূর্ত্তি ধরে...

কুঠরীর দরজার চাবির ফোকর দিয়ে ছোট রাজপুত্র সে মূর্ত্তি দেখলেন, দেখে আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

তার পর নানা কথায় কথায় ছোট রাজপুত্রের কথা পাড়লেন মেজো-রাজকন্যা···বললেন,—ছোট ভাইটির জন্য বড় মন কেমন করে···আদরের ছোট ভাই। তোমার ভয়ে তাকে আসতে বলতে পারি না।

ঈগল-রাজ বললে—কেন? আমাকে ভয় কিসের?

—তোমার যে রাগ আমার ভায়েদের উপর।

—না, না, না। ঈগল-রাজ বললে,—ছোটর উপর মোটে রাগ নেই···সে তোমাকে এনে আমার হাতে তুলে দেছে। তাকে আসবার জন্য লিখে পাঠাও।

এ কথা শুনে মেজো-রাজকন্যা মহাখুশী···কুঠরীর দোরে দিলেন টোকা। টোকা দিতে ছোট রাজপুত্র দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আলাপ-পরিচয় হলো। ঈগল-রাজ বললে—এসেছো যখন, তখন মাসখানেক এখানে থাকো··· আমোদ-আহ্লাদ করো। কত পাখীর গান শোনাবো···কত পাখীর নাচ দেখাবো, তেমন গান তোমাদের নরলোকে কখনো শোনোনি...তেমন নাচ জন্মে দ্যাখোনি!

পাঁচ দিন থাকবার পর ছোট রাজপুত্রের মন হলো অস্থির। বৌ-রাজকন্যার উদ্ধার-সাধন করতে হবে···বসে বসে আমোদ-প্রমোদ···ভালো লাগে না।

ছ-দিনের দিন ভোরে সকলের ঘুম ভাঙ্গলে ছোট বললেন ঈগল-রাজকে সমস্ত বৃত্তান্ত। বলে' তিনি জানালেন, আজই বেরুবেন সেই খাঁটি ইস্পাত দৈত্যর সন্ধানে···বৌ-রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে না পারলে সোয়াস্তি পাবেন না!

ঈগল-রাজ বললে—সর্ব্বনাশ! তার হাত থেকে বৌ উদ্ধার···অসম্ভব কথা! কেন মিছে প্রাণ হারাবে! তার চেয়ে আর একটি বিয়ে করো।

ছোট রাজপুত্র বললেন,—না। তাছাড়া আমার ভয় নেই···আমার চার চারটে প্রাণ···একটা প্রাণ ভগবানের দেওয়া...বাকী তিনটে প্রাণ ঐ বদমায়েস দৈত্যটা আমায় দেছে।

ছোট রাজপুত্র নিষেধ শুনবেন না—আজই যাত্রা করবেন! তখন ঈগল-রাজ পোষাকের একটি পালক ছিঁড়ে ছোট রাজপুত্রের হাতে দিলে, দিয়ে বললে—যদি বিপদে পড়ে আমার সাহায্য দরকার ভাবো, তাহলে বাতাসে এই পালকটি দিয়ো উড়িয়ে—চক্ষের নিমেষে তখনি আমি আমার লক্ষ পাখীর ফৌজ নিয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

পালক নিয়ে ছোট রাজপুত্র আবার ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় টোপ্‌কে যাত্রা করলেন। সাত দিন সাত রাত্রি অবিরাম ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আটদিনের দিন সন্ধ্যার আগে ছোট রাজপুত্র এসে পৌছুলেন প্রকাণ্ড এক নদীর ধারে। নদীর জলে অস্ত-সূর্য্যের কিরণ পড়েছে···জল একেবারে লাল টকটক করছে। নদীর তীরে মস্ত পুরী...এ পুরী লাল মার্ব্বেল পাথরে তৈরী···কাঁচের মতো স্বচ্ছ পাথর!

নদীর ধারে একটা বড় গাছে ঘোড়া বেঁধে ছোট রাজপুত্র ঘুরে ঘুরে পুরী দেখতে লাগলেন। হঠাৎ দেখেন, পুরীর চারতলার ঘরে খোলা জানলার ধারে বসে তাঁর ছোট বোন...ছোট রাজকন্যা!

ছুটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ছোট বোনের কি আনন্দ। বললেন, তাঁকে যিনি বিয়ে করেছেন, তিনি হলেন নাগ-রাজ···ছোট বোন এ রাজ্যের রাণী।

সন্ধ্যা হলো। নাগ-রাজ এলো। সাপের খোলশ খুলতেই বেরুলো তরুণ দিব্যকান্তি মানুষের মূর্ত্তি!

নাগ-রাজের রাগ নেই ছোটর উপর। আলাপ-পরিচয় হলো। নাগ-রাজ মহাখুশী ছোটকে পেয়ে—পাহাড়ে-পর্ব্বতে যত জাতের সাপ আছে, দেখালেন। ভোজ নাচ-গান চললো কদিন মহা সমারোহে।

তারপর ছোট রাজপুত্র বেরুবেন খাঁটী ইস্পাতের সন্ধানে ··বৌকে উদ্ধার করবেন...নাগ-রাজ অনেক নিষেধ করলে, বললে,—কেন সাধ করে প্রাণ হারাবে! ছোট রাজপুত্র কিন্তু কোনো নিষেধ মানবেন না! তখন নাগ রাজ দিলে ছোট রাজপুত্রকে খোলশ থেকে ছিঁড়ে তার একটু টুকরো—বললে,—বিপদ বুঝলে বাতাসে এটি দিয়ো ছেড়ে···চক্ষের পলকে আমি আমার লক্ষ নাগ-নাগিনী নিয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

তারপর ছোট রাজপুত্র বেরুলেন ঘোড়া ছুটিয়ে···

কত পাহাড়, কত পর্ব্বত, কত নদী, কত জলা বন পার হয়ে পনেরো দিনের দিন সন্ধ্যার আগে তিনি এসে পৌঁছুলেন প্রকাণ্ড এক মরুভূমিতে। ঘোড়া ছেড়ে তিনি মরুভূমির বালি ভেঙ্গে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন এক গুহার সামনে। এসে দেখেন, গুহার মুখে পাথরের উনুনের সামনে বসে তাঁর বৌ বসে রান্না করছেন।···বৌয়ের মুখ মলিন···দু চোখে জলের ধারা···

দেখে ছোট রাজপুত্র ছুটে গিয়ে বৌকে নিলেন বুকে। বৌ চমকে উঠলেন...বললেন—তুমি! যাও, যাও, পালাও···সন্ধ্যা হলে দৈত্য আসবে। তোমাকে দেখলে তখনি তোমার প্রাণ নেবে। ওগো, তুমি পালাও।

ছোট রাজপুত্র বললেন—পালাবো...কিন্তু তোমাকে নিয়ে। এসো, আমার ঘোড়া আছে একটু আগে। সে ঘোড়ায় তোমায় তুলে এখনি আমি ফিরবো।

বৌয়ের বুক আতঙ্কে কাঁপছে···ছোট রাজপুত্র তাঁকে পিঠে তুলে তখনি এলেন ঘোড়ার কাছে। বৌকে ঘোড়ায় তুলে নিজে উঠে বসলেন ঘোড়ার পিঠে···তার পর জোরসে দিলেন ঘোড়া ছুটিয়ে।

খানিক দূর গেছেন, হঠাৎ পিছন দিকে ইস্পাতের ঝন্‌ঝন্ শব্দ।

বৌ বললেন—ঐ এলো···

বলতে বলতে হাওয়ায় ভেসে খাঁটি ইস্পাত দৈত্য এসে সামনে দাঁড়ালো···প্রকাণ্ড লম্বা ইস্পাতের

হাত বার করে বৌয়ের চুলের ঝুঁটী ধরে ঘোড়া থেকে ছিনিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিলে—তার পর ছোট রাজপুত্রকে বললে—একটি প্রাণ গেল। বাকী এখন তিনটে। সে তিনটে প্রাণ নিয়ে সরে পড়ো বাছাধন—এখানে চালাকি করতে এসোনা আর।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বৌকে নিয়ে খাঁটি ইস্পাত বালির ঘুর্ণী উড়িয়ে উধাও !...

ছোট রাজপুত্র কিন্তু ফিরলেন না···ঘোড়া ফিরিয়ে ছুটলেন আবার সেই গুহার দিকে। গুহায় পৌছুলেন বিকেল বেলা...এসে বৌকে নিয়ে আবার তুললেন ঘোড়ার পিঠে···তুলে দে ছুট।

এবারো উদ্ধার হলো না। খাঁটী ইস্পাত এসে বৌকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল...বললে—ফের এসেছো চালাকি করতে! আর একটি প্রাণ গেল তোমার। বাকী এখন তুটি··· সাবধান!

কিন্তু কে শোনে সে কথা! ছোট রাজপুত্র আবার ফিরলেন—আবার বৌকে ঘোড়ার পিঠে তুলে বাড়ীর দিকে যাত্রা···

এবারো খাঁটী ইস্পাত এসে বৌকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল···দাঁত কিড়মিড় করে বলে গেল, ভগবানের দেওয়া একটি প্রাণ শুধু রইলো, সে প্রাণের মায়া যদি থাকে তো খবর্দ্দার আর···

ছোট রাজপুত্র ভাবলেন,···একটি মাত্র প্রাণ...বৌকে উদ্ধার করতে না পারলে সে প্রাণ রেখে লাভ! যায় প্রাণ, যাক্‌···ছাড়া হবে না।

তিনি আবার এলেন···বৌকে ঘোড়ায় তুলে আবার ঘোড়া ছুটোলেন বাড়ীর দিকে।...এবার এলেন অনেক দূর...

অনেক দূর আসবার পর পিছনে আবার সেই ইস্পাতের শব্দ। ছোট রাজপুত্র তখন বাতাসে উড়িয়ে দিলেন সেই তুই পালক আর সাপের খোলশের টুকরোটুকু...

দেখতে দেখতে তিন-দিক থেকে এলো তিন ভগ্নীপতি···লাখ-লাখ ফৌজ নিয়ে···লাখ-লাখ রাক্ষস···লাখ-লাখ নখ-ওলা ঠোঁট-ওলা পাখী আর লাখ-লাখ সাপ! আর একদিক থেকে এলো খাঁটী ইস্পাত দৈত্য···একা।

তু-দলে ভয়ানক লড়াই হলো। জিতলো শেষে খাঁটী ইস্পাত···বৌকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোট রাজপুত্রকে ইস্পাতী হাতের প্রচণ্ড ঘুষি মেরে দৈত্য আবার মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইস্পাতের সে ঘুষিতে রাজপুত্র অজ্ঞান...অচেতন। তিন ভগ্নীপতি মিলে সেবা-শুশ্রূষা করলো—অনেক ওযুধ-পথ্যি দিলে। তিনদিনের দিন ছোট রাজপুত্রের জ্ঞান হলো। তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

ভগ্নীপতিরা বললে—বৌকে উদ্ধার না করে তুমি যখন ফিরবে না, তখন লড়াই নয়···ফন্দী-ফিকির চাই।

ছোট রাজপুত্র বললেন,—কি ফন্দী?

তারা বললে—খাঁটী-ইস্পাতের প্রাণ কোথায়···তার সন্ধান নিতে হবে। চুপি-চুপি গিয়ে বৌয়ের

সঙ্গে দেখা করো। দেখা করে বলো—প্রাণের সন্ধান কোনো মতে জেনে তোমাকে সে খবর দেবে··· তার পর দুজনে মিলে বিহিত করবো।

ছোট রাজপুত্র বললেন—বেশ কথা।

ভগ্নীপতিরা বললে,—সাবধান, সে-সন্ধান না নিয়ে যেন বৌকে আবার উদ্ধার করতে ঘোড়ার পিঠে তুলো না।

ছোট রাজপুত্র বললেন—না।

ছোট রাজপুত্র তাই করলেন···চুপি চুপি এসে গুহার সামনে বৌয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। দেখা করে তাঁকে বললেন, যে পরামর্শ হয়েছে, সেই বৃত্তান্ত। শুনে বৌ বললেন,—বেশ···করবো আজ জিজ্ঞাসা। তুমি কিন্তু এখানে থেকো না...পালাও।...

ছোট রাজপুত্র বললেন—ভয় নেই। আমি লুকিয়ে থাকবো। দেখা দেবো না।

সন্ধ্যা হলো। আকাশ কালো করে খাঁটী ইস্পাত ফিরলো। গুহায় রান্না-বান্না হয়ে গিয়েছে, বৌ দিলেন দৈত্যের সামনে ধরে পাত্র ভরে নানা খাবার। দৈত্য খেতে লাগলো।

খেতে খেতে দৈত্য হেসে বললে—সে বোকাটা আর আসেনি তো?

বৌ বললেন—পাগল হয়েছো তুমি! আবার আসবে?

হেসে দৈত্য বললে—আসবার সামর্থ্য থাকলে তো অসেবে! আমার বজ্র-ঘুষি দিয়েছি তার মাথায়...সে মাথা আর তুলতে হবে না···ঐ ঘায়েই বাছাধনের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি!

বৌ বললেন—আচ্ছা, তুমি যে এমন করে অত ফৌজের সঙ্গে একা লড়তে গেলে, প্রাণের ভয় নেই?

—প্রাণের ভয়! হুঁঃ! আমার প্রাণ কি আমার এ-ধড়ে রাখি! আমার প্রাণ এমন জায়গায় তোলা আছে, কার সাধ্য ছোঁবে!

নিরীহের মতো সহজ সরল ভাবে বৌ বললেন,—সে আবার কি! দেহ থেকে বার করে না কি প্রাণ আবার আর কোথাও রাখা যায়!

মস্ত একখানা হাড় চিবুতে চিবুতে দৈত্য বললে,—আমার প্রাণ আমার বর্মে।...

বৌ-রাজকন্যা বললেন—তাও না কি হয়! বর্ম তো নিরেট ইস্পাতের তৈরী···তার মধ্যে প্রাণ থাকতে পারে কখনো?

হেসে দৈত্য বললে—না, না···প্রাণ আছে আমার ঐ তীর-ধনুকের মধ্যে।

মুখ ফিরিয়ে বৌ-রাজকন্যা বললেন,—থাক্, থাক্, শুনতে চাই না। বলবে না বললেই পারো। ছেলেমানুষ বলে আমায় তুমি বোকা ভাবো...যা বলবে, তাই বিশ্বাস করবো!

হা-হা করে হেসে দৈত্য তখন বললে—তোমার রাজপুত্তুরের যদি বাঁচবার আশা থাকতো, তাহলে সত্য কথা বলতুম না...কিন্তু সে যখন বাঁচবে না...তখন বলতে বাধা দেখি না। শুনবে তবে আমার প্রাণ কোথায় আছে?

বৌ-রাজকন্যা মুখ তুলে চাইলেন দৈত্যর পানে।

দৈত্য বললে—এখান থেকে খানিক আগে উত্তর দিকে মস্ত একটা কালো পাহাড় আছে···সেই পাহাড়ের গুহায় থাকে নীল শেয়াল···শেয়ালের বুকে থাকে আবার একটা টুনটুনি পাখী···সেই পাখীর বুকে আমার প্রাণ আমি লুকিয়ে রেখেছি।

কথা শুনে বৌ-রাজকন্যা বললেন—ও·········কিন্তু······কেউ যদি সে শেয়ালকে ধরে মেরে ফেলে?

দৈত্য বললে—সে জো নেই। শেয়ালটা ঘড়িক-ঘড়িক চেহারা পালটাতে পারে···কে তাকে ধরবে?

বৌ-রাজকন্যা বললেন—তাহলে বটে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, পশু-পক্ষী একজোট হলেও তোমার ভয় নেই। না হলে তোমার জন্য সত্যি, আমার এমন ভয় হয়...

কথাটা বলে বৌ-রাজকন্যা নিশ্বাস ফেললেন।

পরের দিন সকালে খাঁটী ইস্পাত বেরিয়ে গেল শিকারের সন্ধানে···ছোট রাজপুত্র চুপি-চুপি এসে দৈত্যর প্রাণের সন্ধান নিলেন।

নিয়ে আর এক·মিনিট দাঁড়ালেন না···তখনি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তিন ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা করলেন···তাদের বললেন দৈত্যর প্রাণের গুপ্ত কথা।

শুনে সকলে মহাখুশী...চারজনে তখনি বেরুলেন কালো পাহাড়ে সেই নীল রঙের শেয়ালের সন্ধানে। সঙ্গে চললো বিরাট অক্ষৌহিণী...লাখ লাখ রাক্ষস···লাখ লাখ ঠোঁটালো আর নখালো পক্ষী···আর লাখ লাখ নাগ-নাগিনী!

তাদের দেখে শেয়ালের হৃৎকম্প হলো।···ধাঁ করে হাঁসের মূর্ত্তি ধরে প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে সে দিলে প্রকাণ্ড বিলের জলে ডুব···ঈগল রাজের সেনাপতি সারস তখনি দুই ঠোটের চিমটে-ধরে তাকে ডাঙ্গায় তুললো। যেমন তোলা, হাঁস অমনি চিলের মূর্ত্তি ধরে আকাশে উড়লো। যেমন ওড়া, ঈগল-রাজের আর-এক সেনাপতি বাজ-পক্ষী উড়লো তার পিছনে তাড়া করে। বাজপাখীর তাগ ফস্কাবার নয়···চিলকে ধরে এক ঠোকরে তার দেহখানা দিলে ফেঁড়ে। বুক থেকে ছোট টুনটুনি পড়লো বেরিয়ে...বেরিয়েই ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে, বাজপাখী মারলো টুনটুনিকে নখের ঘা! নখে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেমন দেহ ফাঁড়া, অমনি টুপ করে ছোট্ট টুনটুনি পড়লো নীচের শক্ত মাটিতে। যেমন পড়া, ছোট রাজপুত্র তাকে ধরে গনগনে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন। আগুনে টুনটুনি পাখী ধিকি-ধিকি পুড়তে লাগলো...

বেলা তখন দুপুর···খাঁটী ইস্পাত গুহায় এসেছে ভাত খেতে···আর ঠিক সেই সময়ে পুড়ে-পুড়ে টুনটুনি পাখী হলো ছাই! অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চীৎকার করে দৈত্য পড়লো গুহার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে···পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে একেবারে পাথর! তার সে-চীৎকারে সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠলো সে দুলুনিতে সাগরে-নদীতে রীতিমত বন্যা···ভয়ানক ভূমিকম্প হলো!

তার পর...আমরা যা চাই, বৌ-রাজকন্যাকে নিয়ে ছোট রাজপুত্র ফিরলেন শ্বশুর-রাজার রাজ্যে।

ভোজের ধুম। বাজনা-বাদ্যি, নাচ-গান···সে ভোজে ছোট রাজপুত্রের তিন বোন এলেন, তিন ভগ্নীপতি এলো...এলেন না শুধু বড় আর মেজো রাজপুত্র। তাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি...তাঁদের দুজনের উপর ভগ্নীপতিদের যে-রকম রাগ···এখানে দেখা হলে কি জানি. যদি তাদের খেয়ে ফেলে।

এক চাষা। চাষার ক্ষেতে খুব গম হয়েছে। থলে ভরে সব গম তুলে চাষা দিলে তার ছেলেকে; দিয়ে বললে—এ-গম জাঁতায় ভাঙিয়ে আটা তৈরী করে আন্। কিন্তু সাবধান, জাঁতাওলা যদি মাকুন্দো হয় দেখিস তো তার কাছে খবর্দ্দার গম ভাঙাবি নে।

ছেলে বললে,—আচ্ছা।

গম নিয়ে ছেলে এলো বাজারে···জাঁতাওলার দোকানে।

জাঁতাওলা বললে—গম ভেঙে দিতে হবে? বেশ...আমার গম এখনি ভাঙবো···সেই সঙ্গে তোমার গম মিশিয়ে ভেঙে দেবো···রাখো তোমার থলে।

চাষার ছেলে এতক্ষণ জাঁতাওলার পানে চায়নি···এখন নজর পড়লো। তার মুখের পানে চেয়ে ছেলে দেখে, সর্ব্বনাশ! জাঁতাওলার দাড়ি নেই, গোঁফ নেই—যাকে বলে, মাকুন্দো। বাপের কথা মনে পড়লো...মাকুন্দোকে দিয়ে গম ভাঙানো বারণ...তখনি সে গমের থলে আবার মাথায় তুললো।

জাঁতাওলা বললে—হলো কি হে ছোকরা? গম না ভাঙিয়েই থলে ঘাড়ে করছো যে?

ছেলে বললে,—না, গম ভাঙাবার পয়সা আনতে ভুলে গেছি।

এ-কথা বলে গমের থলে ঘাড়ে তুলে ছেলে এলো জাঁতাওলার দোকান থেকে বেরিয়ে।

বেরিয়ে আর এক জাঁতাওলার দোকান। মাকুন্দো এর মধ্যে করেছে কি, গলি-পথ ঘুরে আগে থেকেই দু-নম্বর দোকানে এসে বসেছে। চাষার ছেলে এসে দেখে, ওমা, এ দোকানের জাঁতাওলাও মাকুন্দো! এ দোকানেও গম ভাঙানো হলো না...গমের থলে ঘাড়ে ছেলে এলো তিন-নম্বর দোকানে।

তার আসবার আগে মাকুন্দো এ দোকানে এসে বসে আছে জাঁতাওলা হয়ে। ছেলে এসে দেখে, তিন-নম্বরেও মাকুন্দো জাঁতাওলা! তিন-নম্বরেও গম ভাঙ্গানো হলো না। থলে ঘাড়ে ছেলে বেরিয়ে এলো—এসে ঢুকলো চার-নম্বর দোকানে। চার-নম্বরেও সেই মাকুন্দো। এখানেও গম ভাঙ্গানো হলো না।

তারপর ছ-নম্বর দোকান, সাত-নম্বর দোকান—যে-দোকানে যায়, মাকুন্দো কারসাজি করে আগে এসে জাঁতাওলা হয়ে বসে আছে···ছেলে এসে দেখে।

দশ-বারোটা দোকানে পর-পর দশ-বারোজন জাঁতাওলাকে মাকুন্দো দেখে ছেলে ভাবলো, বাজারের সব জাঁতাওলাই মাকুন্দো! তা যদি হয়, উপায়?

ছেলে থলে রাখলো বারো-নম্বর দোকানে, রেখে দেখে, ওদিকে জাঁতায় ভাঙ্গা হচ্ছে জাঁতাওলার গম।···

সে-গম ভাঙ্গা শেষ হলো। গম ভেঙ্গে আটা তোলা হলো বস্তায়, তখন ছেলে বললে জাঁতাওলাকে—এবারে আমার গমগুলি ভেঙ্গে দেবে?

জাঁতাওলা বললে—কেন দেবো না? তোমার থলে উজাড় করে জাঁতায় গম দাও···এখনি ভেঙ্গে দিচ্ছি।

ছেলে তখন থলে থেকে জাঁতাওলার জাঁতায় সব গম দিলে ঢেলে···জাঁতাওলা তার গমগুলি ভেঙ্গে দিলে। ছেলের সব গম ভাঙ্গা হয়ে গেলে জাঁতাওলা বললে—তোমার এ জাঁতা-ভাঙ্গা আটায় একখানা পরোটা তৈরী করি···কেমন?

জাঁতাওলার এ কথা শুনে ছেলের মনে পড়লো বাপের নিষেধ···বাবা বলে দেছে, মাকুন্দো জাঁতাওলার কাছে খবর্দার গম ভাঙ্গাসনে!

কিন্তু ভাঙ্গিয়ে যখন ফেলেছে,...

নিরুপায়ে নিশ্বাস ফেলে ছেলে বললে—আচ্ছা, করো।

মাকুন্দো তখন বড় একখানা কাঠের বারকোশে ছেলের সমস্ত আটা ঢেলে তাতে ঢাললো জল।...এ জল ছেলেকে দিয়েই সে বইয়ে আনালো কলসী ভরে। আটায় এত জল ঢাললো...যেন আটার মধ্যে পুকুর খোঁড়া হয়েছে! তারপর সে-জলে আটা মেখে জাঁতাওলা প্রকাণ্ড একখানা পরোটা তৈরী করলে...করে জলন্ত উনুনে পরোটাখানা ভালো করে সেঁকলো—সেঁকে পরোটাখানা রাখলো সেই কাঠের বড় বারকোশের উপর। রেখে মাকুন্দো বললে—এখন আমার কথা শোনো। যে-পরোটা তৈরী হলো, এ পরোটা যদি দুজনে আধাআধি ভাগ করে খাই তো কারো পেট ভরবে না। তাই আমি বলি কি,—আমরা দুজনে বানিয়ে মিথ্যা গল্প বলবো—চালবাজির গল্প। যার মিথ্যা সেরা হবে, সে এই পরোটা খাবে ভাগাভাগি না করে···একেবারে গোটা আস্ত পরোটা...কি বলো? এতে রাজী?

একটু ভেবে ছেলে বললে,—বেশ, আমি রাজী। তুমি তাহলে আগে বলো তোমার গল্প। এত মেহনৎ করে গম ভাঙলে, পরোটা তৈরী করলে, তোমার মান রাখা চাই তো।

মাকুন্দো তখন চালবাজির এক মিথ্যা কাহিনী সুরু করলে···ছেলে শুনতে লাগলো নিবিষ্ট মনে

মাকুন্দোর চালবাজির গল্প···নিঃশব্দে বসে শুনলো। খুব মিথ্যা যা-তা চালবাজির একটা গল্প কোনোমতে শেষ করে মাকুন্দো হাঁফিয়ে পড়লো!

ছেলে বললে—এর মধ্যে থামলে কেন? বলো...আরো কত চালবাজির গল্প বলবে, শুনি।

হাঁফিয়ে দম নিয়ে মাকুন্দো বললে—ঐ একটা গল্প বলতেই জান্ বেরিয়ে যাবার জো! আর গল্প বলতে পারবো না। এখন তুমি বলো তোমার চালবাজির গল্প!

—বেশ...

তখন ছেলে সুরু করলে তার চালবাজির মিথ্যা গল্প:

ছেলে বলতে লাগলো:

আমি যখন ছোট ছিলুম,—তার মানে, আমার বয়স যখন পঞ্চাশ-ষাট বছর, তখন আমাদের বাগানে মৌমাছিরা প্রায় লাখ-খানেক মৌচাক তৈরী করেছিল···আর আমার কাজ ছিল রোজ সকালে

ঘুম থেকে উঠে বাগানে গিয়ে প্রত্যেকটি চাকের মৌমাছি গোণা···কোনোটা হারালো, কি, মারা গেল—কড়াক্কড় তাদের হিসাব রাখতুম্। একদিন সকালে হলো কি, মৌমাছি গুণতে গিয়ে দেখি, সব চেয়ে ভালো মৌমাছি ক'টা নেই! কোথায় গেল···আমি অস্থির হয়ে পড়লুম। তখনি একটা মুর্গীর পিঠে জিন চাপিয়ে মুর্গীতে চড়ে আমি ছুটলুম সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রের ধারে বালি উড়িয়ে আগাগোড়া সন্ধান করেও মৌমাছির চিহ্ন পেলুম না। তখন ভাবলুম, নিশ্চয় তাহলে জলে পড়ে ভেসে গেছে। ঝাঁপিয়ে জলে পড়লুম। সাঁতার দিয়ে সমুদ্রের জল তোলপাড় করে ফেললুম...গোটা ছ দিন আর ছ রাত্তির! তারপর তিন দিনের দিন ওপারে ডাঙায় গিয়ে উঠলুম। ডাঙার একটু দূরে মস্ত ক্ষেত···সেই ক্ষেতে দেখি, এক চাষা আমাদের মৌমাছির ঘাড়ে লাঙল চাপিয়ে পরমানন্দে ক্ষেত

চষছে। তার ক্ষেতে যবের চাষ। চোখ রাঙিয়ে চাষাকে ধমক দিলুম, বললুম—এ তো আমাদের মৌমাছি···তুমি কি করে পেলে বাপু? হাত জোড় করে চাষা বললে,—তোমার মৌমাছি হয়, তাহলে তুমি নিয়ে যাও! নিলুম আমার মৌমাছি। চাষা বললে—এতদূর এসে শুধু-হাতে ফিরো না, তোমার মৌমাছির দৌলতে যে যবগুলি পেয়েছি, সেগুলি তোমার প্রাপ্য···সেগুলি থলিতে ভরে দিচ্ছি, নিয়ে যাও···তোমার মৌমাছির সঙ্গে! আমি খুশী হয়ে বললুম,—বেশ···এ তো ভালো কথা।···এ কথা বলে যবের বস্তা ঘাড়ে তুললুম···তুলে মুর্গীর পিঠ থেকে জিন খুলে নিয়ে সে জিন চপালুম মৌমাছির পিঠে। মুর্গীটা এতখানি পথ আমায় বয়ে এনেছে, তাকে একটু জিরেন দেওয়া দরকার তো! মুর্গীকে আমার পিছনে মৌমাছির পিঠে তুলে নিলুম···নিয়ে সমুদ্র পার হচ্ছি···সমুদ্রের মাঝামাঝি এসেছি, এমন সময় যবের থলির একদিককার দড়ি গেল ফটাশ করে ছিঁড়ে! আর থলির যত যব, সব গেল সমুদ্রের জলে পড়ে!···তখন আমার এত দুঃখ হলো! কিন্তু দুঃখ হলেই বা করি কি? তারপর যখন পার হয়ে এ-পারে এসে উঠলুম, তখন বেশ রাত হয়েছে···নিশুতি রাত...আকাশে চাঁদ ...আর নীচে মিষ-কালো অন্ধকার! সে অন্ধকারে ভাবলুম, এখানে পড়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক। এই ভেবে মৌমাছিকে ছেড়ে দিলুম মাঠে চরে ঘাস খেতে আর মুর্গীটাকে আমার কাছে এক খুঁটাতে বেঁধে তাকে দিলুম দুটি খড়···খাবার জন্য। এ সব করে আমি শুয়ে ঘুমোতে লাগলুম।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলে চোখ মেলে দেখি, সর্ব্বনাশ···রাত্রে নেকড়ের দল এসে মৌমাছিদের খেয়ে সাবাড় করেছে,আর সমুদ্রের তীরে মধু পড়ে থস্থস্ করছে। কি ঘন মধু! আর এত মধু যে সমুদ্রের ধার থেকে ওদিকে সেই গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত মাঠের উপর দিয়ে মধুর বন্যা বয়ে গেছে যেন! এক-এক জায়গায় কোমর-ভোর মধু জমে আছে···কোথাও বা হাঁটু-ভোর মধু! আমি পড়লুম মহা-মুস্কিলে।···এত মধু···কিসে করে এ-মধু নেবো...বড় পাত্র-টাত্র কাছে নেই! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়লো, বা...আমার সঙ্গে ছোট্ট একখানা চাকু ছুরি আছে তো, ভাবনা কি...যেমন এ কথা মনে হওয়া, অমনি চাকু ছুরি খুলে ঢুকলুম গিয়ে জঙ্গলে···একটা বাঘ কি গণ্ডার যদি পাই তো এই চাকু দিয়ে তাদের ছাল খুলে নিয়ে থলি তৈরী করবো...করে সেই থলিতে মধু ভরে বাড়ী ফিরবো।

বনে ঢুকে দেখি, সামনেই দুটো শিংওলা হরিণ ··এক ঠ্যাং তুলে হরিণ দুটো লাফাচ্ছে। এ্যায়সা কায়দায় তাগ করে ছুরি ছুড়লুম যে ছুরি গিয়ে দু-দুটো হরিণের দুখানা পা দিলে কুচ করে কেটে। পা কাটতে হরিণদের আর নড়বার উপায় রইলো না! দুটোই সেখানে লুটিয়ে পড়লো। তখন আমি সেই চাকু দিয়ে হরিণ দুটোর গা থেকে তিনখানা চামড়া কেটে তিনটে থলি সেলাই করে ফেললুম সেইখানে বসে চক্ষের নিমেষে! তারপর সেই থলি তিনটে এনে খুঁটে খুঁটে মধু কুড়িয়ে থলি ভরতি করলুম। ভরতি-তিন-থলি মুর্গীর পিঠে তুলে বাড়ী রওনা।

বাড়ী ফিরে শুনি, আঁতুড়ঘরে ছেলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। ব্যাপার কি? শুনলুম, আমার বাবা জন্মেছেন!...আমাকে দেখে আমার ঠাকুর্দ্দা বললেন—বসা নয়, দাঁড়ানো নয়, তোকে এখনি স্বর্গে যেতে হবে—সেখান থেকে এক-ঘটী শুদ্ধ জল আনতে হবে—খোকার মাথায় সে-জল দিয়ে ওকে শুদ্ধ করা চাই। বেরুলুম বাড়ী থেকে। পথে এসে ভ্যাবাচাকা...স্বর্গে তো যাবো, কোন্

পথে যাবো—জানা নেই! মহাবিভ্রাট...ভাবছি, কোথায় কি করে পথের সন্ধান পাই...এমন সময় মনে পড়লো, সর্ব্বনাশ! রাত্রে এক-থলি যব পড়ে গেছে সমুদ্রের জলে...সেগুলো তো আনতে হবে...অত টাকার যব জলে যাবে? স্বর্গ ছেড়ে ছুটলুম তখনি সমুদ্রের ধারে। গিয়ে দেখি, রাতারাতি আমার সে যবগুলো থেকে লাখ-লাখ যব-গাছ গজিয়ে উঠেছে। শুধু গজানো? গজিয়ে এত লম্বা হয়ে বেড়েছে, যে সে-সব যবের শীষ একেবারে স্বর্গে গিয়ে ঠেকেছে! চেয়ে চেয়ে দেখছি, হঠাৎ মনে হলো, এই গাছ বয়ে স্বর্গে যাওয়া যায় তো। চট করে যব গাছ বেয়ে উঠে পড়লুম সোজা একেবারে স্বর্গে। সেখানে গিয়ে দেখি, আমারি এই সব গাছের শীষে-শীষে যবের দানা—পেকে একেবারে তুলতুল করছে...কি তার গন্ধ বেরিয়েছে! সে-গন্ধে স্বর্গের পারিজাতের গন্ধ কোথায় গেছে উবে!...আরো দেখি, একজন দেবতা বসে সে যবের শীষ কেটে বার্লি নিয়ে তাতে খাশা রুটী তৈরী করছেন, আর সে বার্লিতে চিনি মিশিয়ে খাচ্ছেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলুম বললুম—কেমন বার্লি, দেবতা? দেবতা বললেন—চমৎকার! এমন বার্লি আমি এর আগে জন্মে খাইনি হে! তাঁকে বললুম,—আমার বার্লি। শুনে তিনি মহা-খুশী...বললেন,—এমন বার্লি কোথায় পেলে বাবা? বলো, তুমি কি চাও? কি পেলে তুমি খুশী হবে? আমি বললুম—আমি চাই এই স্বর্গের জল—আমার বাবা একটু আগে জন্মেছেন...তাঁকে শুদ্ধ করে নিতে হবে কি না। তিনি তখনি আমায় এক-ঘটী স্বর্গের জল দিলেন। জল নিয়ে পৃথিবীতে নামবো, নীচে চেয়ে দেখি, ওমা, পৃথিবীতে ভয়ানক বৃষ্টি হয়ে গেছে এর মধ্যে! এত জল যে সমুদ্র ফেঁপে ঢেউয়ের গুঁতো মারছে স্বর্গের কিনারায় আর আমার অত যে যব গাছ, সেগুলো সব জলে ডুবে গেছে! পৃথিবীতে নামি কি করে? ডাঙ্গার চিহ্ন নেই! ভয় হলো। এ জল কতদিনে কমবে...কত দিনে ডাঙ্গা পাবো! ততদিন আমার উপায়? ভাবছি আর ভাবছি···ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হলো, বারে... মাসখানেক মাথার চুল ছাঁটিনি···মাথার চুলগুলো হয়েছে দারুণ লম্বা। মাথার এই চুল ছিঁড়ে দেখি, যদি কিনারা পাই! চাকু ছুরি ছিল সঙ্গে—সেই ছুরি দিয়ে মাথার একগোছা চুল কেটে নিলুম··· কেটে একগাছা-একগাছা করে একসঙ্গে বাঁধলুম···বেঁধে একদিক ধরে আর একদিক দিলুম স্বর্গ থেকে নীচে পৃথিবীর দিকে ঝুলিয়ে। তারপর সেই চুলে-চুলে-বাঁধা দড়ি ধরে আমি নামছি, এমন সময় আমার ভারে দড়ি গেল ছিঁড়ে। অত উঁচু থেকে ধপাশ করে পড়ে মরি আর কি! বুদ্ধি জাগলো, হাতে যে-দড়ি ছিল খাঁইসে কষে তাতে একটা গিঁট দিলুম—গিঁট দিয়ে সেই গিঁট ধরে' ঝুলতে লাগলুম...ঝুলছি আর ঝুলছি···নীচে নামবার কোনো উপায় নেই···শেষে বেলা পড়ে সূর্য্য ডুবে গেল···অন্ধকার রাত···কি কালো অন্ধকার! অত মেহনৎ গেছে···ঘুমে চোখ ঢুলে এলো। নিরুপায়ে সেই চুলে-বাঁধা-গিঁটে মাথা রেখে দেহ ঝুলিয়ে ঘুমোলুম।···ঘুমোচ্ছি···এমন সময়, জানিনা কি করে···বোধ হয় আমার পকেটে দেশলাইয়ের বাক্স ছিল—কি করে আমার সেই ঢুলুনিতে, ঘষাঘষিতে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো জ্বলে উঠেছে! জ্বলে যে-চুল ধরে আমি ঝুলছি, সে চুলগাছা পড়পড় করে পুড়ছে। পোড়া চুলের গন্ধে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল···ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ধপাশ করে আমি পড়লুম নীচে...জলে পৃথিবীর বুকে প্যাচপ্যাচনি-কাদা আর পাঁক...তাইতে। পড়তেই

আমার কোমর পর্য্যন্ত গেল পুঁতে। কি করে উদ্ধার পাই...বাড়ীতে কোদাল আছে...তখনি বাড়ীতে ছুটলুম কোদাল আনতে। কোদাল এনে কাদা-পাঁক চেঁছে দেহকে তুললুম টেনে...নিজেকে করলুম উদ্ধার। উদ্ধার হয়েই মনে পড়লো, তাইতো, আমার কাছে স্বর্গের জল...আতুঁড়ে আমার বাবার মাথায়-গায়ে সেই জল ছিটুনো হবে!

গাঁয়ের কাছাকাছি এসেছি, দেখি, চাষীরা ক্ষেতে নেমে কাজ করছে! সেদিন কি গরম...কাঠফাটা রোদ্দুর...সে রোদে বেচারীরা হাঁশফাঁশ করছে...ঘেমে সবার গা হয়েছে ভেলা...তিমির গায়ের মতো। হেঁকে তাদের বললুম—এ রোদে কাজ করিসনে রে, ছায়ায় যা...নাহলে সর্দ্দিগর্মি হয়ে সকলে মারা যাবি! ক্ষেতের কোনোদিকে কোনো গাছ নেই যে ছায়া পাবে। তারা বললে,—ছায়া এখানে কোথায়? ধমকে বললুম,—ওরে উজবুক, বুদ্ধি হবে কবে? আমাদের বাড়ীতে ঘোড়ার যে ছানা হয়েছে, সেই ছানার ঘাড়ে সার-সার ঝাউ গাছ গজিয়ে উঠেছে...বাড়ী তো কাছে মোটে দুদিনের পথ...দৌড়ে বাড়ী থেকে সেই ঘোড়ার ছানাটা নিয়ে আয়...ছানাটাকে ক্ষেতের আলে দাঁড় করালেই তার ঘাড়ের ঝাউবনের ছায়া পাবি, সে ছায়ায় আরামসে কাজ করতে পারবি।...এত চেঁচিয়ে এ কথা বললুম যে আঁতুড়ে শুয়ে বাবা আমার কথা শুনতে পেয়েছিল। শোনবামাত্র দোলনা থেকে উঠে বাবা সেই ঘোড়ার ছানার পিঠে চড়ে ক্ষেতে এসে হাজির। চাষীরা তখন ঝাউ-বনের ছায়া পেয়ে সেই ছায়ায় ক্ষেতে লাঙল দিতে লাগলো।...সে রোদে আমার ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। ওদের নিরাপদে লাঙল ঠেলতে দেখে একটা কলসী নিয়ে আমি ছুটলুম ক্ষেতের কোণে যে-কূয়ো ছিল, সেই কূয়ো থেকে জল তুলে জল খেতে! কূয়োর তলায় এসে দেখি, সেই কাঠফাটা রোদে কূয়োর জল জমে বরফ হয়ে আছে! কূয়ো-ভরতি জমাট বরফ! ঝুপ করে কূয়োর সে-বরফে ডিগবাজী খেয়ে ঝাঁপ দিলুম...ঝাঁপ দিয়ে বরফে মাথা ঠুকে ঠুকে জল বার করলুম। জল বেরুলে কলসী ভরে সেই জল তুলে নিয়ে খেলুম। তেষ্টা মিটলো। নিজের তেষ্টা মিটিয়ে কলসী ভরে জল নিয়ে ক্ষেতে এলুম চাষীদের খাওয়াবার জন্য।

কলসী ভরে জল আনলুম...তারা, দেখি, আমার পানে হতভম্বের মতো চেয়ে আছে! আমি বললুম—অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে সকলে কি দেখছিস? তারা বললে—জল তো আনলেন, কিন্তু আপনার মাথা কোথায় গেল? তাদের কথায় ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি, ঘাড়ে মাথা নেই! মাথার কথা মনে পড়লো! ঠিক...মাথা দিয়ে কূয়োর বরফ ভেঙ্গে মাথাটা তুলে আর ধড়ে বসাইনি কূয়োর মধ্যে ফেলে এসেছি! ছুটলুম তখনি কূয়ো থেকে মাথা আনতে। এসে দেখি, সর্বনাশ, কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে দিব্যি করে আমার মাথাটা ভেঙ্গে কড়মড় করে খাচ্ছে। পিছন থেকে পা টিপে-টিপে গিয়ে ক্যাঁক করে শেয়ালের পেটে এক লাথি ঝাড়লুম সজোরে...লাথি খেয়ে শেয়ালটা কোঁক্ করে উঠলো...অমনি তার পেট থেকে আমার গোটা মাথাটা ছিটকে বেরিয়ে কূয়োর বরফের উপর পড়লো। যেমন পড়া, মাথাটা কুড়িয়ে নিলুম। নিয়ে দেখি, মাথার নীচে কপালে কটা জলজলে অক্ষর লেখা! পড়লুম। কপালে লেখা ছিল,—বাপু হে, ও পরোটা তুমি খাবে... পরোটার একটি ক্ষুদে কণা মাকুন্দো পেতে পারে না!...

এইখানে কথা শেষ করে চাষার ছেলে পরোটা নিয়ে তাতে দিলে কামড়! মাকুন্দো হতভম্ব হয়ে ছেলের গল্প শুনছিল...এখন গল্প শেষ হলে ছেলেকে পরোটায় কামড় দিতে দেখে বলে উঠলো—খাও ভাই, তুমিই খাও। তোমার গল্প শুনে আমার পেটে খিল ধরে গেছে! বাপ! চালবাজির যে বহর দেখালে! ডাগর বয়সে তোমার মিথ্যা চালবাজির চোটে ছুনিয়ায় সত্য-কথার চিহ্নও থাকবে না! তোমায় সেলাম জানাচ্ছি···বাহাছুর চালিয়াৎ ছোকরা বটে! সারা ছুনিয়া খুঁজলে তোমার জোড়া মিলবে না! তোমার বাপ-মা তোমার কি নাম রেখেছে জানিনা, তোমার নাম হওয়া উচিত মিথ্যার জাহাজ!

বড় বড় কতকগুলো পাহাড়···পৃথিবীর বুকে যেন মস্ত পাঁচিল ! সেই সব পাহাড়-পাঁচিলের ওদিকে অনেক-দূরে এক রাজার রাজ্য। রাজার তিন ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটি রাজার চোখের মণি। মেয়েকে পলকের জন্য রাজা চোখের আড় করতে পারেন না ! বাইরের পাহাড়-বন, নদীনির্ঝর দেখলে মেয়ে পাছে বায়না ধরে, পৃথিবীর কোথায় কি আছে, দেখতে যাবে,—গেলে মেয়েকে রাজা দেখতে পাবেন না···এই ভয়ে রাজ্যের এক প্রকাণ্ড খোলা জায়গায় মেয়ের থাকবার জন্য রাজা শ্বেত পাথরের মস্ত পুরী তৈরী করিয়ে দেছেন। পুরীর চারিদিকে রকমারি ফল-ফুলের বাগান। এ সব ফল-ফুল কত দিগন্তর-পারের দেশ থেকে এনে রাজা বাগানে পুঁতিয়েছেন। বাগানের চারিদিকে লোহার আঁচিল, লোহার পাঁচিল। পুরী থেকে সে পাঁচিলের বাইরে পথ-ঘাট কোনো কিছু দেখা যায় না ! সেই পুরীতে থাকেন রাজকন্যা। কন্যার নাম দানিজা...আদর করে রাজা কন্যার এই নাম রেখেছেন। দানিজার মানে হলো শুক-তারা।

কন্যার সঙ্গে পুরীর মধ্যে থাকে কত শত সখী, দাসী। জোয়ান রক্ষীরা ঢাল-তলোয়ার-বর্শা হাতে পুরীর দরজায় পাহারা দিচ্ছে দিন-রাত। মেয়ের গা ভরে রাজা দেছেন মণিমুক্তার গহনা...আর পোষাক যা দেছেন, তার যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি রকমারি বাহার···রঙের আর ছাঁদের। কন্যা যা চান, চোখের পলক পড়ে না, রাজা তখনি তা এনে কন্যার হাতে দেন। রাজকন্যা এত জিনিষ পেয়েছেন যে পাবার আর কিছু বাকী নেই তাঁর !

সেদিন কন্যার জন্মদিন। রাজাকে মিনতি জানিয়ে কন্যা বললেন—লক্ষ্মী বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে কি-না তুমি দেছ···আজ একটি জিনিষ আমি চাইবো তোমার কাছে···বলো, দেবে ?

রাজা বললেন—তোমাকে অদেয় আমার কি আছে, মা ? বলো, কি তুমি চাও···নিশ্চয় দেবো।

তখন কন্যা বললেন—আজ সন্ধ্যার সময় তিন ভাইয়ের সঙ্গে আমি একটু বাইরে বেড়িয়ে আসতে চাই। বেশীক্ষণ নয় বাবা, শুধু এক ঘণ্টার জন্য !

রাজার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো! সর্ব্বনাশ···চোখের আড়ালে মেয়ে থাকবে এক ঘণ্টা! কিন্তু কি করেন! মেয়ে কখনো কিছু চায়নি···আজ জন্মদিনে মিনতি-ভরে প্রার্থনা, শুধু এক ঘণ্টার জন্য বেড়িয়ে আসা! মেয়ের এ-প্রার্থনায় রাজা না বলতে পারলেন না...নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,—বেশ মা···তোমার যখন ইচ্ছা, এসো বেড়িয়ে।

রাজার আদরের কন্যা···কখনো পুরীর বাইরে আসেননি···প্রজারা শুধু রাজকন্যার গল্পই শোনে···কখনো তাঁকে চক্ষে দেখেনি।···আজ সন্ধ্যার সময় কন্যা পথে বেরুবেন···তাঁকে দেখবার জন্য প্রজারা কাতারে-কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে রাজপুরীর দেউড়ির সামনে...পথে।

কন্যার বয়স আঠারো বছর। রূপে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে···দুটি চোখ সাগর-জলের মতো নীল···আর মাথার চুল যেন তামার সুতো দিয়ে গাঁথা ঝালর! কন্যা হাসলে সে-হাসিতে যেন ডালিম ফেটে পড়ে!

তিন রাজপুত্র ভাইয়ের সঙ্গে কন্যা বেরুলেন···হেঁটে...সামনে-পিছনে শান্ত্রী-পাহারা। প্রজাদের মধ্যে যারা দেখে কন্যাকে, তাদেরি আর চোখ ফেরে না! সবাই ভাবে, আহা, এই রূপসী কন্যার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়!

তিন ভাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রাজকন্যা এলেন সেখানকার চক-বাজারে। ছোট বড় দোকানের সার···দোকানে রকম-বেরকমের জিনিষ···এ-সব তিনি চক্ষে কখনো ছাখেননি। এ দোকানে যান, গিয়ে নক্সাদার রুমাল কেনেন···ও দোকানে যান, রঙীন গালচে কেনেন···সে দোকানে যান, খেলনা কেনেন, পুতুল কেনেন! ঘর সাজাবার টুকিটাকি কত কি কিনলেন···কিনে মোট যা জমলো, এত-বড়!

দেখতে দেখতে আর জিনিষ কিনতে কিনতে চারজনে এলেন বাজারের শেষ-দোকানে। যেমন দোকানে ঢুকবেন, অমনি কালো মেঘে আকাশ গেল ঢেকে—সোঁ-সোঁ করে বয়ে এলো কী ঝড়! সে ঝড়ের মুখে বিকট এক দৈত্য...তার চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে গন্‌গনে আগুনের ঝলক···নিশ্বাসে ঝরচে ঘন কালো ধোঁয়া!

দৈত্য এসে ঝুপ করে নামলো দোকানের সামনে···নেমেই···কারো চোখের পলক পড়তে না পড়তে রাজকন্যাকে ক্যাঁক করে ধরে বগলদাবায় পুরে হুশ করে গেল উড়ে অন্ধকারে মিশে। তার আর চিহ্ন দেখা গেল না! তিন রাজপুত্র খাপ থেকে তলোয়ার বার করলেন, কিন্তু কার জন্যই বা! কোথায় দৈত্য? কোথায় বা রাজকন্যা বোন?

দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিন রাজপুত্র রাজপুরীতে ফিরলেন—ফিরে রাজাকে জানালেন বিপদের কথা।

রাজা খেয়ালী নন, তাঁর বুদ্ধি আছে। তিনি বুঝলেন, দৈত্য-দানার সঙ্গে মানুষ পারবে কেন! তারা কত রকমের মায়া জানে, ভেলকি জানে।···দুঃখে রাজা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

রাজপুত্ররা বললেন—আমাদের হুকুম দিন বাবা, আমরা যাবো বোনের সন্ধানে। যেমন করে, যেখান থেকে পারি, বোনকে খুঁজে আমরা আনবোই।...

নিশ্বাস ফেলে রাজা বললেন—সে আশা দুরাশা হবে!

রাজপুত্ররা অনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়ে বললেন—না...আমরা বোনকে আনবো। আকাশ-পাতাল কোথাও খুঁজতে বাকী রাখবো না।

রাজা বললেন—বেশ, যাও। আমার ঘোড়াশাল থেকে খুব ভালো দেখে তিনটি ঘোড়া বেছে নিয়ে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনজনে বেরোও...কতদূরে যেতে হবে...কত দিনে ফিরবে, ঠিক নেই তো...এক বছরের মতো রশদপত্র সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ো।

তাই হলো। পরের দিন সকালে তিন রাজপুত্র বাছাই-করা তিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বোনের সন্ধানে বেরুলেন।

দিন নেই, রাত নেই...তিন রাজপুত্র চলেছেন ঘোড়া ছুটিয়ে...কত পাহাড়-পর্ব্বত...সাগর-নগর... কত তেপ্যান্তরের মাঠ পার হয়ে ঘোড়া এলো এক অজগর বিজন প্রান্তরে। ধূ-ধূ করছে খোলা মাঠ... আর সেই মাঠের মাঝখানে তিন রাজপুত্র দেখেন, গোলাপী রঙের হালকা-মেঘে ভর করে ঝুলছে শ্বেত-পাথরের তৈরী এক বিরাট পুরী...বোনের জন্য রাজ্যে রাজা যেমন পুরী বানিয়ে দেছেন... এ পুরী দেখতে অবিকল তার মতো!...তফাতের মধ্যে এ-পুরীর মাথার গম্বুজ শুধু সোনায় মোড়া।

তিন রাজপুত্র বুঝলেন, এই সে দৈত্যের পুরী, নিশ্চয়! কিন্তু মনে দুশ্চিন্তা...ও হলো দৈত্য...কত মন্ত্র জানে, তন্ত্র জানে, মায়া-কুহকের বিদ্যায় ওস্তাদ...তাঁরা তিনজনে মানুষ...দৈত্যের মায়া-কুহক ভেদ করে পুরীতে প্রবেশ...কি করে তা হয়?

ভাবতে ভাবতে তিন রাজপুত্র এলেন পুরীর যে সোনার ফটক...সেই ফটকের তলায়।

বড় রাজপুত্র বললেন—এক কাজ করি!

বড়র পানে চেয়ে মেজো-ছোট বললেন—কি কাজ?

বড় বললেন—একটা ঘোড়াকে মেরে ফেলি...মেরে তার চামড়া কুচি-কুচি করে কেটে সেই চামড়ায় লম্বা মই তৈরী করি। মই তৈরী করে ধনুকের তীরে বেঁধে সে-তীর ছুড়ে দি জোরসে ঐ পুরীর উঁচু থামে...থামে তীরটা গেঁথে বসবে...আর আমাদের মধ্যে একজন সেই মই বয়ে ফটকে ঢুকবে...কেমন?

মেজো-ছোট বললেন—বেশ।

তখন একটা ঘোড়া মেরে তার চামড়া কেটে মই তৈরী হলো। এখন কথা হলো, কে যাবে ও মই বয়ে?

ছোট রাজপুত্র বললেন—আমি যাই। আমি ছোট...আমার চেয়ে তোমাদের গায়ের আর বুদ্ধির জোর অনেক বেশী। যদি ছাখো, আমি নিখোঁজ...তখন বুদ্ধি করে তোমরা অন্য মতলব ঠাওরাতে পারবে।

বড়-মেজো দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলেন...ভাবলেন, ভালোই হলো! কে জানে, দৈত্য-পুরীতে ঢুকলে কত ফ্যাসাদ···যদি মন্তর পড়ে সাপ-ব্যাঙ কিম্বা ছুঁচো বানিয়ে ছায়!···তার চেয়ে ছোটই যাক···যখন বলছে···ফ্যাসাদ যদি ঘটে, ওর ওপর দিয়েই ঘটে যাবে!

তাঁরা বললেন,—তুমি যখন বলছো···বেশ, তাই হোক, তুমিই যাও।

তীরে বেঁধে মই ছোড়া হলো। তীরটা গিয়ে বিঁধলো তেশূন্যে-ঝোলা পুরীর ফটকের থামে···ছোট তখন মই বয়ে উঠতে লাগলো। ওঠার আর বিরাম নেই···কত হাজার ধাপ যে উঠলো! উঠতে উঠতে নীচেকার পৃথিবী কোথায় গেল মিলিয়ে উপরকার লাল নীল সাদা ধোঁয়াটে কালো মেঘের আড়ালে···ছোট রাজপুত্র শেষে পৌঁছুলেন পুরীর ফটকের সামনে। ফটক খোলা। উঁকি মেরে ছোট রাজপুত্র দেখেন, ফটকের ওদিকে বাগান। বোনের পুরীর ফটকের পর যেমন বাগান, ঠিক তেমনি। বেশীর মধ্যে, এ-বাগানের পথে কাঁকরের বদলে চুণী পান্না হীরে মুক্তো সোনার কুচি ছড়ানো।

সাহসে ভর করে ছোট ফটকে ঢুকলেন। এ পুরী যখন বোনের পুরীর নকলে তৈরী, তখন সিঁড়ি খুঁজে নিতে কষ্ট হলো না। সিঁড়ি দিয়ে ছোট রাজপুত্র তড়তড় করে উঠে এক ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘরের দরজা ভেজানো...কাক-পক্ষীর সাড়া নেই...নিঝুম নিস্তব্ধ পুরী।

ছোট ভাবলেন, এবারে এই দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে...

দরজায় হাত দিলেন···বুকখানা চকিতের জন্য কেঁপে উঠলো! কিন্তু না, কিসের ভয়?

দরজা ঠেলে ছোট রাজপুত্র ঢুকলেন ঘরের মধ্যে···ঢুকেই দেখেন, বোন বসে আছেন খোলা জানলার ধারে উদাস নেত্রে নীচে পৃথিবীর পানে চেয়ে···আর বোনের কোলে দৈত্যের প্রকাণ্ড মাথা। বোনের কোলে মাথা রেখে দৈত্য ঘুমোচ্ছে...দৈত্যের নাক যা ডাকছে...ছোট রাজপুত্রের মনে হলো, এর কাছে কোথায় লাগে কামানের শব্দ!

ছোটর ছায়া পড়লো জানলার ফটিক-কপাটে। বোন ফিরে তাকালেন···ভাই-বোনে চোখোচোখি —বোনের দুটি চোখ ভয়ে আকুল···সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে হিম! ইশারায় দৈত্যের দিকে দেখিয়ে বোন আঙুল নেড়ে সঙ্কেত জানালেন, পালাও ছোটদা!

পালাতে ছোট রাজপুত্রের বয়ে গেছে! পালাবেন বলে তো আসেন নি! পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে দৈত্যের মাথার লম্বা ঝুঁটি বাগিয়ে ধরে ছোট তার মাথায় মারলেন ধাঁইসে এক লাথি!

লাথি খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে দৈত্য হাঁ করে হাই যা তুললো···হাইয়ের সে বাতাস ঘরে যেন বিষ ছিটিয়ে দিলে!

ছোট রাজপুত্র সরে লুকিয়ে পড়লেন। তারপর দৈত্য তার সমুদ্দুরের-কাঁকড়ার-দাড়ার মতো আঙুল দিয়ে মাথার যে জায়গায় ছোট রাজপুত্র লাথি মেরেছেন, সে জায়গায় হাত বুলিয়ে হুঙ্কার ছাড়লো—কী লাগলো মাথায়?

কন্যা বললেন—কি আর লাগবে? মশা কামড়েছে, বোধ হয়!

—মশা! বলে' দৈত্য পাশ ফিরে আবার শুলো···শোবা মাত্র ঘুম—আর ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকা সুরু!

দৈত্য ঘুমিয়েছে দেখে ছোট রাজপুত্র পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এলেন···এসে দৈত্যের ঝুঁটি ধরে তার মাথায় জোরসে আবার এক লাথি! লাথি খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে হাই তুলে দৈত্য বললে,—আবার মশা! কিছু করতে পারোনা···মশাগুলো যাতে আমাকে না জালাতন করে?

কথাটা বলে আবার সে পাশ ফিরে চোখ বুজলো—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

ছোট রাজপুত্র আবার মারতে যাবেন, বোন তখন দৈত্যের ইস্পাতের আঁশ-ভরা গায়ের একটু ফাঁক দেখিয়ে ইশারায় জানালেন, এই জায়গায় মারো।

ছোট রাজপুত্র ইশারা বুঝলেন। বুঝে সেই ইস্পাত-আঁশের ফাঁকে এ্যায়সা জোরে মারলেন খোঁচা যে দৈত্যকে আর চোখ খুলতে হলো না! বিকট চীৎকার করে সে গড়িয়ে পড়লো ঘরের পাথরের মেঝেয়...নাক-মুখ দিয়ে ঝলকে-ঝলকে রক্ত উঠলো! তারপর সব নিথর।

কন্যা প্রথমে ভয়ে হকচকিয়ে গেলেন···ছোট রাজপুত্র তাঁকে ধরে নাড়া দিতে কন্যার সম্বিৎ ফিরলো। কন্যা ভাবলেন, এতদিনে তাঁর মুক্তি মিলেছে! তখন তিনি আনন্দে মেতে উঠলেন। ছোট রাজপুত্রের গলা জড়িয়ে কন্যা বললেন—এখনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো ছোটদা··· এ পুরীর চারিদিকে আতঙ্কের ছায়া!···

ছোট রাজপুত্র বললেন,—নিয়ে যাবো বলেই তো এসেছি।

কন্যার আঁচলে ছিল এক-গোছা সোনার চাবি। তারি একটা চাবি দিয়ে কন্যা খুললেন ঘরের ওদিকে হাতীর দাঁতের তৈরী যে-দরজা, সেই দরজা। দরজার ওদিকে ছোট দালান। ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে কন্যা সেই দালানে এলেন। দালানের গায়ে তিনটে ঘর। প্রথম ঘরে আছে তেজী কালো একটা ঘোড়া...ঘোড়ার রূপোর লাগাম। দু-নম্বর ঘরে আছে একটা সাদা ঘোড়া···সোনার লাগাম লাগানো। তিন-নম্বর ঘরে আরবী ঘোড়া—তার গায়ে পান্নার লাগাম লাগানো।···

কন্যা ঘোড়া দেখালেন। ছোট রাজপুত্র বললেন—ভারী চমৎকার ঘোড়া তো!···আমার ইচ্ছা করছে, ঘোড়াগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে দি···

এ কথা বলে' তিনি এগুচ্ছিলেন ঘোড়ার দিকে···বোন বললেন,—উঁহু···ছুঁয়োনা ছোটদা। ···দৈত্য আমাকে মানা করেছিল। বলেছিল, খবর্দ্দার, এ ঘোড়াদের গায়ে হাত দিয়ো না। ঐ তিনটে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দৈত্য যেতো পৃথিবীতে···শিকারের সন্ধানে।

বটে! ছোট রাজপুত্র বললেন,—ভাগ্যিস্ হাত দিইনি!

ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে কন্যা এলেন দালানের শেষে···এখানে মোটা একখানা লাল পর্দ্দা টাঙানো ...কন্যা বললেন,—পর্দ্দার ওদিকে কি আছে, দেখবে?

কন্যা পর্দ্দা সরালেন। পর্দ্দা সরাতে ছোট রাজপুত্র দেখেন, পাশাপাশি তিনটে খুপরী-ঘর। প্রথম ঘরে রূপোর চৌকিতে শেকল দিয়ে বাঁধা পরমাসুন্দরী এক কন্যা···বসে চরকায় রূপোলি সুতো কাটছে! দু-নম্বর ঘরে শেকলে-বাঁধা পরমাসুন্দরী এক কন্যা তামার আসনে বসে চরকায় তামার সুতো কাটছে...আর তিন-নম্বর ঘরে শেকলে-বাঁধা পরমাসুন্দরী কন্যা সোনার চৌকিতে বসে চরকায়

সোনালি সুতো কাটছে। এ কন্যার গলায় মুক্তোর মালা...মাথায় বসে আছে সোনার একটি ছোট পাখী...ঠোঁটে করে সে-ও সুতো কাটছে।

কন্যা বললেন,—দৈত্য এদেরো বন্দী করে এনেছিল আমার মতো! এরা দৈত্যের কথা শোনেনি বলে, রাগে এদের শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে···এদের করেছিল আমার দাসী। তিনজনে দিন-রাত সুতো কাটছে...এ সুতো কাটার কামাই নেই! দৈত্য বলেছিল সুতো কাটা শেষ হলে সেই সুতো দিয়ে তৈরী করবে পোষাক—সেই পোষাক পরিয়ে দৈত্য আমাকে বিয়ে করবে।

কথা শুনে রাগে ছোট রাজপুত্রের মাথা থেকে গা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো! তিনজনের সুতোগুলো ছিঁড়ে ফর্দ্দাফাঁই করে দৈত্যের দেহখানা হিঁচড়ে টেনে এনে ছোট রাজপুত্র সেটা ফেলে দিলেন· পুরীর খোলা ফটক দিয়ে নীচের পৃথিবীতে...যেখানে বড় আর মেজো রাজপুত্র তুজনে চুপচাপ বসে আছেন, দৈত্যের মূর্ত্তি পড়লো তাঁদের সামনে। মূর্ত্তি দেখে তুই ভাই ভয়ে চমকে উঠলেন!

তারপর পুরীর সব দেখে-শুনে বোনকে আর বোনের সেই তিন দাসীকে নিয়ে ছোট রাজপুত্র এলেন পুরীর ফটকে। ফটকে এসে চামড়ার মই দিয়ে প্রথমে বোনকে তারপর রূপোলি কন্যাকে তারপর তামার কন্যাকে আর সবশেষে সোনালি কন্যাকে দিলেন নামিয়ে বড়-মেজো ভাইয়ের কাছে ...দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, তাঁর কীর্ত্তির কথা।

দেখে-শুনে বড়-মেজোর হিংসা হলো। হুঁ! ছোট এমন কীর্ত্তি করেছে···বাপ-রাজা শুনলে ছোটকে হয়তো সর্ব্বস্ব দিয়ে দেবেন···তাঁরা থাকবেন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে! তাই তাঁরা করলেন কি, মাথায় সোনার-পাখী সোনালি কন্যা যেমন পৃথিবীর মাটীতে পা দিয়েছেন···ছোট রাজপুত্র উপর থেকে নামবার উদ্যোগ করছেন,···অমনি বড়-মেজো তুজনে মিলে চামড়ার মইখানা দিলেন কুচ করে কেটে ···দিয়ে কন্যাদের আর বোনকে ঘোড়ায় তুলে রাজ্যের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

বাপের রাজ্যে বড়-মেজো রাজপুত্র ফিরচেন বোনকে আর বোনের সেই তিন সহচরী দাসীকে নিয়ে···পথে কম-বয়সী এক চাষার ছেলে মাঠে গরু চরাচ্ছিল···চাষার ছেলের বয়স আর ছোট রাজপুত্রের বয়স প্রায় সমান! বড়-মেজো করলেন কি, সেই চাষার ছেলেকে ধরলো, তাকে সাজতে হবে ছোট রাজপুত্র। তাকে ছোট রাজপুত্র সাজিয়ে ওঁরা নিয়ে যাবেন রাজপুরীতে...চাষার ছেলে যদি রাজী হয়, তাহলে তাকে অনেক টাকা দেবেন আর দেবেন এই সোনালি-কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে।

বোন এ কথা শুনে তু-ভাইকে ভয়ানক বকলেন। বললেন,—তোমরা শুধু নিষ্ঠুর নও...তোমরা অতি ইতর অভদ্র পশুর সমান। বাবাকে আমি বলে দেবো।

বকুনি খেয়ে বোনকে বড়-মেজো দেখালো ভয়,—এ নিয়ে একটি কথা কয়েচিস কি তোকে কেটে কুচি-কুচি করে ফেলবো।···শুধু তোকে নয়...তোর এই তিন দাসীকে শুদ্ধ।

বোন কি করেন···ভয়ে চুপ করে গেলেন।···

বড়-মেজো পুরীতে এলেন···রাজা দেখলেন তিন ছেলে···তাঁদের সঙ্গে তাঁর আদরের কন্যা। কন্যাকে বুকে নিতে গেলেন···কন্যার মুখ মলিন। মুখে না আছে হাসি, না, সে কথা কয়!

রাজা আকুল হলেন···কন্যা এমন মলিন কেন? এত দিনের পর পুরীতে ফিরলেন...কত খুশী হবার কথা! তা নয়...

তিনি বললেন—কথা ক'মা···হেসে আমার পানে চোখ তুলে চা···

কন্যা তবু চুপ! রাজা কত সাধলেন, কত করে বললেন...কাকুতি জানালেন! তবু কন্যার মুখে না হাসি, না কোনো কথা···কন্যা যেন পাথরের পুতুল!

বড়-মেজোকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—ও কথা কইছে না কেন রে?

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বড়-মেজো দিলেন জবাব,—কি জানি কেন···দৈত্যের পুরী ছেড়ে এসে ওর মন কেমন করছে, বোধ হয়!

তারপর বড়-মেজো মহাব্যস্ত হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বললেন রাজাকে···বড় বিয়ে করবেন রূপোলি কন্যাকে, মেজো করবেন তামার কন্যাকে, আর ছোট-সাজা চাষার ছেলে বিয়ে করবে সোনালি কন্যাকে!

সারা পুরী সাজানো হচ্ছে···রাজ্য জুড়ে আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন চলছে।

সোনালি কন্যা যখন শুনলেন, ছোট-সাজা চাষার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে, তখন সে সোনার

পাখীকে ডেকে বললে—পাখী, এখনি উড়ে যা তেপান্তের সেই জিন-পুরীতে···সেখানে আছেন ছোট রাজপুত্র···গিয়ে তাঁকে বলবি আমার বিপদের কথা। তিনি যখন দৈত্যের হাত থেকে আমায় উদ্ধার করেচেন, তখন এ বিপদেও উদ্ধার করবেন নিশ্চয়।···তুই তো জানিস সেখানকার সেই ঘোড়াদের মায়া-মন্ত্র···গিয়ে ছোট রাজপুত্রকে বলবি···তাহলেই ছোট রাজপুত্র এখানে এসে বিহিত করবেন।

বড়র বিয়ের দিন লোক-লস্কর বরযাত্রী নিয়ে বাজনা-বাদ্য করে বড় বেরুলেন পুরী থেকে বিয়ে করতে···এমন সময় কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো অপূর্ব্ববেশী এক সওয়ার—কালো মেঘের পর্দ্দা ঠেলে সে আকাশ থেকে নেমে এলো। ঘোড়া ছুটিয়ে বড়র পাশে এসে বড়র গালে জোরে চড় মেরে মেঘে মিলিয়ে গেল···চড় খেয়ে বড় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন—পড়বামাত্র অজ্ঞান, অচেতন!

পরের দিন মেজোর বিয়ে। বড় শুয়ে আছেন বিছানায় বেহুঁশ অজ্ঞান···মেজো রাজপুত্র ধূমধাম করে পুরী থেকে বেরিয়েছেন, হঠাৎ সাদা মেঘ ছিঁড়ে এলো সাদা ঘোড়ায় চড়ে অপূর্ব্ববেশী সওয়ার.. এসে মেজোর গালে চড় মেরে সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে মেঘে মিলিয়ে গেল। মেজো চড় খেয়ে বড়র মতো পড়লো ঘুরে, বেহুঁশ অজ্ঞান।

তার পরের দিন ছোট-সাজা চাষার ছেলে বেরুবে বিয়ে করতে, সোনালি কন্যা বসে আছেন কনে-বৌ সেজে সাত-মহল বাড়ীর সাত-তলার ঘরে, এমন সময় সোনার পাখী উড়ে এসে বসলো সোনালি কন্যার হাতে···বললে,—ভয় নেই কন্যা, সব ঠিক।

ওদিকে আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে আকাশ থেকে মেমে এলেন ছোট রাজপুত্র...এসে চাষার ছেলের গলা টিপে ধরে ছুড়ে তাকে দিলেন সাত-মহল পুরীর সাত-তলায়...চাষার ছেলে ধুপ করে পড়লো এসে সোনালি কন্যার পায়ের কাছে···তার দেহে প্রাণ নেই!

তারপর ছোট রাজপুত্র গায়ের ঢাকা খুলে রাজার কাছে এসে দাঁড়ালেন! দেখে রাজা অবাক। বললেন—ব্যাপার কি? ও তবে···

ছোট বললেন—জাল! ও চাষার ছেলে। দাদারা ওকে ছোট সাজিয়ে এনেছিল তোমার চোখে ধুলো দেবে বলে!

ছোট সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন। শুনে রাজা রেগে আগুন! রাজা বললেন—এত বড় বদমায়েস ওরা! ওদের আমি ত্যাজ্যপুত্র করলুম।···অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে···অমনি অজ্ঞান অবস্থাতেই ওদের দুজনকে বনে রেখে এসো, মন্ত্রী। ওরা যেমন পশু, বনেই ওদের থাকা উচিত···লোকালয়ে ও-রকম হিংস্রুকে মানুষ বাস করলে লোকালয়ে অশান্তির সীমা থাকবে না!

ছোটকে দেখে বোন-রাজকন্যা ছুটে এলেন···তাঁর মুখে কথা আর ফুরোয় না! চোখে-মুখে হাসিরও বাণ ডাকলো যেন!

সোনালি কন্যার সঙ্গে রাজা দিলেন ছোটর বিয়ে—রাজ্যে মহা ধুমধাম চললো।

রূপসী কন্যা

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা···পৃথিবীর দক্ষিণ-সীমানার এক রাজা। রাজার নাম আফরণ। রাজার তিন ছেলে। বড়র নাম দিমিত্রি···মেজো বেশিল···আর ছোটর নাম আইভান। রাজা বুড়ো হয়েছেন···ষাট বছর বয়স। ছেলেরা খেলাধূলা করে···কুস্তি করে···ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যায়। রাজার সাধ হয়...ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন···শিকারে যান। কিন্তু বুড়ো হয়েছেন···ছুটতে গেলে পা. টন্‌টন্‌ করে···নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে!···রাজা কত বদ্যি দেখালেন, সাধু-সন্ন্যাসীকে ধরলেন—আমার দেহে যাতে জোর হয়···এমন ব্যবস্থা করো। বদ্যিরা দিলে কত রকমের ওষুধ···সাধু সন্ন্যাসীরা করলে কত যাগ-যজ্ঞ···কিছুতেই আর রাজার বুড়ো হাড় শক্ত হয় না, মজবুত হয় না! দেশে-বিদেশে যেখানে যত যাদুকর ছিল, রাজা ডাকালেন...যাদুমন্ত্রে তারা যদি রাজার দেহকে জোয়ান মজবুত করে তুলতে পারে রাজপুত্রদের মতো। কিন্তু তাদের সব মন্ত্র, সব তুক-তাক মিথ্যা হলো।

রাজার মনে সুখ নেই···গা ছমছম করছে সর্ব্বক্ষণ···মরণ বুঝি এলো।

একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে রাজা স্বপ্ন দেখলেন...যেন কোথায় সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে এক রাজ্য...রাজ্যের নাম তিন-নয়ে-সাতাশ···সে-রাজ্যের রাজার নাম তিন-দশে তিরিশ...সেই তিন-দশে তিরিশ রাজার রাজ্যে বাস করে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। তার নাম রূপসী। কন্যার তিন-তিনজন মা...ছ-ছজন দিদিমা আর তিন-তিরিক্খে ন-জন ভাই। সেই রূপসী কন্যার বালিসের তলায় আছে একটি ঘট··সেই ঘটে আছে জীবন-জল! সে-জল এক চোঁকে খেলে সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ বচ্ছর বয়স কমে যায়···দু' ঢোক খেলে ত্রিশ দ্বিগুণে ষাট বছর বয়স্ কমে!

সকালে ঘুম ভাঙ্গলে মুখ-হাত ধুয়ে রাজা এসে সভায় বসলেন···পাত্র মিত্র মন্ত্রী অমাত্যদের ডাকালেন, তিন রাজপুত্রকে ডাকালেন। সকলে সভায় এলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন সকলকে—তিন-নয়ে-সাতাশ রাজ্যে যে রূপসী রাজকন্যা বাস করেন, তাঁর কথা তোমরা কেউ শুনেছো?

সভাসদরা সকলেই নিজেদের বড় বড় পণ্ডিত মনে করেন…সকলে মাথা চুলকে মাথায় ঠাশা জ্ঞান হাতড়াতে লাগলেন… কিন্তু পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট মাথা চুলকেও রূপসী রাজকন্যার পাত্তা পেলেন না!

অথচ সে কথা স্বীকার করবেন না! রাজা ভাববেন, ছাই পণ্ডিত সব! তাই গল্প বানিয়ে তাঁরা বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ…এ কন্যার কথা শাস্ত্রে-পুরাণে পড়েছি বৈ কি…তা তিনি থাকেন সব-উত্তরে যে বরফ-জমাটী দেশ, সেই দেশে। সে দেশের পথ কেউ জানে না, মহারাজ…

রাজা বললেন—হুঁ…তাহলে উপায়?

তিন রাজপুত্র বললেন—আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে আমরা পথের সন্ধান করে যাবো, বাবা…সে কন্যার সন্ধান এনে দেবো। আমরা তিন ভাই পৃথিবীর চার দিকে কোনো দিক বাকী রাখবো না সন্ধান করতে। সন্ধান না নিয়ে আমরা ফিরবো না।

রাজা আশীর্ব্বাদ করে তিন রাজপুত্রকে বিদায় দিলেন…রাজার এক চোখে জল…তিন পুত্রের বিচ্ছেদ মনে করে…আর এক চোখ আনন্দে উজ্জ্বল…ছেলেরা তাঁকে এমন ভালোবাসে!

তিন রাজপুত্র বেরুলেন তিনটে তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

রাজ্য পার হয়ে দুদিকে দুটো পথ…একটা ডান দিকে, আর একটা বাঁয়ে। বড়-মেজো চললেন ডান দিককার পথে…ছোট আইভিন ঢুকলেন বাঁয়ের পথে।

বড়-মেজো চলেছেন ডান-দিককার পথ ধরে…প্রায় একশো ক্রোশ গিয়ে দেখেন, দুধারে ক্ষেত আর বাগান। ক্ষেতে ফশল ফলেছে এত যে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! আর বাগানে রকমারি ফলন্ত গাছ! বাগানের সামনে বড়-মেজো দেখেন, এক বুড়ো…থুত্থুড়ে বুড়ো…তার পিঠখানা ধনুকের মতো বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে আর সাদা-পাকা দাড়ি পথে লুটোচ্ছে!…

বড়-মেজোকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে—কি গো…কোথায় চলেছো গো দুজনে এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে?

বড়-মেজো তিরিক্ষি মেজাজে জবাব দিলে—তোর তাতে দরকার বাহাত্তুরে বুড়ে ব্যাটা?

জবাব শুনে বুড়ো মুখ ফেরালো অন্য দিকে। বড়-মেজো ঘোড়া ছুটিয়ে তীরের বেগে চলে গেলেন। খানিক যাবার পর পথের চেহারা গেল বদলে…ধূ-ধূ প্রান্তর…কোনো ধারে না আছে ফশলে ভরা ক্ষেত, না বাগান…পাথরের চাঁই জড়ো হয়ে পথ একেবারে দুর্গম!…আর পথের দুধারে খাঁ-খাঁ করচে বালি!…এ পথে দুজনে চললেন সাত দিন সাত রাত…জনপ্রাণীর দেখা মিললো না…একটা কাক-চিলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই!

আট দিনের দিন ঘোড়ার দানাপানি গেল ফুরিয়ে…নিজেদের খাবারও হলো নিঃশেষ। জলের থলি খালি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ! যেদিকে যতদূরে দুজনে চান…জলের রেখা নেই! কি করবেন ভাবচেন, এমন সময় দুজনে দেখেন…এক বুড়ো আসছে…বুড়োর পায়ে জোর নেই…একবার বসছে, আবার চলছে…আবার বসছে…আবার চলছে…

বুড়ো কাছে এলো···বড়-মেজোর দিকে চেয়ে বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে—এ পাণ্ডব-বর্জ্জিত পথে কোথায় চলেছো দুজনে?

খিদে-তেষ্টায় দুজনের মেজাজ হয়েছে নরম...বুড়োর কথায় দুজনে দিলে জবাব—বলো কেন দাদু...আমরা বেরিয়েছি তিন-নয়ে-সাতাশ রাজ্যের রূপসী রাজকন্যার সন্ধানে···সেখানে আছে তাঁর বালিশের তলায় ঘটে-ভরা জীবন জল···সেই জল আনতে।

বুড়ো বললে—তাই যদি তো এ পথ থেকে দুজনে ফেরো। সে জলের সন্ধান···মানুষের সাধ্য নেই, পাবে! সে রাজ্যে যেতে হলে তিনটি প্রকাণ্ড চওড়া নদী পার হতে হবে... নদীতে পার-ঘাটা আছে। প্রথম পার-ঘাটায় গেলে সে ঘাটের পারাণী দুজনের ডান হাত দুখানি নেবে কেটে...দু-নম্বর পার-ঘাটায় গেলে পারাণী নেবে বাঁ-হাত দুটি কেটে···আর তিন-নম্বর পার-ঘাটায় গেলে মুণ্ডু দুটি ধড় থেকে পারাণী কেটে নেবে!···নাও, কেমন করে সন্ধান নেবে!

এ-কথা শুনে বড় মেজো মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে···তারপর দুজনে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বুড়োকে ধরলো জড়িয়ে···জড়িয়ে ধরে বললে—উঃ দাদু···খুব বাঁচিয়ে দেছ তুমি···ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হলো! প্রাণ নিয়ে এখন রাজ্যে ফেরা যাক! রাজা হলেই দেখি মানুষের চাঁদ-চাওয়া আব্দার! বাবার ভীমরতি হয়েছে···বুড়ো হয়েছেন তো!···

এ কথা বলে দুজনে রাজ্যের দিকে ঘোড়া ফেরালেন। রাজ্যের কাছাকাছি এক গ্রাম··· সেই গ্রামের পথে আসতে আসতে দুই রাজপুত্র দেখেন—বড় বড় আঙুরের ক্ষেত···ক্ষেতে ঝাঁকে ঝাঁকে আঙুর ফলেছে আর রূপসী কন্যারা টুকরি হাতে সব আঙুর তুলছে। দেখে দুই ভাইয়ের এত ভালো লাগলো যে রাজ্যে আর ফিরলেন না···আঙুর-ক্ষেতের কাছে সোনালি তাঁবু ফেললেন··· ঘোড়া দুটোকে দিলেন ছেড়ে ক্ষেতে চরে ঘাস খেতে। দুই ভাই ঠিক করলেন, তাঁবুতে আমোদ-আহ্লাদ করে সময় কাটাবেন যতদিন না ছোট ফিরে আসেন।

•

ছোট রাজপুত্র আইভান ওদিকে বাঁয়ের পথ ধরে চলতে চলতে এলেন এক গভীর বনে। সেখানে দেখা সেই থুথুড়ে বুড়োর সঙ্গে যার পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে নুয়ে গেছে···আর লম্বা সাদা দাড়ি পথে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

ছোটকে দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে—কিগো, কোথায় চলেছো এমন তড়বড় করে ঘোড়া ছুটিয়ে?

ছোট রাজপুত্র তেমনি তিরিক্ষি মেজাজে জবাব দিলেন—সে খবরে তোর দরকার কি রে থুথুড়ে বুড়ো?···

এ-জবাবে বুড়ো মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। একটু পরে ছোটর কিন্তু মনে হলো, ছি ছি, এমন অভদ্রের মতো বুড়োর কথার জবাব দেওয়া অন্যায় হয়েছে! বুড়ো কত জানে···কত পরামর্শ দিতে পারে! তখনি ঘোড়া ছুটিয়ে ছোট ছুটলেন বুড়োর পিছনে...কাছে পৌছে ঘোড়া থেকে নেমে মাথা নীচু করে ছোট বললেন—আমার অন্যায় হয়েছে দাদু···আমাকে ক্ষমা করো···আমি কেমন অন্যমনস্ক ছিলুম···তোমার কথা শুনিনি!

বুড়ো খুশী হলো। হেসে বুড়ো বললে—আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম, এমন তড়বড় করে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় তুমি চলেছো ?

ছোট বললেন—কোথায় যাচ্ছি, আমি নিজেই জানিনা, তা তোমাকে কি বলবো ? আমি শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে সব-উত্তরে সেই তিন নয়ে-সাতাশ রাজ্যে...সেখানে আছেন রূপসী রাজকন্যা···সে কন্যার তিন-তিনজন মা···ছ-জন দিদিমা আর ন' ভাই। রাজকন্যার বালিশের তলায় আছে ঘ:ট ভরা জীবন-জল। আমি সেই জলের সন্ধানে যাচ্ছি...সে-জলে আমার বাবা আবার তাঁর জোয়ান বয়স ফিরে পাবেন।

বুড়ো হাসলো, হেসে বললে—নিজের অন্যায় বুঝে আমার কাছে এসে তুমি ভালোই করেচো বাপু···নাহলে ও রাজ্যের পথ তুমি সাতশো বছর ধরে ঘুরলেও খুঁজে পাবে না! সেখানে যাবার যে পথ, সে-পথে এ-সব ঘোড়া চলতে পারবে না। ভয়ানক বিশ্রী পথ—প্রতিপদে বাধা। সেখানে যদি যেতে চাও, তাহলে আগে এক কাজ করো। ফিরে যাও তোমার বাবার রাজ-পুরীতে...গিয়ে তোমার বাবার ঘোড়াশালে যত ঘোড়া আছে, সহিসদের বলো, সব ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে একেবারে সুমুদ্দুরের ধারে···সুমুদ্দুরের ধারে গিয়ে কোনো ঘোড়া যদি সুমুদ্দুরের লোনা জলে নিজে থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে···পড়ে সেই লোনা জল খায়,···খেয়ে জলে গা ডুবিয়ে থাকতে পারে...যতক্ষণ পর্যন্ত না সুমুদ্দুরে জোয়ার আসে, তাহলে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ো... বুঝলে! তবেই সে-রাজ্যে যেতে পারবে।

বুড়োর কথা শুনে ছোট রাজপুত্র মহাখুশী। বুড়োকে অনেক সেলাম জানিয়ে ছোট রাজপুত্র পুরীতে ফিরলেন...ফিরে আর কোথাও নয়, সোজা ঢুকলেন ঘোড়াশালে···সহিসদের দিলেন হুকুম, সব ঘোড়াগুলোকে এখনি ছুটিয়ে সুমুদ্দুরের ধারে নিয়ে চলো।

হুকুম শুনে সহিসরা চমকে উঠলো! ভাবলো, ঘুরে ঘুরে ছোটর মাথা খারাপ হলো না কি ? কিন্তু ঘোড়া ছোটাবার হুকুম! মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না···একে ছোট মনিব, তার রাজার ছেলে...হুকুম না মানলে এখনি হয়তো গর্দানা যাবে!

তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চললো সুমুদ্দুরের ধারে। ছোট চললেন সঙ্গে। সেখানে গিয়ে ছোট বসলেন এক পাহাড়ে···পাহাড়ে বসে দেখতে লাগলেন কোনো ঘোড়া নিজে থেকে সুমুদ্দুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কি না!···

সব ঘোড়া মাথা বেঁকিয়ে চিহিঁহিঁ করে ফিরলো। একটা বাদামী রঙের ঘোড়া শুধু সোজা গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সুমুদ্দুরের জলে! পড়ে পেট ভরে লোনা জল খেতে লাগলো···খেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না জোয়ার এলো, জলে গা ডুবিয়ে পড়ে রইলো। জোয়ার এলে তবে সে ওঠে।

সহিসরা ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে এলো রাজার ঘোড়াশালে···ছোট রাজপুত্র দেরী করলেন না ···তখনি সেই বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে লাগাম ধরে তার পিঠে উঠে বসবেন, হঠাৎ শুনলেন, ঘোড়া কথা কইছে মানুষের মতো! কথা কয়ে ঘোড়া বললে—দাঁড়াও রাজপুত্র আইভান, খপ করে আমার পিঠে চড়ে সওয়ার হয়ো না। সওয়ার হবার আগে আমার পিছনে দাঁড়াও...আমি]

তোমায় তিনটি চাট্ মারবো। সে চাটে তোমার দেহ হবে লোহার ডাণ্ডার মতো শক্ত আর মজবুত।···

ছোট রাজপুত্র দাঁড়ালেন ঘোড়ায় পিছনে···ঘোড়া তাঁকে মারলো এক চাট, দু চাট। দু পাট মেরে ঘোড়া বললে—না, তিন চাট আর মারবোনা, তাহলে তোমার দেহ এমন হবে যে তুমি চললে ফিরলে ভূমিকম্পের দোলায় পৃথিবী দুলতে থাকবে! এখন যাও, তোমার বাবার অস্ত্রশালায়··· সেখান থেকে নেবে সোনার বর্ম, সোনার পাগড়ী...আর নেবে দামাস্কসী তলোয়ার।···নিয়ে আমার পিঠে এসে বসবে, তারপর আমরা বেরুবো।

তাই হলো। বাদামী ঘোড়ার পিঠে ওড়ে ছোট রাজপুত্র বেরুলেন·· ঘোড়া ছুটেছে···ছুটেছে··· ছুটেছে···কত দিক-দিগন্তর···ঘাট, বাট, মাঠ, রাজ্য, জলা, জঙ্গল পার হয়ে ছুটেছে···ঘোড়ার ছোটার বিরাম নেই এক-পল!

তিনমাস এমনি ছোটার পর আর পথ নেই। সামনে পাশে যেদিকে তাকান, জলা আর জলা। কোনোখানে গভীর জল···কোনোখানে পাঁক ভট্‌ভট করছে। ছোটকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া নামলো জলায়···জল ঠেলে চললো। ঘোড়ার পায়ে জোঁক বসছে, ডাঁশ বসছে···ঘোড়াকে কামড়াচ্ছে ···রাজপুত্রকে কামড়াচ্ছে···সেদিকে কারো দৃক্‌পাত নেই···দুজনে চলেছে···চলেছে···চলেছে···

না কোনো বসতির চিহ্ন...না কোনো প্রাণীর নাম-গন্ধ! যেতে যেতে যেতে যেতে অনেক দূরে দেখা গেল···দিগন্ত-প্রসারী নদী···এমন চওড়া যে পার দেখা যায় না! নদীর বুকে কালো কালির মতো মিষ-কালো জল...আর নদীর ধারে ছোট একখানা কুঁড়ে...ভাঙ্গা ঝড়ঝড় করছে···বড় সারস-পাখীর কটা ঠ্যাঙের উপর কুঁড়েখানা খাড়া আছে!

ছোট রাজপুত্রকে পিঠে করে বাদামী ঘোড়া এলো সেই কুঁড়ের সামনে। সেখানে এসে ছোট রাজপুত্র দেখেন, রূপকথায় যে হাড়-ঝন্‌ঝনি ডাইনী বুড়ীদের গল্প শুনেছেন, কুঁড়ে-ঘরের রোয়াকে তেমনি এক ডাইনী বুড়ী বসে! বুড়ী বসে চুল শুকোচ্ছে! বুড়ীর দেহে খালি কতকগুলো হাড়···এতটুকু মাষ নেই!

ঘোড়া বললে—এরা কত তুক-তাক জানে, মন্তর-তন্তর জানে···ওদের হাড়ে ভেলকি খেলে! যে-কথা জিজ্ঞাসা করবে···আকাশ-পাতাল-পৃথিবীর যে-খবর চাও···ঐ হাড় ঠুকে এরা তার ঠিক-ঠাক জবাব দেবে।···তবে মেজাজ ভালো থাকা চাই! মেজাজ যদি খারাপ থাকে, তাহলে রক্ষা নেই... দেখবামাত্র আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে! এ-বুড়ীকে দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ ভালো আছে... দেখবে এগিয়ে?

ছোট রাজপুত্র ভয়-ডর জানেন না···ঘোড়া থেকে নেমে সোজা বুড়ীর সামনে এলেন... এসে বললেন—কেমন আছো ঠানদি?···আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে...কিছু খেতে দিতে পারো?

বুড়ীর মেজাজ ছিল ভালো···বুড়ী বললে—কে গো? নাতি আইভান রাজপুত্তুর! এসো, এসো···কিন্তু এত দেশ থাকতে হঠাৎ এই তেপান্তরের শেষে?

ছোট রাজপুত্র কেন এসেছেন, বুড়ীর তা অজানা নয়...

ছোট রাজপুত্র বললেন—আমাকে অনেক দূর যেতে হবে ঠানদি···কোথায় সব-উত্তুরে সব মুলুক ছাড়িয়ে আছে তিন-নয়ে-সাতাশ রাজ্য···সেখানে রাজত্ব করে তিন-দশে-তিরিশ রাজা...সেই রাজার পুরীতে আছেন রূপসী রাজকন্যা...তাঁর কাছে আছে ঘটে-ভরা জীবন-জল···আমি যাচ্ছি সেই জীবন-জলের সন্ধানে।

দু চোখে আতঙ্ক···মাথা নেড়ে ফোগলা-মুখে বুড়ী বললে—ও বাবা···সে ঘট···সে জীবন-জল? চক্ষে কখনো দেখিনি দাদা, তবে পাঁচজনের মুখে শুনেছি বটে, গল্প শুনেছি। সে রাজ্যে যেতে হলে তিন-তিনটে নদী পার হতে হয়···নদীগুলো খুব চওড়া···ঘাট আছে···পার-ঘাটা। পার-ঘাটা
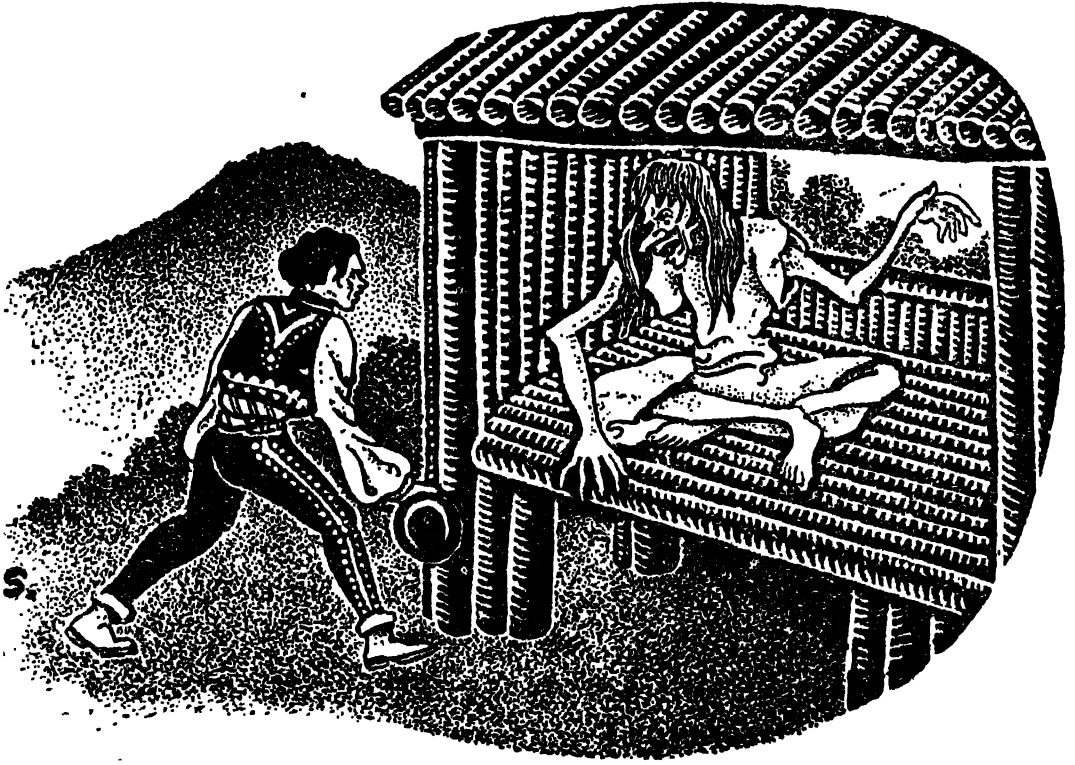
শুনেছি আরো ভয়ানক! প্রথম পার-ঘাটায় যেমন কেউ যায়···অমনি সেখানকার মাঝি-মাল্লারা তার ডান হাতখানি কেটে নেয়···তার পরের ঘাটের মাঝিরা বাঁ হাত কেটে নেয়···আর সব-শেষের যে নদী ···সে নদীর পার-ঘাটার মাঝিরা মুণ্ডু নেয় কেটে। এ-কথা যদি সত্য হয়, কি করে যাবে, দাদা?

রাজপুত্র আইভান বললেন—কিন্তু চিরকাল তো বেঁচে থাকবো না ঠানদি···একদিন-না-একদিন মরতে হবে···দেখি, যদি কোনোমতে তাদের হাত ফশ্‌কে···

কথা শুনে ছোট রাজপুত্রকে ভালো লাগলো বুড়ীর···মায়া হলো। বুড়ী বললে—তার চেয়ে

ভালো হবে দাদা, যে-পথে এসেছো, সেই পথে যদি আবার ফিরে যাও! তুমি দুখের ছেলে··· তোমার কি উচিত হবে এত-বড় বিপদে ঝাঁপ দেওয়া?

বুড়ী অনেক বোঝালো···অনেক মানা করলে···ছোট রাজপুত্রের পণ কিন্তু অটল। সে বললে,—না ঠানদি, যাবো বলে যখন যাত্রা করে বেরিয়েছি, তখন ফিরবো না···এতে আমার ভাগ্যে যা হয় হবে!

তখন বুড়ী বললে—বেশ...যাবেই যখন, তখন আজ এখানে খাওয়া-দাওয়া করো···করে শুয়ে ঘুমোও। তারপর কাল সকালে বেরিয়ো। তোমার ঘোড়াও খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নিক!

বুড়ী খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলে। পাঁটা কাটালো···সেই পাঁটার হলো ঝোল···পদ্মের নাল ভাজা হলো···ক্ষীর সর ছানা আনালো···ভালো মধু আনালো। রাজপুত্রকে বেশ যত্ন করে বুড়ী খাওয়ালো···ভালো বিছানা করে দিলে···রাজপুত্র বিছানায় শুলেন। ঘোড়াকে দেওয়া হলো এত ছোলা আর কুটি।

•　　　　•

পরের দিন সকালে যাত্রার উদ্যোগ। একটা থলির মধ্যে ছোলা পুরে বুড়ী বললে—এটা নিয়ে যেয়ো···অনেক দূর যাওয়া···ঘোড়াকে খেতে হবে। আর দুটি জিনিষ তোমাকে দেবো নাতি, খুব কাজে লাগবে।

এ-কথা বলে বুড়ী করলে কি, নিজের বাক্স খুললো···খুলে বাক্সের মধ্য থেকে এক-টুকরো কিসের শিকড় আর সোনার ছোট একটা বল বার করে এনে ছোট রাজপুত্রের হাতে দিলে...বললে—বেশ সাবধানে রাখবে। তোমার জোয়ান বয়স···মনেও সাহস আছে···তার দরুণ ও-তিনটে নদী পার হতে পারবে। কিন্তু তারপর ওদিকে আরো ভয় আছে। তিন-দশে-তিরিশ রাজার রাজ্যের সীমানায় এক বিকট দৈত্য করে পাহারাদারি...মাথায় আকাশ-প্রমাণ লম্বা...তার গায়ে হাজার ষাঁড়ের জোর! মোটা একটা গাছের গুঁড়ি ঘাড়ে নিয়ে সারা সীমানা চৌকি দিচ্ছে। ও রাজ্যের সীমানায় কেউ পা দেছে কি অমনি ঐ গাছের গুঁড়ির ঘায়ে তাকে মেরে ছিঁড়ে চ্যাপটা করে ফেলে!···তা এই যে বিষের শিকড় দিলুম, এর জোরে তুমি বিকট দৈত্যকে ঠিক কাবু করতে পারবে। তবে হুঁশিয়ার, তাকে দেখে খবর্দ্দার, তলোয়ার বার করো না! আর সে যে-যে কথা জিজ্ঞাসা করবে, বেশ নরম হয়ে নরম গলায় তার সে সব কথার জবাব দেবে। তারপর তার কথা শেষ হলে তার দিক থেকে ফিরে সরে আসবে। তাতে সে ভাববে, তার রাজ্যের সীমানায় তুমি পা দেবে না···বুঝলে! তখন সে বেহুঁশিয়ার থাকবে, আর তুমি সেই তক্কে আড়ালে এসে চাট্টী কাঠিকুঠি জ্বেলে তার আগুনে এই শিকড় ফেলে দিয়ো। ফেলে তুমি উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে···সাবধান, আগুনে এ শিকড় পড়বামাত্র বিষের ধোঁয়া বেরুবে...সে ধোঁয়া নাকে-মুখে ঢুকলে তখনি বেহুঁশ অজ্ঞান! বিকট দৈত্য সে ধোঁয়ায় বেহুঁশ হয়ে পড়লে তোমার তলোয়ার দিয়ে কচ করে তার গর্দ্দানা নেবে···ব্যস! তারপর এই যে সোনার গোলা...এটা দেবে গড়িয়ে···দিয়ে এ গোলা যেখানে যাবে, তুমি গোলার পিছনে পিছনে সেই পথে যাবে।

ছোট রাজপুত্র বললেন—তুমি এত খবর জানো ঠানদি ?

বুড়ী বললে—না রে ভাই···পাঁচ সাত কুড়ি বছর আগে কার মুখে যেন এ গল্প শুনেছিলুম...তা তোমার ঠানদি একবার যে কথা শুনবে, সে কথা জন্মে কখনো ভুলবে না দাদা···তাই মনে আছে।

ছোট রাজপুত্র বললেন—এবার তাহলে ঘোড়ায় চড়ে বসি···

—দাঁড়াও দাদা, আরো কথা আছে। বুড়ী বললে—পাহারাদার তো ঢুকলো! তারপর ঐ কন্যা ...রূপসী হলে কি হবে, অমন জাঁহাবাজ মেয়ের কথা তোমার রূপকথার গল্পেও কখনো শোনোনি! কন্যা তো নয়···দিকধাড়াঙ্গী···ন-দিন সে কন্যা তার হাতিয়ার-ধরা চণ্ডী সঙ্গিনীদের নিয়ে চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায়···সে ন-দিনের মধ্যে তার চোখের সামনে মানুষ এসে পড়েছে কি, কন্যার হাতের বর্শায় সে মানুষ তখনি নিকেশ! দশ দিনের দিন কন্যা পুরীতে ফেরে···ফিরে বসবে...খাবে দাবে...জিরুবে... শুয়ে ঘুমোবে। পুরীর আবার আয়নার কপাট...বাইরের সব কিছু সে কপাটে দেখা যায় পুরীর ভিতর থেকে।···তুমি দাদা, পুরীর ফটক পর্য্যন্ত যেতে পারো, ফটকে ঢুকতে পারবে না। পাঁচিল টোপকে তোমাকে পুরীতে ঢুকতে হবে। পাঁচিলের মাথায় আবার দশহাজার রূপোর ঘণ্টা ঝুলছে সার-সার।... খুব সাবধানে পাঁচিল টপকাতে হবে···ঘণ্টায় না ঘা পড়ে! তারপর পুরীতে না হয় ঢুকলে, কিন্তু ঐ কন্যার ঘর? বন্ধ ঘরের মধ্যে দেখবে সোনার পালঙ্কে শুয়ে কন্যা ঘুমোচ্ছে, সে সময় পা টিপে নিশ্বাস বন্ধ করে কন্যার শিয়রে গিয়ে বালিশের তলা থেকে টুক করে নিতে হবে জীবন-জলের ঘটটি... নিয়ে দাঁড়ানো নয়, কন্যার দিকে ফিরে তাকানো নয়···সোজা বেরিয়া আসা। নাহলে কন্যার যা রূপ···সে-রূপ দেখেছো কি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে যাবে, বুঝলে নাতি?

ছোট রাজপুত্র গম্ভীরভাবে বললেন—বুঝলুম।

—সব কথা মনে থাকবে?

—নিশ্চয় থাকবে, ঠানদি!...এখন তাহলে আসি?

—এসো দাদা···

বুড়ীকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে বুড়ীর দেওয়া জিনিষ নিয়ে ছোট রাজপুত্র হাসি-মুখে বেরুলেন। ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। চললেন সোজা উত্তর মুখে...

তিন দিন তিন রাত চলে চলে ছোট রাজপুত্র এলেন এক পাহাড়ী পথে...এ পথের পর ধু-ধু মাঠ। গাছ নেই, পালা নেই, জীব-জন্তুর চিহ্ন নেই।...মাঠের পর এক-নম্বর চওড়া নদী। নদীর জল কালো কালির মতো কুচকুচ করছে। পার-ঘাটায় নৌকো নিয়ে দাঁড়িয়ে তিন-তিনজন মাঝি। তারা ঘোড়া শুদ্ধু ছোট রাজপুত্রকে পার করে দেবে, বললে।

—ভাড়া?

মাঝিরা বললে—ভাড়া নয়···পার করে দিয়ে যে বখশিস চাইবো, দিতে হবে।

ছোট রাজপুত্র বললেন—বেশ···

নৌকোয় তুলে ঘোড়া-শুদ্ধ ছোট রাজপুত্রকে তারা পার করে দিলে। নৌকো থেকে নেমে ছোট রাজপুত্র বললেন—কি বখশিস চাও?

সেলাম করে তারা বললে—আমরা দর-দস্তুর করিনা। আমাদের বখশিস চাই হুজুরের ডান হাত।

ছোট রাজপুত্র বললেন—ও! কিন্তু ডান হাত দেবার জো নেই তো···তার কারণ, যে-কাজে আমি চলেছি, তাতে আমার ডান হাতের বিশেষ দরকার!

মাঝিরা বললে—তা আমরা জানিনা। হাত চাই। দস্তুর!

—বটে! বলে ছোট রাজপুত্র চক্ষের নিমেষে তলোয়ার বার করে তিনজনকে এমন ঘা দিলেন যে তারা ছোট রাজপুত্রের পায়ে পড়ে চীৎকার তুললো—ঢের হয়েছে হুজুর, আর নয়, আর নয়··· প্রাণগুলো আর নেবেন না···মাপ করুন।

পর-পর আর ছুটো পার-ঘাটাতেও এমনি ব্যাপার। মাঝিরা জব্দ হয়ে মাপ চাইলো। রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে এসে পৌঁছুলো বরফ-ঘেরা তিন-দশে-তিরিশ রাজার রাজ্যের কাছে।···কী ঘন বন...বড় বড় গাছগুলো পাশাপাশি ঠেশাঠেশি ঘেঁষাঘেষি দাঁড়িয়ে আছে···এমন ঝাঁকড়া ডালপালা যে বনের মধ্যে রোদ ঢোকে না...বাতাস আসে না।

ছোট রাজপুত্র তবু চলেছেন···চলেছেন···

শেষে ঐ দেখা যায় রাজ্যের সীমানা। সীমানায় পাহারা দিচ্ছে...বুড়ী যা বলেছিল...বিকটাকার দৈত্য। তার মাথা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে। ইয়া লম্বা দাড়ি আর হাতে মোটা গাছের গুঁড়ি একটা! এদিকে বরফ আর বরফ···চাঁই-চাঁই বরফ···আশে-পাশে···সামনে-পিছনে চারিদিকে ···কনকন করছে...হাড়গুলো জমে বুঝি বরফ হয়ে যাবে! রাজপুত্র ভাবলেন, সব বুঝি মিথ্যা হয়! এ বরফে কি করে বেঁচে থাকবো?

বরফে জমে যাবার জো...হঠৎ ছোট রাজপুত্র দেখেন, সামনে পাহারাদার বিকট দৈত্য। দৈত্য বললে--এদিকে কোথায় চলেছো হে? দেখছি মানুষের বাচ্ছা! এত সাহস তোমার হলো কি করে?

বুড়ী বলে দেছে, পাহারা-দারের সঙ্গে তাণ্ডাইমাণ্ডাই নয়...খুব নরম হয়ে খুব মিষ্টি কথা।

ছোট রাজপুত্র বললেন—কোথাও যাবোনা তো...বেড়াতে বেড়াতে পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি।

দৈত্য বললে,—তাই যদি তো সরে পড়ো। ঐ যে গণ্ডী দেখচো, খবর্দ্দার, ও গণ্ডীতে পা দিয়োনা। দিলে চোখে আর পলক পড়বেনা···বরফের গুঁড়ো হয়ে যাবে!

ছোট রাজপুত্র বললেন—নমস্কার দৈত্য-মশায়...ভাগ্যে বলে দিলেন! আমি এখনি সরে পড়ছি।

—হুঁ···সুবুদ্ধির কাজ করবে তাহলে...

বুড়ীর কথামতো ছোট রাজপুত্র ঘোড়া নিয়ে পিছনে সরে এলেন। ঘন ঝোপ···তার পিছনে

এখানটা দৈত্যের নজর আসেনা। সেখানে এসে ধাঁ করে কতকগুলো কাঠি জড়ো করে তাতে দিলেন আগুন। যেমন আগুন জ্বলা, অমনি সেই আগুনে বুড়ীর দেওয়া সেই বিষের শিকড় ফেলা...ফেলেই তিনি উল্টো দিকে মুখ ফেরালেন।

দেখতে দেখতে মিষ-কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী...সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চীৎকার! ছোট রাজপুত্র দেখেন...ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে আর সেই পাহারাদার দৈত্যটা অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে। তার বিশ্বম্ভর দেহখানা পাহাড়ের মতো পড়েছে আর তার সঙ্গে কটা বড় গাছ অবধি উপড়ে পড়েছে দৈত্যের ঘাড়ের উপর!

ছোট রাজপুত্র দেরী করলেন না...তলোয়ার দিয়ে তার মাথাটা দিলেন কেটে। তারপর···

বুড়ী বলে দেছে, সোনার বল দেবে গড়িয়ে...সে বল যেদিকে যাবে, বলের পিছু-পিছু...

দিলেন তিনি সামনের দিকে সেই সোনার বল গড়িয়ে। বল চললো গড়াতে গড়াতে···ছোট রাজপুত্র ঘোড়ার লাগাম ধরে চললেন সেই বলের পিছু পিছু...

চমৎকার দেশ···চমৎকার রাজ্য। চওড়া পথ···পথের দুধারে ফল-ফুলের বাগান। পাখীর গানে আকাশ-বাতাস ভরে আছে। কোথাও ফুটেছে গোলাপ···কোথাও ডালিয়া···তাছাড়া ভায়োলেট নার্সিসাশ, ডাফোডিল···পৃথিবীতে যত ফুল আছে, এখানে তার কোনোটা ফুটতে বাকী নেই! আর ফল···আপেল, পীয়ারা, লীচু, আঙুর থেকে আম, জাম, পেঁপে, কলা...দুনিয়ার যে-ফল চাও, সব পাবে। এর উপর ওক্; পাইন, এলম...বট অশথের গাছ।

সোনার গোলা গড়িয়ে চলেছে...ছোট রাজপুত্র চলেছেন সেই গোলার পিছু-পিছু।

অনেক দূর এসে ছোট রাজপুত্র দেখেন, প্রকাণ্ড পুরী···সাত-তলা···আর সব-উপর-তলায় সোনার মিনার। মিনারে রোদ পড়ে সোনা ঝক্‌ঝক্ করছে! পথ এবার বেঁকেছে। সবুজ মাঠের উপর দিয়ে পথ···মাঠের ও কোণে ফৌজের দল বর্শা নিয়ে তলোয়ার নিয়ে কুচ করছে!

বলের পিছু-পিছু ছোট রাজপুত্র কাছে এলেন···কাছে আসতে দেখেন, ফৌজে একটিও পুরুষ নেই মেয়ে ফৌজ। সব অপূর্ব্ব সুন্দরী...তাদের পিছনে দেখেন, ওদের চেয়ে অনেক বেশী রূপসী··· মাথায়-সোনার মুকুট। এ মেয়ের রূপের জলুশে চন্দ্র-সূর্যকে মলিন মনে হয়!

ছোট রাজপুত্র বুঝলেন, উনিই সেই রূপসী রাজকন্যা! ওঁর রূপের পানে চাইলে চোখ ঝলশে যায়! রাজকন্যার অঙ্গে সোনার বর্ম্ম আঁটা···মাথার মুকুটে পাখীর দুটো পালক···এক হাতে সোনার ঢাল ···আর এক হাতে বর্শা···তিনি তাঁর রঙ্গিণী ফৌজ নিয়ে রাজ্য দেখতে বেরিয়েছেন।

ছোট রাজপুত্রের মনে পড়লো বুড়ীর কথা···ন-দিন রাজকন্যা ঘুরে ঘুরে রাজ্য দেখেন, তাঁর সঙ্গে থাকে রণরঙ্গিণী সঙ্গিনীর দল···রাজকন্যা না দেখতে পান ছোট রাজপুত্রকে, দেখলেই কাজ পণ্ড হবে··· সাবধান!

ছোট রাজপুত্র লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলেন ওঁদের কুচ-কাওয়াজ। ময়দানে কখনো রাজকন্যা

করছেন সঙ্গিনীদের সঙ্গে বর্শা আর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ-খেলা। কখনো কাকচক্ষু দীঘির জলে সকলে মিলে কাটছেন সাঁতার···কখনো মাঠের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ছেন···

এমনি করে ন-দিন কাটলো। দশ দিনের দিন রাজকন্যা ঢুকলেন সোনার সাত-মহল পুরীতে... ঢোকবা মাত্র ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে পুরীর প্রকাণ্ড ফটক বন্ধ হলো...ফটকে পড়লো তালা চাবি।

ছোট রাজপুত্র অপেক্ষা করে আছেন পুরীর বাহিরে, কখন রাত হবে।

রাত হলো। আকাশে চাঁদ উঠলো। ক্রমে রাত গভীর হলো···ছোট রাজপুত্র তখন ফটকের বাহিরে পুরীর উঁচু পাঁচিল টোপকে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন খুব সাবধানে। পাঁচিলে সার-সার রূপোর ঘণ্টা ঝুলছে।

সেগুলো না ছুঁয়ে ফেলেন! ছুঁলেই ঘণ্টা বাজবে।

পুরীর মধ্যে প্রবেশ করে আবার গড়ালেন সোনার গোলা—গোলা উঠলো সিঁড়ি বয়ে একেবারে সাত-তলার ঘরে···রাজপুত্র তার পিছনে।

ঘরে চাঁদের আলো। সে আলোয় দেখেন, সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজকন্যা···অঘোর ঘুমে অচেতন!

পা টিপে-টিপে রাজপুত্র এসে দাঁড়ালেন···বালিশের নীচে সোনার ছোট ঘটে ভরা জীবন-জল ··ঘটটি নিলেন তুলে···তারপর দু'পা এসে ভাবলেন···এমন রূপসী কন্যা! এমন অপরূপ রূপ ত্রিভুবনে নেই···একবার ভালো করে দেখে তবে যাবো। বুড়ীর মানা তিনি ভুলে গেলেন। :···ভুলে রাজকন্যার পানে চাইলেন। যেমন চাওয়া, ঝন্‌ঝন্‌ করে সাত-মহল পুরী কেঁপে উঠলো··· দুদ্দাড় শব্দে দরজা-জানলা-গুলো উঠলো নড়ে···যেন ভীষণ ঝড় উঠেছে! পুরীর পাঁচিলে ঝোলানো হাজার হাজার সেই রূপোর ঘণ্টাগুলো বেজে উঠলো। রাজপুত্র যেন কাঁটা! রাজকন্যা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলেন। অমন যে দুটি চোখ...সে চোখে ঝলশে উঠলো বিদ্যুতের আগুন! চোখে সে আগুন দেখে ছোট রাজপুত্রের হলো হুঁশ···ছোট রাজপুত্র তখনি ছুটে বেরুলেন সে ঘর থেকে ···টপাটপ সিঁড়ি টোপকে নেমে এসে একেবারে চড়ে বসলেন তাঁর বাদামী ঘোড়ার পিঠে।

লাগাম টানলেন। ঘোড়া ছুটলো। কিন্তু ঘোড়া বললে—মিথ্যা চেষ্টা! আমার সাধ্য নেই রাজপুত্র, রাজকন্যার সঙ্গে পাল্লা দেবো। পুরী জেগে উঠেছে···রাজকন্যা এখনি ওঁর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসবেন। ওঁর রাজ্যের মধ্যে ওঁকে হারানো দৈত্যদের অসাধ্য···আপনি তো সামান্য মানুষ!

ঘোড়া ছুটেছে। কিন্তু কতদূর যাবে? পক্ষীরাজে চড়ে রূপসী রাজকন্যা তখনি বিদ্যুতের গতিতে এসে পড়লেন...হাতের বর্শা ছুড়লেন তাগ করে...বর্শা এসে লাগলো ছোট রাজপুত্রের গায়ে···তাঁর দেহ পথে লুটিয়ে পড়লো। ঘোড়ার পায়ে লাগলো বর্শা। বাদামী ঘোড়া পা ভেঙ্গে সেইখানে পড়ে গেল!...রূপসী কন্যা এসে ছোট রাজপুত্রের সামনে দাঁড়ালেন।

মানুষকে তিনি এই প্রথম দেখলেন! ছোট রাজপুত্র দেখতে চমৎকার। রূপসী কন্যা তাঁকে দেখে

মুগ্ধ হলেন...ভাবলেন, মানুষ এত সুন্দর হয়...আশ্চর্য্য! তাঁর মনে হলো...আহা, এমন সুন্দর রাজপুত্র ...তাকে আমি মেরে ফেললুম!

ঘোড়া থেকে রাজকন্যা নামলেন...তাঁর কাছে ছিল ঘটে-ভরা জীবন-জল। রাজপুত্রের মুখে-চোখে সে জল ছিটিয়ে দিলেন। রাজপুত্র জেগে চোখ মেলে চাইলেন।

বললেন—আমার ঘোড়া?

রাজকন্যা ঘোড়ার গায়ে জীবন-জল ছিটিয়ে দিলেন...ঘোড়া প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠলো।

তারপর ছোট রাজপুত্রের হাত ধরে রূপসী কন্যা বললেন—আমার রাজ্যে মানুষ আসা বারণ... এলে কেউ জীবন্ত ফেরেনি। তুমি কেন এখানে এসেছিলে প্রাণ দিতে?

ছোট রাজপুত্র তাঁর আসার কারণ বললেন।

শুনে রূপসী কন্যা বললেন—বেশ, তাহলে জল-ভরা ঘট নিয়ে তুমি তোমার রাজ্যে এখন ফেরো —তোমার বাবাকে বলো, তিন-দশে-তিরিশ রাজার রাজ্যের রূপসী রাজকন্যা তাঁকে এ জল দেছে নিজের হাতে। তারপর আজ থেকে ঠিক তিন বছর পার হবার আগে তুমি যদি আমাকে না ভুলে যাও, তাহলে এখানে এসো...এসে আমাকে বিয়ে করবে।

ছোট রাজপুত্র মহাখুশী...বললেন—আচ্ছা।

রূপসী কন্যা তখন মাটিতে ঠুকলেন তাঁর সোনার বর্শা...খুব ঘন সোনালি ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে উঠলো। সে ধোঁয়া কাটলে ছোট রাজপুত্র দেখেন, কোথায় রূপসী কন্যা! পক্ষীরাজ-শুদ্ধ বাতাসে মিলিয়ে গেছেন।

জীবন-জল নিয়ে ছোট রাজপুত্র ফিরলেন...মন খুশীতে ভরে আছে...জীবন-জল আনতে পেরেছেন ...এ জলে বাপ ফিরে পাবেন জোয়ান বয়স...দেহে পাবেন শক্তি। আর তিন বছরের মধ্যে রূপসী রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে।

রাজ্যের কাছাকাছি এসে বড় মেজো দুই রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা। তাঁরা তাঁবু গেড়ে দিব্যি আমোদ-আহ্লাদ করছেন। ছোটর কাছে জীবন-জলের কথা শুনে দুজনের মনে জাগলো হিংসা ...তাইতো···বাপ-রাজা তাহলে তো ছোটকে একেবারে মাথায় তুলবেন...হয়তো বা ছোটকেই রাজা করবেন এর পরে রাজ্য দান করে।

দুজনে ফন্দী আঁটলেন। ছোটর উপর ভালোবাসা জানিয়ে বড় মেজো বললেন—তোমার জন্য পথ চেয়ে এখানে আমরা বসে আছি। দেরী হচ্ছে দেখে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় আমাদের দিনগুলো যে করে কেটেছে! এখন তুমি ফিরেছো···শুধু হাতে ফেরা নয়···জীবন-জল নিয়ে ফেরা···আনন্দের আর সীমা নেই আমাদের! আজ তোমার এই সার্থক অভিযানের জন্য রাত্রে আমরা দেবো বিরাট ভোজ ...এখানকার সব লোকজনকে সে ভোজে করবো নিমন্ত্রণ...খাওয়া-দাওয়া হবে, নাচ হবে, গান হবে, কত আমোদ হবে···বিজয়-উৎসব! বুঝলে কি না।

ছোটর মনে সন্দেহের বাষ্প নেই! কেন বা সন্দেহ হবে? মায়ের পেটের ভাই···তার বড়, ...ছোটকে স্নেহ করেন। ছোট বললেন—বেশ।

বড়-মেজো বললেন—তারপর কাল ভোরে তিনজনে রাজ্যে ফিরবো···

রাত্রে নাচ-গান-ভোজ···ছোটর খাবারে বড় মেজো কখন দেছে কি-একটা গুঁড়ো মিশিয়ে... ছোট জানেন না! খেয়ে তাঁর খুব ঘুম পেলো! বললেন—বড্ড ঘুম পাচ্ছে দাদা...

বড় মেজো বললেন—পাবে না ঘুম? কি খাটুনি না গেছে? ঘুমোও তুমি·· দিব্যি বিছানা আছে।

ছোট বিছানায় শুলেন···বললেন—ভোরেই ডেকে দিয়ো···

—নিশ্চয়...নিশ্চয়।

ছোট চোখ বুজলেন...চোখ বোজবামাত্র ঘুম...গাঢ় ঘুম।

বড় মেজো তখন জীবন-জলের ঘট নিয়ে ঘুমন্ত ছোটকে পাঁজাকোলা করে তুলে এক পাহাড়ের উপর থেকে নীচে অতল গহ্বরে দিলেন ফেলে। তারপর ছোটর বাদামী ঘোড়ার মুণ্ডুটা কেটে দুখানা করে তাঁবু তুলে বড়-মেজো জীবন-জলের ঘট নিয়ে পুরীতে যাত্রা করলেন। বাজনা-বাদ্যির মহাসমারোহ করে।

এখন ছোট রাজপুত্র পাহাড়ের যে গহ্বরে পড়েছিলেন, সেটা পাতালের ফটক। ছোট রাজপুত্র সেই যে পড়লেন...কোথাও জায়গা পান না যে নামবেন, আর সেই সঙ্গে পড়া থামে। পড়তে পড়তে পড়তে পড়তে তিনি ঢুম্ করে নামলেন পপি-ফুলের ক্ষেতে। অজস্র পপির ঝাড়··· সে সব ঝাড় রক্তের মতো টকটকে লাল আর ফিকে গোলাপী রঙের লক্ষ লক্ষ ফুলে ভরে আছে··· রাজপুত্র পড়লেন সেই ফুলের উপর···যেন নরম বিছানায় পড়লেন!

পড়ে চারিদিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন, এ তো চির-রাত্রির দেশ! পপি ফুলের গন্ধে কেমন নেশা

লাগলো। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে...দু' চোখের সামনে লাল নীল বেগুনি-সাদা রঙের চুনি-লণ্ঠন দুলছে যেন! রাজপুত্র কেমন যেন হতভম্ব···এমন সময় হঠাৎ দেখেন, এক বুড়ী ··গায়ে লাল রঙের মোটা চাদর···বুড়ী একটা চুবড়িতে আফিম-ফুল তুলেছে···

ছোট রাজপুত্রকে দেখে বুড়ী বললে—আমার আফিমের ক্ষেত মাড়িয়ে ফুলগুলো পিষে চটকে কি করছো গো বাছা, ওখানে?

ছোট রাজপুত্র বললেন—আমি গিয়েছিলুম তিন-দশে-তিরিশ রাজার তিন নয়ে-সাতাশ রাজ্যে··· সেখানকার রাজকন্যার কাছে সত্যবন্দী হয়ে বাবার রাজ্যে ফিরছিলুম...তার পর দেখছি পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি!

বুড়ী বললে—তোমার বাবার নাম কি? কোথায় তার রাজ্য?

ছোট রাজপুত্র বললেন—পৃথিবীর সব-দক্ষিণে...আমার বাবার নাম রাজা আফরণ।

বুড়ী আকাশ-পাতাল ভাবলো···ভেবে বললে—তাইতো বাছা তুমি আমায় অবাক করলে যে! এত বড় পাতাল-রাজ্যের রাণী আমি···বয়স পাঁচশো কুড়ি···পৃথিবীর এত রাজার নাম ধাম জানি, আর তোমার বাপ-রাজার নাম শুনিনে। তা এক কাজ করতে হবে, বাপু—এখানে দিন কতক থাকো···আমার লোকজন দিয়ে তোমার বাপের রাজ্য কোথায় সন্ধান নি...সন্ধান পেলে লোক দিয়ে তোমাকে তোমার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবো তখন।

এ কথা বলে ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে বুড়ী তার অন্ধকার পাতাল-পুরীতে এলো। ছোটকে পোস্ত-দানার বড়া খাওয়ালো···মাংসর ঝোল খাওয়ালো···রুটী খাওয়ালো...মাছ খাওয়ালো। খাইয়ে বিছানা করে দিয়ে তাঁকে বললে—ঘুমোও আজ রাত্রের মতো···কাল সকালে দেখবো, কী তোমার করতে পারি।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলে বুড়ী বললে—আমার লোকজনকে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি···দশ দিকে খোঁজ করবে···কোথায় তোমার বাপের রাজ্য। একজন-না-একজন খোঁজ ঠিক পাবেই···যতদিন না খোঁজ পাওয়া যায়, নিশ্চিন্ত মনে তুমি এখানে থাকো···বাড়ীর ছেলের মতো।

এ কথা বলে বুড়ী গাল ফুলিয়ে শব্দ করলে···সে যেন ঠিক ঝড়ের গর্জ্জন! চারিদিক থেকে এসে জড়ো হলো মাছ, পোকা-মাকড়-পতঙ্গের দল। বুড়ী বললে—ওরে মাছেরা...ওরে সাপ-কেঁচো-টিকটিকি-গিরগিটিরা, তোরা যা, খোঁজ করতে বেরো···পৃথিবীর যেখানে যত সাগর আছে, নদী আছে, নালা আছে—সে সব সাগর নদী নালা থেকে সকলে বেরো পৃথিবীর দক্ষিণে আফরণ রাজার রাজ্যের সন্ধানে।

বুড়ীর কথায় মাছ সাপ কুমীর হাঙর অক্টোপাস তিমি যেখানে যে ছিল···দলে দলে সব বেরুলো আফরণ রাজার রাজ্য খুঁজতে। শুধু এরা নয়···ছুঁচো, ব্যাঙ, মাকড়শা, শামুক, গেঁড়ি, গুগলি... পিঁপড়ে, উইচিংড়ী, উকুন, ছারপোকা, মশা-মাছি, কাক-শকুনিগুলো পর্য্যন্ত দল বেঁধে বেরিয়ে গেল।

কেউ জানেনা, আফরণ রাজার রাজ্য কোথায়, কোনদিকে। তবু বুড়ীর হুকুম…অমান্য করবার নয়।…

একদিন দুদিন তিন দিন করে সাতদিন কাটলো। আটদিনের দিন আফিমের ক্ষেতের উপর কালো ছায়া মেলে ডানার ভর করে এলো হুমো পাখী। বুড়ী বললে—কি, ফিরে এলি যে… সন্ধান পেয়েছিস ?

হুমো পাখী বললে—পেয়েছি সন্ধান। আফরণ রাজার রাজ্য হলো পৃথিবীর একেবারে শেষ মুড়োয়…

বুড়ী বললে—তুমিই দেখছি, শুধু কাজের কাজী। এখন এক কাজ করতে হবে তোমায়। এই ছেলেটিকে তুমি তোমার ডানায় বসিয়ে সেই রাজ্যে পৌঁছে দিয়ে এসো…এ ছেলেটি হলো আফরণ রাজার ছেলে।

হুমো পাখী বললে,—নিশ্চয় যাবো। তবে সে হলো অনেক-অনেক দূরে। পৌঁছুতে তিনটি বছর সময় লাগবে…সঙ্গে তিন বছরের খোরাক নিতে হবে রাণীমা।

বুড়ী বললে,—শুধু তোমার খোরাক নয়…ছেলেটিকেও তো খেতে হবে। তারো খাবার চাই তিন বছরের মতন। এনে দি…

পুরী থেকে বুড়ী আনলো প্রকাণ্ড ঝোড়া…ঝোড়ায় কত রকমের মিষ্টি…কত রকমেব চাল…কত ফল। তাছাড়া ছানা, মাখন, মধু…আরো কত কি। ঝোড়াটি বুড়ী নিজের হাতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে হুমো পাখীর বাঁদিককার ডানায়…তারপর ছোট রাজপুত্রকে বললেন,—শোনো, এ পাখীকে আমি মোগল বলে ডাকি…এর পিঠে চড়ে যেতে যেতে যখনি দেখবে পাখী মুখ ফেরাচ্ছে, তখনি ওর মুখে দেবে গুঁজে মিষ্টি আর মাংস…বুঝলে ? খাবার দিতে দেরী না হয়…

ছোট রাজপুত্র মাথা নেড়ে বললেন—হুঁ…

তারপর বুড়ীকে নমস্কার করে ছোট রাজপুত্র পাখীর পিঠে উঠে বসলেন। যেমন বসা, পাখী একেবারে হুশ্‌ করে উঠে ঝড়ের বেগে সোঁ করে উড়ে চললো…পাতালের আঁধার কোটর ঠেলে উপরে…উপরে এসে আকাশ দেখে গাছপালা দেখে পাহাড় দেখে নদী দেখে আলো দেখে ছোট রাজপুত্র আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

পাখী উড়ে চলেছে…উড়ে চলেছে…কত পাহাড় পর্ব্বত সাগর নদী রাজ্য পাট পার হয়ে। যেতে যেতে মাঝে মাঝে মুখ ফেরাচ্ছে—ছোট রাজপুত্র তার মুখে দেন মাংসর টুকরো আর মিষ্টি গুঁজে। সমানে এমনি খোরাক জোগানো চলেছে।

খাওয়াতে খাওয়াতে একদিন হঠাৎ দেখেন, খোরাক ফুরিয়ে এসেছে। তখন খুব চেঁচিয়ে ছোট রাজপুত্র বললেন—শোনো মোগল, খাবার মোদ্দা ফুরিয়েছে—কোথাও একবার নামলে হয়না ? অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য ? তাহলে আবার ঝোড়া ভরে তোমার খোরাক নি।

পাখী বললে—নীচের দিকে চেয়ে দেখেছো, গভীর জঙ্গল। এখানে নামতে গেলে কোনো গাছের ডালে আমার পাখা লাগে যদি তাহলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। আর তা যদি পড়ি, দুজনকে যেতে হবে বাঘ-সিঙ্গীর পেটে।

নামা হলো না। পাখী চললো উড়ে। শেষে ঝোড়া একদম খালি। পাখী মুখ ফেরালো—খাবার নেই! উপায়? খাবার না পেলে কিসের জোরে পাখী উড়বে?

ছোট রাজপুত্র তখন করলেন কি, নিজের হাঁটু থেকে পায়ের চেটো পর্য্যন্ত একখানি পা কেটে পাখীর ঠোঁটে দিলেন গুঁজে...পাখানি পাখী দিব্যি খেলে।

উড়তে উড়তে পাখী এলো আফরণ রাজার পুরীর উপর। নীচে দেখা যায় পুরীর ফটকের মাথায় সোনার গম্বুজ···রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে।

রাজপুত্র ব্যস্ত হলেন, বললেন—পাখী এসেছি, নামো! কোনো ভয় নেই...ঐ প্রকাণ্ড সবুজ ময়দান, নামো।

পাখী নীচের দিকে চেয়ে দেখলো···তারপর হুশ্ করে নামলো সবুজ ময়দানে ছোট রাজপুত্রকে পাখায় নিয়ে। নেমেই পেট থেকে উগরে দিলে ছোট রাজপুত্রের পাখানা—উগরে সে-পা দিলে ছোট রাজপুত্রের হাঁটুতে এঁটে।

রাজপুত্র ময়দানে নামলেন। যেমন তাঁর নামা, পাখী হুশ্ করে ডানা মেলে আকাশে উড়ে চকিতে মিলিয়ে গেল!

রাজপুত্র এলেন পুরীর ফটকে। সারা পথ বড়-মেজো দুই ভাইয়ের বদমায়েসির কথা ভাবতে ভাবতে এসেছেন। এখন পুরীতে ফিরে মন কিন্তু দুই দাদার-উপর মমতায়-মায়ায় ভরে উঠলো। ভেবেছিলেন, বাবাকে সব কথা বলে দেবেন। এখন ভাবলেন, না, বাবার কাছে ফিরেছি তো··· বাবা শুনলে যদি ওদের খুব সাজা দেন!

রাজপুত্র এলেন পুরীর প্রাঙ্গণে। এসেই বুঝলেন, পুরী আর সে পুরী নেই। সে আনন্দ, সে হাসি-খুশীর চিহ্ন নেই! সভায় বসে আছেন জ্ঞানী গুণী সভাসদরা...সকলের মুখে মলিন ছায়া··· কারো মুখে কথা নেই। সকলে দাঁড়িতে হাত বুলোচ্ছেন, কত কি ভাবচেন যেন! ওদিকে চাকর-বাকররা অস্ত্র-শস্ত্র শাণাচ্ছে, পালিশ করছে। ঘণ্টা বাজছে···কেল্লার ঘণ্টা···সকলকে যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরী হবার সঙ্কেত।

একজন সেপাইকে ছোট রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্যাপার কি সেপাই?

সেপাই বললে—কে এক রাজকন্যা এসেছেন রাজ্য আক্রমণ করতে···তিন-দশে-তিরিশ রাজার রূপসী রাজকন্যা। রাজ্যের বাহিরে যে সুমুদ্দুর···সেই সুমুদ্দুরে রূপসী রাজকন্যার যুদ্ধের জাহাজ—সব সোনার তৈরী। কাল তিনি যুদ্ধ করবেন···আগুন লাগিয়ে রাজ্য পুড়িয়ে দেবেন···বর্শার ঘা আর তীরের ফলায় রাজ্যের সকলকে মেরে ফেলবেন!

ছোট রাজপুত্র বললেন—হঠাৎ এ রাজ্যের উপর তাঁর এতখানি আক্রোশের কারণ?

সেপাই বললে—তিনি মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন...বলে পাঠিয়েছিলেন, ছোট

রাজপুত্রকে তাঁর রাজ্যে পাঠাতে তাঁকে বিয়ে করবার জন্য! ছোট রাজপুত্র নিরুদ্দেশ···কাজেই মহারাজ কি করে তাঁকে পাঠাবেন? মহারাজ পাঠাতে পারেন নি ··তাই এ যুদ্ধ।

ছোট রাজপুত্র বললেন—ও···তা তোমাদের ছোট রাজপুত্র হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন কেন?

সেপাই বললে সে কাহিনী...বললে—তিন ভাইয়ে বেরুলেন...বড়-মেজো ফিরলেন জীবন-জল নিয়ে—ছোট রাজপুত্রের সেই ইস্তক কোনো খবর নেই!

ছোট রাজপুত্র বললেন—বটে! জীবন-জল কি হলো?

সেপাই বললে—সে জীবন জল মহারাজ খেলেন। সেই জলের গুণেই মহারাজ তাঁর জোয়ান বয়স ফিরে পেয়েছেন...গায়ে জোয়ান বয়সের শক্তি! কিন্তু তা হলে কি হবে···ছোট রাজপুত্রের শোকে মহারাজ কাতর...মচ্ছি ভঙ্গ! তাঁব মনে সুখ নেই, মুখে হাসি নেই! তিনি বলেন, ছোটকে যখন হারিয়েছি, তখন আমার রাজ্য ছার-খার হয়, হোক। রাজ্যে তাঁর বাসনা নেই! যুদ্ধের আয়োজন যা হচ্ছে, তা শুধু বড় আর মেজো রাজপুত্রের কথায়।

ছোট রাজপুত্র হো-হো কবে হাসলেন...হেসে বললেন—হুঁ! তা কুছ পরোয়া নেই সেপাই। আমি সব ঠিক করে দেবো। এ যুদ্ধ আমি বন্ধ করবো।

সেপাই অবাক হয়ে তাকালো···ভাবলো, ছেলেটা পাগল রে!

ছোট রাজপুত্র কিন্তু দাঁড়ালেন না...ঘোড়াশাল থেকে তেজী ঘোড়া বার করে তখনি তার পিঠে চড়ে তিনি ছুটলেন সমুদ্দুরেব ধাবে। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন—আমি আইভান রাজপুত্র ...রাজকন্যার সঙ্গে দেখা কবতে এসেছি।

জাহাজে আনন্দের হাট বসলো...বাজনা-বাদ্যি...বাজি পোড়ানো···কী ধূম!

রাজার কাছে এলো নেমন্তন্ন-পত্র...রাজকন্যার বিবাহ আজ রাত্রে যুবরাজ আইভানের সঙ্গে।

রাজা ভাবলেন, পাগল হুকুম শেষে! তিনি নেমন্তন্ন রাখতে এলেন...এসে দেখেন, ছোট রাজপুত্র আইভান! ছোট রাজপুত্রকে তিনি বুকে চেপে ধরলেন ···

জাহাজে ছোট রাজপুত্রের সঙ্গে রূপসী রাজকন্যার বিয়ে হলো। রাজা শুনলেন পথের বৃত্তান্ত... পাতাল-পুরীর বুড়ী রাণীর কথা...শুনলেন বড়র আব মেজোর শয়তানীব বিবরণ।

বিবাহের উৎসব শেষ হলে বড় আর মেজোকে রাজা দিলেন নির্ব্বাসন-দণ্ড...গভীর বনে। ছোট রাজপুত্রকে বসালেন রাজ্যের সিংহাসনে...আর রূপসী কন্যা হলেন রাণী।...

তিন-দশে-তিরিশ রাজার রাজ্য···সে-রাজ্যও ছোট রাজপুত্রের হলো...সে-রাজ্যেও তিনি রাজা, আর রূপসী কন্যা রাণী।

এক বড় জমিদার···যেমন প্রতাপ, তেমনি ঐশ্বর্য্য। জানোয়ার আর পাখী শিকার করে বেড়ান ···শিকার করা ছাড়া তাঁর আর ছুনিয়ায় কোনো কাজ নেই! জমিদারীর মধ্যে বড় বড় জঙ্গল আছে...পাহাড় আছে। সেই সব পাহাড়ে-জঙ্গলে আছে বাঘ, সিঙ্গী, বরা, হরিণ আর কত রকমের পাখী...জমিদার ঘোড়ায় চড়ে সেই সব পাহাড়ে যান, জঙ্গলে যান···হাতে তীর, ধনুক, বর্শা, বন্দুক। পাখী মেরে আনেন, জানোয়ার মেরে আনেন। বাজপাখী নিয়ে শিকারে যান···ঘোড়াশালে আছে পাঁচ-সাতশো তেজী ঘোড়া, বাজপাখী আছে হাজার দেড়-হাজার।

রাশিয়ার রাজা হাসেন, হেসে বলেন—শিকারের নেশায় জমিদার কি টাকাটাই খরচ করে!... আমি এত-বড় রাশিয়ার রাজা···আমি অত খরচ করতে পারি না। বেশিলের যে-সব তেজী ঘোড়া··· অমন একটা ঘোড়া আমার নেই!···

জমিদারের নাম বেশিল।

একদিন জমিদার বেশিল বেরিয়েছেন পাহাড়ে শিকার করতে···কোনো শিকার মিলছে না··· হঠাৎ দেখেন, পাহাড়ের চূড়োয় বসে একটা ঈগল পাখীর ছানা। হোক্ ছানা...ছানাকে মারবেন বলে' ধনুকে তীর জুড়েচেন, ঈগলের ছানা কাকুতি-ভরে বলে উঠলো—দোহাই হুজুর··· আমাকে মারবেন না, মারবেন না! আমি এতটুকু বাচ্ছা...আমায় বরং আপনার বাড়ীতে নিয়ে চলুন। তিনটি বছর আমাকে দানাপানি খাওয়াবেন···তারপর দেখবেন, আপনার কত কাজে লাগি।

হেসে জমিদার বেশিল বললেন—হুঁ···ঈগল পাখী! তাও আবার ধাড়ী নোস...এতটুকু বাচ্ছা ···তুই আমার কী কাজে লাগবি রে!···ও-সব চালাকি চলবে না···

ঈগলের ছানা আবার কাকুতি জানালো—দোহাই, দোহাই হুজুর···

সে কথা কাণে না তুলে জমিদার আবার ধনুকে তীর জুড়লেন···ঈগলের ছানা আবার উঠলো ককিয়ে···বললে—দোহাই···দোহাই আপনার···আমাকে না মেরে বাড়ী নিয়ে চলুন···তিনটি

বছর খাঁচায় রেখে খাওয়াবেন দাওয়াবেন...তারপর তিন বছর গেলে দেখবেন, আমি আপনার কি করি!

বেশিল শুনলেন না···আবার ধনুকে জুড়লেন তীর···ঈগলের ছানা আবার জানালো কাকুতি···

বার-বার তিনবার। জমিদার বেশিল ভাবলেন, বেশ, শিকার তো অনেক করেছি···কত বড় বড় জানোয়ার, কত বড় বড় পাখী! এ একটা বাচ্ছা পাখী বৈ নয়...দেখা যাক, বাড়ী নিয়ে গিয়ে তিন বছর না হয় খাঁচায় রেখে খাওয়াবো, তারপর ও যা বলছে···দেখি, কি ও করে!

চাকরের হাতে তীর-ধনুক দিয়ে জমিদার বেশিল ঈগলের ছানাকে নিলেন হাতে···নিয়ে বাড়ী এলেন। বাড়ী এসে ঈগলের ছানার পায়ে সোনার শিকলি এঁটে খাঁচায় রাখলেন। রোজ তাকে খাওয়াতে লাগলেন ভালো-ভালো খাবার···নিজের হাতে।

ব্যস রে, সে কী খাওয়া! খালি মাংস···আর মাংস। দু-বছরে এমন খাওয়া খেলো যে জমিদারের গোয়ালে আর একটা গরু রইলো না···একটা ভেড়া রইলো না!···জমিদার একবার ভাবেন, ধেৎ, এর যে রকম রাক্ষসের খোরাক...এখনো একটি বছর ঐ খোরাক জোগানো! তার চেয়ে দি, ওকে ছেড়ে···

খাঁচা খুলে বাচ্ছাটাকে উড়িয়ে দেবেন...পারলেন না···মায়া হলো! দু-দু বছর নিজের-হাতে খাইয়েছেন দাইয়েছেন···আর একটা বছর বৈ নয়!

বাচ্ছা বুঝলো জমিদারের ভাব। সে বললে—দু-বছর যদি কষ্ট সয়েছেন···আর একটা বছর, হুজুর!

জমিদার ফোঁশ করে উঠলেন, বললেন—হুজুর! কিন্তু কোথা থেকে তোমার ও খোরাক জোগাবো বাপু? এখনো একটি বছর! আমার গোয়ালে ভেড়ার আর গোরুর একগাছি রোঁয়া পর্য্যন্ত রাখোনি!

ঈগলের ছানা বললে—নিজের না থাকে···আশপাশের কোনো জমিদারের গোয়াল দেখুন...লুঠ করুন···কিনে আনুন...ধার করুন...

জমিদার কি ভাবলেন, ভেবে বললেন—তার চেয়ে তুমি ছাখোনা চেষ্টা করে···উড়তে পারো কি না! দু-বছরে যা খেয়েছো, আমরা যে দুশো বছরে ওর অর্দ্ধেক খেতে পারি না বাপু!

নিশ্বাস ফেলে বাচ্ছা বললে—বেশ···তাহলে দেখি চেষ্টা করে।

বেশিল তখন বাচ্ছার খাঁচা হাতে বাড়ীর সাত-তলার ছাদে উঠলেন···পাখীর পায়ের সোনার শিকলি খুলে তাকে খাঁচার বাইরে এনে ঘুড়ির ধরাই দেবার মতো উঁচু করে ধরে দিলেন উড়িয়ে! পৎপৎ করে ডানা নাড়তে নাড়তে বাচ্ছা একবার এ আলসেয়, পরের বার ওদিকে চিলকাঠার দেয়ালে মাথা ঠুকে পড়ে গেল...পড়ে ভয়ানক হাঁফাচ্ছে! বেশিল গিয়ে তাকে তুললেন।

বাচ্ছা বললে—না হুজুর, আমার পাখায় এখনো জোর হয়নি···দু'বছর যখন আমার জন্য এত করলেন, তখন আর একটা বছর কষ্ট করে দেখুন। আপনার দয়া!

বাচ্ছার উপর মায়া হয়েছে...বেশিল ভাবলেন, তাই করি, আর একটা বছর বৈ নয়।

খাঁচাশুদ্ধ বাচ্ছাকে তখন তিনি নামিয়ে আনলেন...আশে পাশে যে-সব ধনী লোকের গোয়াল ছিল, ভেড়াশাল ছিল, তাদের কাছ থেকে গোরু-ভেড়া ধার করে আনতে লাগলেন...দু-একখানা তালুক বন্ধক দিয়ে সেই বন্ধকী টাকায় হাট থেকে ভেড়া, গরু কিনলেন।

জমিদার্নী চটে আগুন!

ঝঙ্কার দিয়ে জমিদার্নী বলেন—তোমার ভীমরতি হয়েছে···একটা ঈগল পাখীর ছানা···ময়না নয়···কোকিল নয়...কাকাতুয়া নয়...বুলবুল্ নয়···ওটার জন্য তালুক-মুলুক ঘুচিয়ে আমাদের পথে বসাবে! ছি-ছি ছি-ছি-ছি···

জমিদার বললেন—আহা, বেচারী উড়তে পারে না, আমি ছেড়ে দিলে কোথায় ও যাবে, বলো?

—চুলোয় যাক! জমিদার্নী হাত নেড়ে মাথা নেড়ে দিলেন জবাব—ঢের ঢের মানুষ দেখেছি... নেশাও দেখেছি···তা বলে ঈগল-পাখীর বাচ্ছার নেশা! ছি ছি-ছি ছি-ছি···

জমিদার বেশিল এ সব কথায় টললেন না...বাচ্ছাকে আরো এক বছর যত্ন করে খাওয়ালেন-দাওয়ালেন। খাওয়ানোর ধুমে তার দুটো তালুক গেল বিক্রী হয়ে···দেনাও হলো বেশ···তবু তিনি বাচ্ছাকে ছাড়লেন না!

···তারপর তিন বছর কাটলে একদিন বাচ্ছা বললে—হুজুর, আজ একবার খাঁচা খুলে দেখুন... মনে হচ্ছে, আমার পাখনায় বেশ জোর হয়েছে! দুশো চারশো ক্রোশ উড়তে পারবো'খন।

পাখীর খাঁচা নিয়ে জমিদার উঠলেন সাত-তলার ছাদে···শিকলি কেটে বাচ্ছাকে দিলেন উড়িয়ে ···ছাড়া পেয়ে বাচ্ছা আকাশে উড়ে গেল। উড়তে উড়তে কতদূর চলে গেল···বেশিল দেখেন আকাশের গায়ে যেন ছোট একটু কালো রঙের ফুটকি! তিনি ভারী খুশী হলেন।

বাচ্ছা উড়ে ফিরে এলো। এসে জমিদারকে বললে—এক কাজ করুন হুজুর...আমার পিঠে উঠে বসুন। আপনাকে নিয়ে আমি আকাশে উড়ে, চলুন, পৃথিবী দেখিয়ে আনি। গাড়ীতে চড়ে ঘোড়ায় নৌকোয় জাহাজে চড়ে অনেক ঘুরেছেন তো! সে ঘোরায় পৃথিবীর কতটুকু বা দেখেছেন! আমার পিঠে বসে ঘুরবেন, চলুন···কতদূর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো, পৃথিবীর কত জিনিষ দেখবেন!

কথা শুনে বেশিলের মনে লোভ হলো···লোভের সঙ্গে একটু ভয়ও হলো। তিনি বললেন—পারবি? না, দিবি আমাকে হুড়মুড় করে ফেলে?

—না, না, না···বাচ্ছা বললে—বসুন আমার পিঠে। সকালে রোদের তেমন তেজ নেই···ভারী চমৎকার লাগবে।

বেশিল বসলেন ঈগলের পিঠে...তাঁকে নিয়ে ডানা মেলে ঈগল আকাশে উঠলো। উড়ে-উড়ে চললো কত সহর, কত বন আর পাহাড়ের উপর দিয়ে। নীচে সাগর···অনেক উঁচুতে উড়ে চলেছে···যেতে যেতে ঈগল একবার কাৎ হয়ে ডানা ঝাড়া দেছে, বেশিল গড়িয়ে পড়লেন তার

পিঠ থেকে...ভয়ে তিনি আঁতকে উঠলেন! ঈগল ধাঁ করে তখনি নীচে নেমে বেশিলকে পিঠ পেতে পিঠে তুলে নিলে···বললে—বড্ড ভয় হয়েছিল হুজুর, না?

দম নিয়ে বেশিল বললেন—হুঁ···হবে না ভয়? আর একটু হলেই সমুদ্দুরের জলে পড়ে চুবন খেয়ে মরতুম!...তা, ঢের ওড়া হয়েছে...খাবার সময় হলো···এবার ফিরে চলো।

—হুঁ! বলে ঈগল ফিরলো···বেশিলের বাড়ীর পথে।

সামনে পাহাড়···ঈগল আবার দিলে গা ঝাড়া···বেশিল অমনি গড়িয়ে খশে পড়লেন পিঠ

থেকে চোখ বুজে। ভয়ে কাঁপছেন...ঈগল আবার পাখা মেলে বেশিলকে নিলে পিঠে তুলে··· বললে—ভয় হয়েছিল?

—হয়েছিল বৈ কি! পাহাড়ে পড়ে গুঁড়ো হতুম যে!

ঈগল হাসলো, বললে—না, ভয় কি! আমি রয়েছি।

উড়তে উড়তে···সমুদ্দুরের বাঁকে পাহাড়...সেই পাহাড়ের পরেই সাত-মহল বাড়ী··· ঈগল আবার দিলে ডানা ঝাড়া···বেশিল গড়িয়ে পড়লেন জলের বুকে। পড়ে কি নাকানি-চুবোনি! ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে যান আবার ভুশ করে ভেসে ওঠেন...লোণা জল খেয়ে খক-খক কাসি··· ঈগল চট করে নেমে ছোঁ মেরে ঠোঁটে করে বেশিলকে তুললো···তুলে সে নামলো পুরীর শান-বাঁধানো ঘাটে। জমিদারকে নামিয়ে ঈগল-ছানা বললে—বড্ড ভয় হয়েছিল···উঁ?

—হয়েছিল! খুব ভয় হয়েছিল। প্রাণটা আর একটু হলে···

ঈগল বললে—তাহলে বুঝুন, মরণকে সামনে দেখলে কেমন ভয় হয়! এ ভয় সবার হয় হুজুর ···শুধু আপনার নয়···আমারো। আপনি আমাকে মারতে তিন-তিনবার তীর উঁচিয়ে ছিলেন··· তখন আমারো ঠিক এমনি ভয় হয়েছিল। ভয় কাকে বলে, বোঝাবার জন্য আপনাকে আমি তিনবার ফেলে দিয়ে ছিলুম···

বেশিল তাকালেন ঈগলের পানে...গম্ভীর দৃষ্টি।

ঈগল বললে—আর পাখী বা জানোয়ার মারবেন না। শিকার আপনার বন্ধ হতে পারে··· কিন্তু আমাদের প্রাণ যায় সে-শিকারের ঠেলায়···বুঝলেন!

লজ্জা পেয়ে বেশিল বললেন—আজ থেকে আমি শিকার ছেড়ে দিলুম ঈগল।...

—বেশ...তাহলে নেয়ে-খেয়ে নিন...তারপর চলুন, আপনাকে আমি পৃথিবী দেখিয়ে আনি।... কত নতুন নতুন দেশ···নতুন নতুন রাজ্য···পাহাড়-পর্ব্বত, বন, সাগর দেখবেন।...ভয় নেই, আর ডানা-ঝাড়া দেবো না। সে সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে, হুজুব...

খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার বেশিলকে পিঠে বসিয়ে ঈগল চললো উড়ে···আকাশে অনেক-উঁচু দিয়ে···নীচে কত সহর গ্রাম···নদী-নালা পার হয়ে...সাত সমুদ্দুরের ওপর দিয়ে তিন দিন তিন রাত-অবিবাম উড়ে-উড়ে চার দিনের দিন বিকেল বেলায় বেশিল বাতাসে পেলেন তাজা কমলা-ফুলের গন্ধ। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন, সামনে কমলার ঘন বন...সার-সার কমলা লেবুর গাছ ···অজস্র·· অফুরান·· সব গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে···বাতাসে ভেসে আসছে সেই কমলা ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

দেখে বেশিলের মনে হলো, আহা, এই কমলা-কুঞ্জে যদি একটু জিরতে পারতুম!

ঈগল কিন্তু নামলো না কমলাব বনে...উড়তে উড়তে সোজা দক্ষিণ দিকে চললো। তার হাঁফও ধরে না! বেশিল আশ্চর্য্য হলেন! ঈগলের পিঠে বসে দেখেন, কোথায় সে কমলার বন···নীচে ধূ-ধূ মাঠ···

ঈগল বললে—চেয়ে দেখুন হুজুব, আমাদের মাথার উপর···কি-দেখচেন...বলুন তো? আর নীচেয় বা কি?

বেশিল চেয়ে দেখেন, মাথার উপর সূর্য্য হেলে অস্ত যাচ্ছে...আর নীচে ঐ ধূ-ধূ মাঠের পর বাঁ দিকে পাহাড়...পাহাড়ের পর পাহাড় উঠেছে...আর সব শেষের যে উঁচু পাহাড়, তার মাথায় ঝক্‌ঝক্ করছে শ্বেত-পাথরের পুরী।

ঈগল বললে—ঐ পুরীতে আজ রাত্রের মতো আমরা নেবো বিশ্রাম।...ও হলো আমার বড় বোনের বাড়ী।

বেশিল বললেন—বটে!...

বেশিলকে নিয়ে ঈগল এসে নামলো বড়বোনের পুরীর প্রকাণ্ড উঠোনে। নামবামাত্র বড় বোন এলো বেরিয়ে—আয়, আয় বলে। বেশিল ভেবেছিলেন, বোনকে দেখবেন মস্ত একটা ঈগল-পাখী! তা নয়। তার বদলে দেখেন, পরমাসুন্দরী কন্যা। বোনের মুখ চোখ নাক হাত পা দেহ সব মানুষের মতো...শুধু চোখ দুটো শিকারী পাখীর চোখের মতো ঝাজালোপানা...আর মাথায় চুল নেই, চুলের বদলে পাখীর পালক!...

ভাইকে বুকে জড়িয়ে বোন করলে আদর, বললে—আয়, খাবার তৈরী...খাবি আয়।

ঈগল বললে—আমার সঙ্গে ইনি...

এ কথা শেষ হবার আগে বোন চাইলো বেশিলের পানে। যেমন দেখা, মানুষ...অমনি দু হাতে দিলে তালি। সে তালি শুনে ইয়া বড় বড় দুই ডালকুত্তো কুকুর এসে হাজির। বোন দিলে কুকুর দুটোকে বেশিলের পানে লেলিয়ে। বেশিল ভয়ে এতটুকুন...

ব্যাপার দেখে ঈগল দু'পায়ে কুকুর দুটোকে মারলে ক্যাঁৎক্যাঁৎ করে দুই লাথি...লাথি খেয়ে কুকুর দুটো তখনি দিলে চম্পট...ঈগল তখন পালক দিয়ে বড়বোনের মাথায় এমন ঝাপ্‌টা মারলো যে বোন মাটীতে পড়ে বেহুঁশ!

ঈগল বললে বেশিলকে—এখানে আর একদণ্ড নয় হুজুর, আমার পিঠে উঠে বসুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে বেশিলকে ঠোঁটে করে ধরে পিঠে তুলে ঈগল আবার আকাশে উড়লো।

রাতের আকাশ...চাঁদের আলোয় মেঘগুলো সাদা ঝক্‌ঝক্ করছে...উপরে নীচে বেশ স্পষ্ট সব দেখা যাচ্ছে...ঈগল বললে—চেয়ে দেখুন হুজুর, পিছন-দিকে।

বেশিল চেয়ে দেখলেন, দেখে বললেন—এ কি...তোমার বোনের পুরী দেখছি লালে লাল! ব্যাপার কি?

ঈগল বললে—আগুন লাগিয়ে দিয়েছি! যেমন পাজী...ঐ জ্বলন্ত পুরীর মধ্যে ও পুড়ে মরুক। অতিথকে যে ঠাঁই দেয় না, তার মরা উচিত।

সারারাত ঈগল উড়ে চললো...ঘুমে বেশিল চোখ চেয়ে থাকতে পারেন না...ঈগলের পিঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন...

পরের দিন সকাল হলো...সকালের পর দুপুর...তারপর সন্ধ্যা...সন্ধ্যার পর আবার রাত্রি...

তখন ঈগল বললে হেঁকে—চেয়ে দেখুন হুজুর, মাথার উপর আকাশের দিকে আর নীচে পৃথিবীর দিকে...

বেশিল চেয়ে দেখেন, মাথার উপর আকাশে চাঁদ আর রাশ রাশ নক্ষত্র···নীচে ডানদিকে জ্যোৎস্নায় ভরে' পৃথিবী আলোয় আলো ···বাঁ দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়···আর সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের বুকে লাল রঙের এক পুরী।

ঈগল বললে—ওটা হলো আমার মেজবোনের বাড়ী···আজ ঐখানে থাকবো।

ঈগল নামলো মেজবোনের পুরীতে...মেজবোন এলো ছুটে,—ভাইকে আদর করে বললে—খেতে আয়...কত দূর থেকে আসছিস···কত শ্রম হয়েছে!

ঈগল বললে—আমি একা নই। আমার সঙ্গে···

যেমন চাওয়া বেশিলের পানে···অমনি মেজবোন উঠলো ফোঁশ করে! শীষ দিলে—ছুটে৷ বড় বড় ডালকুত্তো এলো বেরিয়ে···মেজবোন তাদের লেলিয়ে দিলে বেশিলের দিকে...

এখানেও সেই ব্যাপার···কুকুর দুটোকে লাথি মেরে মেজবোনকে মেরে মাটীতে ফেলে বেশিলকে পিঠে তুলে ঈগল আবার উঠলো আকাশে...

খানিক উড়ে এসে বেশিলকে বললে—পিছন দিকে চেয়ে দেখুন, হুজুর...

বেশিল দেখেন, মেজবোনের পুরী দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

ঈগল বললে—অতিথকে যারা বিমুখ কবে, তাদের পুড়িয়ে মারতে হয়।

আবার ওড়া...ওড়ার বিরাম নেই। দু-দিন দু-রাত। তিনদিনের দিন বিকেল বেলা ঈগলের কথায় বেশিল চেয়ে দেখেন...সামনে পাহাড় আর পাহাড়···আর সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় নীলবঙের পুরী।

ঈগল বললে—ঐ পুরীতে আজ আমাদের বিশ্রাম। ওখানে থাকে আমার মা আর আমার ছোটবোন। ওরা আপনাকে আদর করে রাখবে।

বেশিল বললেন—তাহলেই বাঁচি...নাহলে যে রকম ক্লান্ত হয়েছি···কিছু খেয়ে বিছানায় পড়ে যদি ঘুমোতে পাই, তাহলে আর কিছু চাই না।

ঈগল নামলো নীলপুরীতে। ঈগলেব মা আর ছোটবোন খুব খাতির যত্ন করলে বেশিলকে। ছোটবোন পরমাসুন্দরী কন্যা...মাও মানুষের মতো।

মা বললে ঈগলকে—নে, এখন জামাজোড়া খুলে শুগে যা···

মার কথায় ঈগল তার পাখা খুলে রাখলো···ঠোঁট দুটো খুললো...এবং···

দেখতে দেখতে কোথায় গেল তার পাখীর চেহারা! সে হলো দিব্যি সুপুরুষ জোয়ান সুন্দর... যেন রাজপুত্র!

তারপর সেই নীল পুরীতে বেশিল এক মাস রইলেন। কত আদর, কত হাসি গল্প—আর রকমারি খাওয়া।

একমাস পরে বেশিল বললেন ঈগলকে—অনেকদিন বাড়ী-ছাড়া হয়ে আছি ঈগল···বাড়ীতে আমার জমিদার্নী-বৌ ভাবছে···তাছাড়া তালুক-মুলুক···এবারে না ফিরলে নয়!

ঈগল বললে—বেশ, তাহলে কালই আপনার ফেরবার ব্যবস্থা করি। সেই সঙ্গে আমাকে যে প্রাণে মারেননি, পালন করেছেন, সে-ঋণ শোধ করবো।

পরের দিন সকাল হলে ঈগল বললে—পাহাড়ের নীচে সুমুদ্দুরের ঘাটে জাহাজ দেখবেন। সেই জাহাজে করে আপনি বাড়ী যাবেন। জাহাজে আমি বড় বড় দুটো তোরঙ্গ দিয়েছি···একটা লাল আর একটা সবুজ। পথে খবর্দ্দার, ও তোরঙ্গ দুটো খুলবেন না। বাড়ীতে পৌঁছে তারপর লাল তোরঙ্গ খুলবেন আপনার গোলা-বাড়ীর উঠোনে, আর সবুজটা খুলবেন বসত-বাড়ীর উঠোনে। এ-কথার নড়চড় না হয়···খুব হুঁশিয়ার!

ঈগলের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈগলের মা আর ছোটবোনকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেশিল এসে সুমুদ্দুরের ঘাটে জাহাজে চড়লেন। জাহাজ জলে ভাসলো।

মস্ত-বড় জাহাজ। জাহাজে মাঝিমাল্লা আছে, কিন্তু তারা যেন কলের পুতুল! জাহাজে খাবার-দাবার অনেক···বকমারি সরবৎ···রকমারি মদের বোতলে জাহাজ ভরতি। জাহাজ চললো দিব্যি ফুরফুরে বাতাসে...জাহাজ ঘিরে সুমুদ্দুরের নানা পাখী নানা সুরে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে···

জাহাজ চলেছে দিনের পর দিন···মাসের পর মাস। ছ-মাস জাহাজে কাটলো। ওদিকে খাবার-দাবার এলো ফুরিয়ে। যেমন ফুরোনো, জাহাজ থামলো সুমুদ্দুরের বুকে ছোট একটা দ্বীপে। সে দ্বীপে ফলে-ফলে ফলন্ত কত গাছ···যত রকমের ফল দুনিয়ায় ফলে! আর অজস্র মাছ···পাখী...

জাহাজ থেকে নেমে বেশিল অনেক ফল জোগাড় করলেন···মাছে মাছে জাহাজের খোল ফেললেন ভরিয়ে... মুর্গী ধরলেন, হাঁস ধরলেন ··তিতির পাখী ধরলেন···অজস্র।

জাহাজে রশদ ভর্ত্তি করে বেশিলের মনে লোভ হলো, এখনো কতকাল লাগবে বাড়ী পৌঁছুতে—একবার তোরঙ্গ দুটো খুলে দেখলে হয়, কি আছে ও দুটোর মধ্যে! ঈগল বারণ করেছে কতবার··· তা হোক্, ছমাস কেটে গেছে...এখন সে বারণ যদি না শুনি, কি আর হবে!

এই ভেবে তিনি দ্বীপে নামালেন লাল তোরঙ্গ···হাতুড়ির ঘা মেরে ভাঙ্গলেন তোরঙ্গর চাবি ···তারপর তুললেন ডালা। যেমন ডালা তোলা, অমনি সেই তোরঙ্গর ভিতর থেকে পিল-পিল করে বেরুতে লাগলো···ঝর্ণায় যেমন জল ঝরে, ঠিক যেন তেমনি···রাজ্যের জন্তু-জানোয়ার···গোরু মোষ ভেড়া ছাগল শূয়োর। তার আর বিরাম নেই···হাজার হাজার লাখে লাখে বেরুচ্ছে! বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই!

ছোট দ্বীপ ভরে গেল সে সব জন্তু-জানোয়ারে···তবু বেরুচ্ছে···তবু···তবু···তবু। দ্বীপে আর ধরে না···ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে কতক জলে পড়ে ভেসে চললো, কতক হাবুডুবু খেয়ে মলো...

দেখে বেশিলের চক্ষুস্থির ! ঐ তো তোরঙ্গ ! ওর মধ্যে এত ধরেছিল কি করে ? হায়-হায় করতে লাগলেন তিনি। এত জন্তু কি করে নিয়ে যাবেন ? এইখানেই ফেলে যেতে হবে ?...

ভেবে তিনি গলদঘর্ম্ম...এমন সময় সুমুদ্দুর উঠলো গর্জ্জন করে...বড় বড় ঢেউ তালগাছের সমান উঁচু...ডাঙ্গায় এসে পড়তে লাগলো ! সর্ব্বনাশ ! বন্যা এলো বুঝি ! বেশিল জাহাজে উঠে পড়লেন...তোরঙ্গ টানলেন...তোরঙ্গ থেকে তখনো বেরুচ্ছে পিল-পিল করে গোরু বাছুর ছাগল ভেড়ার পাল...

উপায় ? উপায় ? বেশিল তাকাচ্ছেন চারদিকে...হঠাৎ দেখেন, ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো সবুজ রঙের এক মানুষ...তার মাথায় লাল পলার মুকুট।...

সবুজ মানুষ বললে—আমি হলুম জলের রাজা। তোমার বিপদ দেখে এসেছি। তোমার এই সব জন্তু-জানোয়ারকে ঐ লাল তোরঙ্গে পুরে দিতে পারি আমি...জানো ?

হাত জোড় করে বেশিল বললেন—দয়া করে তাহলে যদি...

—হুঁ ! জলের রাজা বললেন—কিন্তু আমি এ-কাজ করলে আমাকে তুমি কি দেবে, শুনি ?

—বলুন, আপনি কি চান ?

জলের রাজা বললেন—তুমি বাড়ী গিয়ে যে-জিনিষ তোমার বাড়ীতে আছে বলে তুমি জানো না...আগে কখনো তুমি চোখে দ্যাখোনি...সেই জিনিষ আমাকে দেবে, কথা দাও। তাহলে আমি এদের সবগুলোকে আবার তোমার তোরঙ্গে ভরে দেবো।

কি এমন জিনিষ...যা আছে বলে জানিনা...বেশিল ভেবে ঠাওরাতে পারলেন না। বললেন, —বেশ...কথা দিচ্ছি, সেই জিনিষই আমি দেবো !

—এ কথা রেখো মোদ্দা ! বলে জলের রাজা দিলেন একটা শাঁখ ধরে তাতে ফুঁ ! দেখতে দেখতে যত গরু বাছুর মোষ ভেড়াগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে এসে তোরঙ্গর মধ্যে ঢুকলো...চক্ষের পলকে দ্বীপ হলো খালি !

তোরঙ্গর ডালা বন্ধ করে বেশিল বললেন—নমস্কার !

—নমস্কার ! মনে রেখো মানুষ, যে-কথা দিয়ে গেলে সুমুদ্দুরের ধারে...

—নিশ্চয় !

তারপর বেশিলের জাহাজ এসে নোঙর করলো পুরীর ঘাটে। খবর পেয়ে লোক-লস্করের সঙ্গে জমিদার্নী এলেন ছুটে। জমিদানীর কোলে খোকা...ছ মাস হলো খোকা হয়েছে...জমিদার্নী খুশী-মনে খোকা দেখাবেন বলে তাকে কোলে করে এনেছেন।

জমিদার নামলেন জাহাজ থেকে ! জমিদার্নীর কোলে খোকা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ খোকা ?

জমিদার্নী বললেন—ছ মাস হলো হয়েছে। কোথায় তুমি আছো জানিনা...তাই খবর পাঠাতে পারিনি !

খোকা দেখে জমিদারের আহ্লাদ হবে কি.. মন হলো দুশ্চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন! কথা দিয়ে এসেছেন জলের রাজাকে···বাড়ী ফিরে যে জিনিষ বাড়ীতে আছে বলে জানেন না, এসে দেখবেন, সেই জিনিষ তাকে দিতে হবে!...

জমিদার্নী অবাক! এমন সোনার চাঁদ খোকা···দেখে আনন্দ করবেন, না, জমিদারের মুখ এমন গোমড়া!

জমিদার্নী তুললেন হুঙ্কার—তোমার কি সবই বিশ্রী? ঈগলের জন্য ফতুর হতে পারো যেমন, তেমনি ছেলের মুখ দেখে আনন্দ নেই!···ঈগলের বাচ্চার জন্য শোক হলো বুঝি?

নিশ্বাস ফেলে বেশিল বললেন—না; না, তুমি বুঝচো না···মানে, বড্ড ক্লান্ত হয়েছি কিনা! তা দাও, খোকাকে কোলে নি, নিয়ে চুমু খাই!

জমিদার্নীকে বলতে পারলেন না, কি সর্ব্বনেশে কথা দিয়ে এসেছেন পথে আসবার সময় জলের রাজার কাছে! খোকা হয়েছে···তিনি কত মাস পরে বাড়ী ফিরেছেন...কতখানি আনন্দ! সব আনন্দ সে কথায় উবে যাবে!

নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—চলো, কত কি দেখেছি, শুনেছি···গল্প বলবো!···

বিশ্রাম করে' বেশিল বললেন তাঁর বেড়ানোর বৃত্তান্ত···কত নদ নদী···সহর···কত বন পাহাড় ...আকাশের বুক বেয়ে উড়ে যাওয়ার আনন্দ...তারপর ঈগলের আদর-যত্ন...বড় বোন আর মেজো বোন বেশিলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল বলে' তাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে মেরে ধরে' কি শাস্তিই না দেছে! তারপর ঈগলের মা···ঈগলের ছোট বোন···তাদের আদর ভালোবাসা···নিত্য নতুন নতুন খাবার খাওয়ানো···আসবার সময় ঈগল কি জিনিষই না দেছে! ঈগল দু-দুটো তোরঙ্গ দেছে···রাজার ঐশ্বর্য্য···একটা লাল তোরঙ্গ···আর একটা সবুজ···

এই অবধি বলে জমিদার বললেন জমিদার্নীকে—এসো গো...কী মজাই না দেখবে তোরঙ্গ খুললে!

—কী? কী?...বলতে বলতে জমিদার্নী উঠলেন। তাঁকে নিয়ে বেশিল এলেন গোলাবাড়ীর উঠোনে···চাকরদের বললেন—যে লাল তোরঙ্গ এনেছি, সেটা নিয়ে আয়!

চাকররা লাল তোরঙ্গ নিয়ে এলো। চাকরদের বেশিল বললেন—যে যেখানে আছে, সব ডাক্... আর গোলাবাড়ীর সব ফটক দে বন্ধ করে'।

তারা তাই করলো। বেশিল বললেন—সকলে দাওয়ায় ওঠো...খবর্দ্দার, নীচে থেকো না···নীচে থাকলে ঠাশুনির চাপে মারা যাবে!

কি ব্যাপার, সকলে একেবারে অবাক! মনিবের কথায় সকলে উঠলো উঁচু রোয়াকে।

জমিদার্নী উঠলেন গোলাবাড়ীর ছাদে তাঁর দাসীদের নিয়ে—বেশিল তখন খুললেন লাল তোরঙ্গর ডালা···ডালা খুলতেই পিলপিল করে বেরুতে লাগলো তোরঙ্গর ভিতর থেকে গোরু বাছুর, মোষ, ভেড়া ছাগল মুর্গী হাঁস···একেবারে লাখে লাখে···খোট্টাদের খাটিয়া ঠুকলে যেমন ছারপোকা

ঝরে পড়ে…লাল তোরঙ্গর ডালা বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তেমনি তারা পড়তে লাগলো। পড়ার বিরাম নেই! গোলাবাড়ীর যত দালান গেল ভরে…গোলাবাড়ীর লাগাও বিশ-বাইশ বিঘে বাগান—সে বাগান একেবারে গোরু বাছুরে'মোষে ভেড়ায় হাঁস-মুর্গীতে থই-থই করতে লাগলো…

জমিদার্নী বললেন—ডালা বন্ধ করো, বন্ধ করো…এদিকটা ভরে' গেল যে! শেষে বাড়ীর ঘর-দোর থইথই করতে থাকবে। আমরা দাঁড়াবো কোথায়? তার উপর এদের দেখাশোনা করা …খাওয়ানো…

জমিদার বললেন—বেশ, যা পেয়েছি, তাই নিয়ে এখন থাকা যাক। …পরে যখনি দরকার হবে…

জমিদার্নী বললেন—হ্যাঁ। মানুষ এত গোরু বাছুর ঘরে রাখে? ব্যবসা করো…হাটে পাঠাও… বেচে অনেক টাকা হবে।

জমিদার্নীর কথায় বেশিল করলেন লাল তোরঙ্গর ডালা বন্ধ…চাকর-বাকরদের বললেন—এগুলোর অন্য ব্যবস্থা করতে হবে না…শুধু ঘাস জল দে এখন। তার পর বাগানে চরে বেড়াবে।

জমিদার্নী বললেন—সবুজ তোরঙ্গ থেকে কি বেরুবে গো?

বেশিল বললেন—সবুজ তোরঙ্গর ডালা খুলবো আমাদের বার-বাড়ীর উঠোনে…এসো, দেখবে…

চললো সকলে ছুটে বার-বাড়ীর দিকে…বেশিল খুললেন সবুজ তোরঙ্গর ডালা।…ডালা যেমন খোলা, অমনি তোরঙ্গর মধ্য থেকে খই ফোটার মতো চিড়বিড় করে ছিটকে বেরুতে লাগলো লক্ষ লক্ষ গাছ-গাছড়ার বীজ! বীজগুলো মাটীতে পড়ে ঠিক পিঁপড়ের দল যেমন লাইন-বন্দী এগিয়ে চলে, তেমনি চললো সেগুলো এগিয়ে। এমনি এগুতে এগুতে বার-বাড়ীর সামনে যত খোলা জায়গা ছিল, খেলার যে মাঠ ছিল…সব একেবারে বীজে ভর্ত্তি। আর সে সব বীজ থেকে পটপট করে গাছ উঠতে লাগলো গজিয়ে ডালপালা মেলে! ডালে ডালে রকমারি ফল…রকমারি ফুল …যেন ম্যাজিক হচ্ছে!

জমিদার্নী চীৎকার করে উঠলেন—ডালা বন্ধ করো গো, না হলে মাটীতে আর ঠাঁই নেই… শেষে লোকজনের মাথায় বীজ পড়ে গাছ বেরুবে কি?

বেশিল বন্ধ করলেন সবুজ তোরঙ্গর ডালা।

জমিদার্নী বললেন—তোমার ঈগল-পাখীকে খুব ভালো বলতে হবে।…প্রাণ বাঁচালে মানুষ এমন করে না…ও একটা পাখী!

জমিদার বললেন—হুঁ! ওকে যত্ন করতুম বলে তুমি তখন রণচণ্ডী হয়ে আমাকে ধমকাতে!

হেসে জমিদার্নী বললেন—পাখীর জন্য তুমি সব খোয়াচ্ছিলে, তাই…

জমিদার বললেন—এখন দেখলে তো, যা খুয়িয়ে ছিলুম, তার কতগুণ ঈগল আদায় দিয়ে দিলে!

—হুঁ…জমিদার্নী বললেন—খুব ভালো তোমার ঈগল! সত্যি…

থোকা…ধন দৌলত…ফলাও কারবার দেখে রাশিয়ার রাজা বললেন—বাহাদুর বটে বেশিল!…

আমরা রাজত্ব করেও কিছু করতে পারলুম না! আর ও সামান্য জমিদার হয়ে কি ঐশ্বর্য্যই না করেছে!...

এত সুখ...এত আনন্দ···তার মাঝে বেশিল ভুলে গেছেন জলের রাজার কাছে যে সত্যপণ করে এসেছেন, সেই সত্যপণের কথা!...তাঁর একটি মেয়েও হয়েছে। ছেলের নাম রেখেছেন আলেকসিশ! লেখায়-পড়ায় খেলায়-ধূলায় মায়ায়-মমতায় রূপে-গুণে আলেকসিশ...সকলের নয়নের মণি!

ক্রমে আলেকসিশে বড় হলো···বয়স আঠারো বছর। জন্ম-দিনে বেশিল উৎসবের আয়োজন করলেন। খাওয়ানো-দাওয়ানো দান-ধ্যান...তালুক-মুলুকের সকলে এসে জয়-জয় করে গেল···

পরের দিন বেশিল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুলেন···সহর ছেড়ে বন পার হয়ে সুমুদ্দুরের ধারে এলেন। চলেছেন···চলেছেন সুমুদ্দুরের ধারে-ধারে···হঠাৎ সুমুদ্দুরের বুক উঠলো দুলে···সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেউ কেঁপে ফুলে উঠলো তাল গাছের মতো উঁচু হয়ে! আর সেই ঢেউয়ের উপর বসে বেশিলের সামনে এসে দাঁড়ালো জলের রাজা···মাথায় শ্যাওলার তৈরী মুকুট...মুকুটে বড়-বড় মুক্তো ঝক্‌ঝক করছে...রাজার মুখে এত-বড় সবুজ দাড়ি...

রাজা বললে—কি গো জমিদার বেশিল...স্মরণশক্তি বোধ হয় খুইয়ে ফেলেছো!

বেশিলের বুকখানা ধ্বক্‌ করে উঠলো···মাথার মধ্যে রক্তর ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ...মুখ হলো ফ্যাকাশেপানা···

জলের রাজা বললে—আর কিছু নয়। দেখলুম তোমাকে আঠারো বছর পরে সুমুদ্দুরের ধারে ···তাই শুধু কথাটা মনে করিয়ে দিতে এসেছিলুম।

এইটুকু বলে উঁচু ঢেউটাকে ধরে জলের বুকে টেনে এনে জলের নীচে রাজা গেল তলিয়ে মিশে।

বেশিলের প্রাণ যেন উড়ে গেল! বুকের মধ্যে কামানের গোলা ফাটছে যেন!···চোখের সামনে পৃথিবী গেল মিলিয়ে...শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া!

মলিন মুখে তিনি বাড়ী ফিরলেন···ঘোড়া থেকে নেমে জমিদার্নীর কাছে গেলেন···তাঁকে সব কথা বললেন।

শুনে জমিদার্নী প্রথমে অজ্ঞান···তারপর তাঁর দুচোখে নামলো ঝর্ণা...বেশিল চুপ করে বসে ···কে যেন মন্ত্র পড়ে তাঁকে পাথর করে দেছে!

আলেকসিশ ফিরলো বেড়িয়ে···মা-বাপকে দেখে অবাক হয়ে বললে—কি হয়েছে বাবা? কি হয়েছে মা?

কোনোমতে বেশিল বললেন বিপদের কথা।

শুনে আলেকসিশ বললে—কেঁদোনা বাবা, কেঁদোনা মা। বাবা যখন সত্যপণ করে এসেছেন, তখন সে সত্য আমি রক্ষা করবো।

মা বললেন—তার মানে বুঝছিস বাবা? তোকে জন্মের মতো হারাবো আমরা।

হেসে আলেকসিশ বললে—আমি মানুষ···লেখাপড়া শিখেছি...বুদ্ধি শুদ্ধি আছে...জলের রাজা সাত সুমুদ্দুর যত তোলপাড় করুক···মানুষের বুদ্ধির চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী হবে না।

বেশিল বললেন—কিন্তু সে মন্ত্র-তন্ত্র জানে···তার উপর-তার কত শক্তি!

আলেকসিশ বললে—গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোর ঢের বেশী বাবা। তোমরা ভেবোনা··· আমি বাবার সত্য রক্ষা করতে যাবো···তবে যাতে ফিরে আসতে পারি, সে চেষ্টা করবোই!...

পরের দিন ভোর হবার আগেই আলেকসিশ বেরুলো ঘোড়ায় চড়ে। দুচোখে জল...মা-বাপ দাঁড়িয়ে দেখলেন, পথের বাকে আলেকসিশের ঘোড়া আলেকসিশকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

সহর ছেড়ে···জঙ্গলে ঢুকলো আলেকসিশ। এই জঙ্গলের পরেই সুমুদ্দুর। জঙ্গলে ঢুকতে আলেকসিশের মন হলো যেন ভারী পাথর! মনের ভার হালকা করবার জন্য ঘোড়াকে কদম-চালে চালিয়ে সে এগুতে লাগলো...শীষ দিতে দিতে...

বড় একটা ক্ষীর গাছের মটকার উপর বসেছিল ঈগল পাখী। সে এলো নেমে আলেকসিশের সামনে। বললে—কি গো ছোকরা...এদিকে তো শীষ দিচ্ছ! কিন্তু মনে তো ফুর্ত্তি দেখছি না তোমার!

ঈগলের কথা শুনে আলেকসিশ আশ্চর্য্য হলো! বললে—মনে ফুর্ত্তি না থাকার কারণ আছে ঈগল।

—কি কারণ, শুনতে পাই না?

আলেকসিশ তখন বললে বাবার পণের কথা।

ঈগল বললে,—শোনো,···আমি যে কথা বলবো, মানবে? মানলে ভালো হবে তোমার·· কোনো অনিষ্ট হবে না।

আলেকসিশ বললে—কেন মানবো না তোমার কথা?

—তাহলে শোনো, যা বলি। ঈগল বললে—জঙ্গল পার হয়েই দেখবে সুমুদ্দুরের ধারে মস্ত এক পাহাড়। দেখবে সেই পাহাড়ে বসে রোদ পোহাচ্ছে বারোটি ঈগল পাখী। তারা যেন তোমাকে না দেখতে পায়···তুমি তাদের নজর এড়িয়ে থাকবে! তার পর রোদ বাড়লে ওরা পাখীর খোলশ ছেড়ে বারোটি রূপসী কন্যা হবে···এগারো জনের মাথায় দেখবে পলার মুকুট, আর একজনের মাথায় শুধু মুক্তোর মুকুট। রূপসী কন্যা হয়ে ওরা পাহাড়ের কোলে ওদের কাপড়-চোপড় রেখে জলে নামবে স্নান করতে।...স্নানে ভেসে ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় বুকে-বুকে ভাসবে···হাসবে-নাচবে...গাইবে... খেলা করবে। সেই তক্কে চুপি-চুপি তাদের মধ্যে যে কন্যার মাথায় মুক্তোর মুকুট···তার কাপড় চোপড় তুমি সরিয়ে রেখো। তারপর সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা জল ছেড়ে পাহাড়ের কোলে এসে উঠবে, কাপড় চোপড় পরে ঈগল হয়ে ফেরবার জন্য।···ওরা হলো জলের রাজার বারো মেয়ে...যার মাথায় মুক্তোর মুকুট, ও সবার বড়।···কাপড়-চোপড়ের জন্য সে যখন কাকুতি-মিনতি করবে,

তখন তাকে তার কাপড়-চোপড় দিয়ে দিয়ো—তাহলে জলপুরীতে তোমাকে প্রতিপদে সে সাহায্য করবে। তার সাহায্যে তোমার খুব কাজ হবে।...বুঝলে! পারবে আমার এ কথা মানতে?

খুশী-মনে আলেকশিস বললে—নিশ্চয়...

ঈগল বললে—আর এক কথা...

—বলো।

ঈগল বললে—বড় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করো, কোথায় গেলে জলের রাজার দেখা পাবে। সে ঠিক বলে দেবে। তারপর সেখানে যেতে যেতে পথে দেখা হবে তিনজন বাঁটুলের সঙ্গে। তারা তোমার সঙ্গে যেতে চাইবে তোমার নফর হয়ে। তাদের সঙ্গে নিয়ো...তারা তোমার কাজে লাগবে...বুঝলে! সে তিনজন বাঁটুলের একজনের নাম খান্তি—একজনের নাম পান্তি—আর একজনের নাম জুড়োন্তি। মনে রেখো।

—মনে রাখবো। আলেকসিশ বললে—কিন্তু তুমি আমার এত উপকার করলে ঈগল...

হেসে ঈগল বললে—তার মানে আছে...তোমার বাবা এককালে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন... সে ঋণ যতটুকু শোধ করতে পারি, তাই। বুঝলে?

এ-কথা বলে ডানা মেলে ঈগল গেল আকাশে উড়ে...আলেকসিশ চেয়ে দেখলো...আকাশের অনেক উঁচুতে অত বড় ঐ ঈগল...হয়ে গেল ছোট একটু ফুটকি!

সে চললো সমুদ্দুরের ধারে। জঙ্গল পার হতেই চোখে পড়লো পাহাড়...আর ঈগল যা বলেছে, পাহাড়ের বুকে বসে বারোটি ঈগল পাখী রোদ পোহাচ্ছে।...পাহাড়ের এদিকে একটা বড় ঝোপ...ঝোপের আড়ালে আলেকসিশ দাঁড়ালো...নিজেকে লুকিয়ে ...ওদের উপর নজর রেখে।

রোদ পড়ে এলো...আলেকসিশ দেখে, পাখীর খোলশ ছেড়ে ওরা হলো অপরূপ রূপসী বারোটি কন্যা! আর ঈগল যা বলেছে, ওদের এগারো জনের মাথায় পলার মুকুট, শুধু একজনের মাথায় মুক্তোর মুকুট। আলেকসিশ তার উপর রাখলো নজর।

বারো কন্যা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখলো পাহাড়ের কোলে...রেখে জলে নামলো। আলেকসিশ চুপি-চুপি ওদের নজর বাচিয়ে এসে মুক্তোর মুকুটপরা কন্যার কাপড়-চোপড় নিয়ে ঝোপের পিছনে রইলো সরে।

কন্যারা ঢেউয়ে ঢেউয়ে নেচে খেলে হেসে গেয়ে কাটালো অনেকক্ষণ...তারপর সমুদ্দুরের জলে লাল আবীর ছড়িয়ে সূর্য্য গেল অস্তগিরির পারে...কন্যারা জল থেকে উঠলো। এগারো কন্যা কাপড়-চোপড় পরে আবার হলো এগরোটি ঈগল। বড় কন্যা কাপড়-চোপড় পান না...ভয়ে আকুল... চারদিকে খুঁজছেন...তখন আলেকসিশ এলো সামনে...তার হাতে বড় কন্যার কাপড়-চোপড়। মাথার সোনালি চুল মেলে সারা গা ঢেকে বড় কন্যা কাপড় খুঁজছিলেন...আলেকসিশের হাতে কাপড় দেখে কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি জানালেন—ওগো, দাও আমার কাপড়...রাত হয়ে যাবে...আমি পুরীতে ফিরতে পারবো না।...

আলেকসিশের মন গেল গলে...তখনি সে দিলে বড় কন্যাকে তার কাপড়-চোপড়...

কাপড় পরে বড় কন্যা বললে—এধারে কোথায় চলেছো তুমি?

আলেকসিশ বললে তার কাহিনী। শুনে বড় কন্যা বললে—ও...তুমি সেই জমিদারের ছেলে! তোমার জন্য বাবা আজ আঠারো বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে। বাবা আছে সুমুদ্দুরের ঐ বাঁক পার হয়ে যে সাদা বালির চর...সেই চরে।...তোমার উপর মেজাজ চটা। তা হোক, বাবার সঙ্গে পুরীতে যেয়ো...কোনো ভয় নেই! আমি আছি...তোমাকে দেখবো।

এ কথা বলে ঈগলের রূপ ধরে এগারো বোন ঈগলের সঙ্গে বড় কন্যা উড়ে সুমুদ্দুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো!...আলেকসিশ দাঁড়িয়ে দেখলো। মনে হলো, জলে যেন পদ্মফুলের রঙ ফুটলো!

বড় কন্যার রূপে মন তার ভরে আছে...নীল দুটি চোখে আনন্দের দীপ্তি!...ঐ বড় কন্যা যদি কাছে থাকে, তাহলে সুমুদ্দুরে থাকতে তার কোনো কষ্ট হবে না!

সূর্য্য পাটে বসেছে...সন্ধ্যা হয়েছে...আকাশ-ভবা চাঁদের আলো...নীচেটা সে আলোয় আলো হয়ে আছে। আলেকসিশ চললো ঘোড়ায় চড়ে সুমুদ্দুরের বাঁকের দিকে সেইখানে...যেখানে বড় কন্যা বলেছে, জলের রাজা তার অপেক্ষায় বসে আছে।

যেতে যেতে আবার বন জঙ্গল... জঙ্গলে ঢুকবে...এমন সময় দেখা তিনজন বাঁটুলের সঙ্গে। বাঁটুলরা বললে—কোথায় চলেছো...এ পথে?

কথাটা আলেকসিশ প্রথমে শুনতে পায়নি, তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল...হঠাৎ মনে পড়লো ঈগল পাখীর কথা। ঈগল পাখী বলেছে, তিনজন বেঁটে মানুষেব সঙ্গে দেখা হবে...তাদের সঙ্গী করে নিয়ো। তখনি ফিরলো। ফিরে বললে—ও...আমি যাচ্ছি জলের রাজার কাছে... আমার বাবা তাঁকে কথা দিয়েছিলেন কি না!

তারা বললে—আমাদের সঙ্গে নাও...তোমার নফর করে। নাহলে ভালো দেখাবে না। এত বড় জমিদারের ছেলে ... একা এসেছো...চাকর-বাকর নেই সঙ্গে!

আলেকসিশ বললে—বেশ...এসো তোমরা সঙ্গে।...তোমাদের নাম?

তারা নাম বললে। একজনের নাম খান্তি, একজনের নাম পান্তি, আর একজনের নাম জুড়োন্তি!...ঠিক! এরাই তাহলে। ঈগল এই নামই বলে দিয়েছে!

তারপর চারজনে সুমুদ্দুরের বাঁকে এসে দেখে, বাঁকের মুখে সাদা বালির চরে...চর ঘেঁষে জলে ভাসছে ঝিনুকের তৈরী প্রকাণ্ড রথ...রথে জোতা চারটে সাদা রঙের হাঙর!

আলেকসিশকে দেখে রাজা বললে—এই যে...এসেছো এতকাল পরে! আঠারো বছর ধরে তোমার জন্য রোজ এখানে রথ নিয়ে বসে থাকি! মেজাজ আমার বিগড়ে যা দেছো...ওঃ। তা এ তিনটি বাঁটুল...এরা?

আলেকসিশ বললে—আমার তিন চাকর। একা আসতে পারি না তো...এরা আমার কাজকর্ম্ম করবে...ফরমাশ খাটবে।

—হুঁ...তাহলে আর দেরী নয়, এসো, রথে ওঠো...পুরীতে যাবো।

বাঁটুল তিনজনকে নিয়ে আলেকসিশ উঠলো রাজার সঙ্গে মকর-টানা রথে। রথ চললো সুমুদ্দুরের মাঝখানে…তারপর টুপ্ করে ডুবলো জলের অতল তলে !…

জলের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! আলেকসিশ বেশ ভালো লেখাপড়া শিখেছে…ভূগোল পড়েছে…তবু সুমুদ্দুর এত বেশী গভীর, তা সে স্বপ্নেও কখনো ভাবেনি !…রথ চলেছে নেমে…নেমে আরো নীচে নেমে…আর রথের আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে বড় বড় তিমি…বড় বড় কচ্ছপ.. মাছ …কুমীর…হাঙ্গর…শুশুক…জলহস্তী ! মাছের আর সংখ্যা নেই…ছোট বড় মাঝারি…এক একটা মাছ প্রায় জাহাজের মতো বড় !…তারপর, পলার ঝোপ ঝাড়…রাশ রাশ মুক্তো…মুক্তোর বাজার বসেছে যেন !…নেমে নেমে রথ এসে দাঁড়ালো একেবারে সব নীচের তলায় ! ..সেখানে ঝিনুক পলা দিয়ে তৈরী প্রকাণ্ড পুরী…পুরীর দেওয়ালে ছোট বড় মুক্তো আঁটা…পলার পাহাড়…পলার বাগান… দেখে আলেকসিশের চোখ গেল জুড়িয়ে।

পুরীর ফটকে নেমে রাজা বললেন আলেকসিশকে—চলো পুরীর মধ্যে !

পুরী প্রবেশ হলো।…ঘরদোর দেখিয়ে রাজা বললে আলেকসিশকে—তোমার বাবা যদি আঠারো বৃছর আগে এখানে পাঠাতো—তাহলে কি আদর-অভ্যর্থনাই না হতো তোমার! এত দেরীতে পাঠানোর জন্য তোমার বাবা যে অন্যায় করেছে, তার সাজা তোমাকে পেতে হবে !…বুঝলে ?

রাজার কথা শুনে আলেকসিশ তাকালো রাজার পানে…হতভম্বের মতো !

রাজা বললে—খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে না। খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর আমার ফরমাশ হচ্ছে…এখানে ঐ যে ফটিকের পাহাড় দেখছো…সেই ফটিক দিয়ে একটা পুল তৈরী করতে হবে তোমাকে ..পাহাড় থেকে আমার পুরীর ছাদ পর্য্যন্ত…আজকের রাতের মধ্যে। কাল সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ফটিকের পুল যদি আমি না দেখি, তাহলে তোমার গর্দ্দানা যাবে !

এ-কথা বলে রাজা গেল চলে। ঘরে আলেকসিশ একা…বুকের উপর যেন পাহাড় চেপে বসলো তার। খাবার-দাবার এলো ..রাজভোগ…কিন্তু মুখে রুচলো না। ভোরেই গর্দ্দানা যাবে নিশ্চয়… এক রাত্রে ফটিকের পুল তৈরী করতে কেউ পারে কখনো ? আলেকসিশের দুচোখ জলে ভরে উঠলো !…

রাত বেড়ে পুরী নিশুতি হলো। মাথাব উপর ঢেউগুলো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে… আলেকসিশের চোখে ঘুম নেই…শুধু জলের ঝর্ণা ঝরছে…এমন সময় পা টিপে-টিপে ঘরে এসে দাঁড়ালো মাথায় মুক্তোর মুকুট-আঁটা সেই বড় কন্যা।

বড় কন্যা বললে—কাঁদছো কেন ?

আলেকসিশ বললে খুলে তার কান্নার কারণ। শুনে বড় কন্যা বললে—খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে পালঙ্কে শুয়ে তুমি ঘুমোও, মানুষ…আমি তোমার পুল তৈরী করিয়ে রাখবো !…তোমার কোনো ভাবনা নেই।

বড় কন্যার কথায় আলেকসিশ খাওয়া-দাওয়া সেরে পালঙ্কে শুলো…শোবা মাত্র ঘুম।

বড় কন্যা ওদিকে পুরী থেকে বেরুলো…বেরিয়ে শীষ দিলে। তার সে শীষ শুনে হাজার হাজার

কুলি-মজুর ছুতোর রাজমিস্ত্রী এলো ছুটে···যন্ত্রপাতি হাতে। এরা সব কোন্ কালে সমুদ্দুরে ডুবে মরে ছিল...বড় কন্যা তাদের দিলে হুকুম। তারা তখনি কাজে লাগলো।

ভোর হতে না হতে বড় কন্যা এলো আলেকসিশের ঘরে। নাড়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বড় কন্যা বললে—ওঠো, ওঠো, দেখো গিয়ে···তোমার ফটিকের পুল তৈরী হয়ে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে আলেকসিশ এসে দেখে—বাঃ···চমৎকার পুল! পাহাড় থেকে পুরীর ছাদ পর্য্যন্ত টানা···ঝকঝক করছে।

বড় কন্যা বললে—আমি যাই···তুমি এইখানে থাকো···আমার বাবা এখনি পুল দেখতে আসবে।···

বড় কন্যা চলে গেল। জলের রাজা এলো···সঙ্গে পাত্রমিত্র সভাসদের দল। পুল দেখে রাজা কটমট করে তাকালো আলেকসিশেব দিকে!—মনে ভয়ানক আক্রোশ···মানুষের ছেলে···এমন সে বাহাদুর!···কিন্তু মনের রাগ মনে চেপে রাজা বললে,—মিস্ত্রীর বিদ্যে তাহলে তুমি শিখেছো বটে! ভালো! ভালো! এখন দেখতে চাই, বাগ-বাগিচার-বিদ্যে কেমন জানো!···আঠারো বছর যে দেরী করেছো···এ আঠারো বছর নষ্ট করেছো, না, ক'বছরে সব কাজে পোক্ত হয়েছো, আমি দেখতে চাই!···শোনো, আমার পুরীর চারদিকে শুধু পলার ঝাড় পলার জঙ্গল···দেখে দেখে চোখ আমার পচে গেল! আমি চাই—ঐ পলার জঙ্গল সাফ করে বরাবর টানা···লম্বে-প্রস্থে...ফুলের বাগান বানিয়ে দিতে হবে···আজ রাত্রের মধ্যে। কাল সকালে উঠে আমি যেন দেখি, পলার ঝাড়, পলার জঙ্গলের চিহ্ন নেই···ওখানে হয়েছে মস্ত বাগান। আর সে বাগানে ফুটেছে রকমারি ফুল···সে সব ফুলের যেমন রঙ, তেমনি গন্ধ!···এ যদি না পারো, গর্দ্দানা নেবো।

রাজা গেল চলে পাত্রমিত্রদের নিয়ে!···আলেকশিস এলো নিজের ঘরে···সারা দিন কাটলো ভয়ানক দুশ্চিন্তায়। তারপর সন্ধ্যা হলো···সন্ধ্যার পর রাত···সে রাত আবার নিশুতি হলো। ···আলেকসিশের দুচোখে জলের ঝর্ণা ঝরছে···বড় কন্যা আবার এলো···কান্নার কারণ শুনলো! শুনে বড় কন্যা বললে—খেয়ে-দেয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও গে···আমি তোমার বাগান তৈরী করিয়ে রাখবো।

পরের দিন সকালে উঠে রাজা দেখে, পলার ঝোপ পলার জঙ্গল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে···আর পুরীর চারিদিক ঘিরে ফুলে ফুলে ফুলন্ত মস্ত বাগান!

রাজার আক্রোশ বাড়লো। কিন্তু মনের সে-আক্রোশ চেপে রাজা বললে—ভালো, ভালো··· বাগানের কাজও শিখেছো, দেখছি! তাহলে আর দুঃখ নেই···আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো···দিয়ে তোমাকে করবো জামাই!...

এ কথা শুনে আলেকসিশ অবাক! গর্দ্দানার বদলে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে!...অবাক হয়ে সে চেয়ে রইলো রাজার পানে।

রাজা বললে—শোনো, আমার একটি নয়, দুটি নয়···বারোটি মেয়ে! ওদের মধ্যে যে বড়···তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। আজ জিরোও গে। কাল সকালে আমার দরবারে বারো মেয়ে হাজির থাকবে···বড় মেয়ে কে, তোমাকে তিনবার বেছে বার করে দিতে হবে...বারো মেয়ে সার-বন্দী দাঁড়াবে···সেই বারোজনের মধ্যে থেকে। যদি ভুল করো···গর্দ্দানা যাবে।

কথা শুনে আলেকসিশের চক্ষুস্থির!···বারো কন্যাকেই আলেকসিশ দেখেছে···দেখতে এক রকম··মুখ চোখ চেহারা···কোনো তফাৎ নেই! কাজেই কি করে সে বেছে নেবে? পারবে না নিশ্চয়! তাও তিন-তিনবার বাছা···ভুল হবে আর ভুল হলেই গর্দ্দানা!···

রাত্রে আবার তার দুচোখে ঝর্ণা নামলো...নিশুতি-রাতে বড় কন্যা এলো। কন্যা বললে—আজ আবার কি? কাঁদছো, দেখছি!

আলেকসিশ বললে বিবরণ।...শুনে বড় কন্যা বললে—আমি হদিশ বলে দিচ্ছি···মনে রেখো···প্রথমবারে হাত থেকে আমি আমার রুমালখানা দেবো ফেলে···যেন আচম্‌কা পড়ে গেছে!···মনে থাকবে তো?

আলেকসিশ বললে—থাকবে। প্রথমবার রুমাল ফেলা,—হুঁ।

বড় কন্যা বললে—দ্বিতীয় বারে আমার গলায় যে মুক্তোর মালা থাকবে, সেই মালাটা আমি আঙুল দিয়ে নাড়বো। মনে থাকবে?

আলেকসিশ বললে—থাকবে···দ্বিতীয়বারে মুক্তোর মালা।

বড় কন্যা বললে--হুঁ! আর তৃতীয় বারে কপালে হাত দিয়ে আমি আমার মাথার চুল সরাবো। মনে থাকবে?

—মনে থাকবে। আলেকসিশ বললে—প্রথম বারে রুমাল, দ্বিতীয় বারে মুক্তোর মালা, আর তৃতীয় বারে কপালে হাত দিয়ে চুল সরানো।

—হ্যাঁ। বড় কন্যা বললে—এখন খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও!

পরের দিন··দরবারে আলেকসিশের ডাক পড়লো। আলেকসিশ এসে দেখে, পলার সিংহাসনে বসে জলের রাজা...আর রাজার ডান দিকে সার-বন্দী দাঁড়িয়ে অপরূপ-রূপসী রাজার বারো কন্যা। সব কন্যার মাথায় পলার মুকুট··

রাজা বললে—আমার এই বারো মেয়ে...এদের মধ্যে যে বড়, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। বড়কে যদি বেছে দেখিয়ে দিতে পারো, তবেই হবে বিয়ে। তিন-তিনবার বাছতে হবে···একবার নয়, দুবার নয়, তিনবারই যদি ঠিক বাছতে পারো, তবেই বিয়ে। একটিবার ভুল হলেই গর্দ্দানা যাবে!...

আলেকসিশ চেয়ে চেয়ে দেখলো বারো কন্যার পানে···সর্ব্বনাশ! বারো জনের চেহারা এক···মুখ চোখ···কোনো তফাৎ নেই! মাথায় সকলে সমান উঁচু।

সে দেখছে দেখছে...হঠাৎ বড় কন্যার হাত থেকে রুমাল পড়লো খশে ! বড় কন্যা তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিলে। দেখে আলেকসিশ ফেললো আরামের নিশ্বাস···কন্যা বলে দেছে, প্রথম বারে রুমাল ফেলা...

আলেকসিশ এগিয়ে গিয়ে বড় কন্যার হাতখানা ধরে রাজাকে বললে—উনি বড়···

—হুঁ ! রাজার মুখ গম্ভীর। দুচোখে আগুন ! রাজা বললে—বেশ। বাহিরে যাও। ওদের আমি এলোমেলো দাঁড় করিয়ে দেবো···এবার দ্বিতীয় বারের পরীক্ষা।

আলেকসিশকে রক্ষীরা নিয়ে গেল দরবারের বাহিরে···তারপর আবার যখন সে দরবারে এলো, দেখে, বারো কন্যা ফাঁক ফাঁক সব দাঁড়িয়ে আছে···সিংহাসনের বাঁ দিকে। আলেকসিশ চেয়ে চেয়ে দেখচে সকলের পানে···তাইতো ! চেয়ে আছে···চেয়ে আছে আলেকসিশ···হঠাৎ দেখে, এক কন্যা গলার মুক্তোর মালাটা আঙুল দিয়ে নাড়ছে ! আলেকসিশ বুঝলো, বুঝে এগিয়ে গিয়ে ধরলো বড় কন্যার হাত...ধরে বললে—ইনি।

—হুঁ ! রাজার কথায় বাজের আওয়াজ ! রাজা বললে—ঠিক হয়েছে। এবার তিনবারের বার। বাহিরে যাও···

আলেকসিশ আবার গেল দরবারের বাহিরে· যখন ফিরলো, দেখে, দরবারের মধ্যে খুব এলোমেলো হয়ে বারো কন্যা আছে বসে···সব এক রকম চেহারা···এক-রকম পোষাক···কোনো তফাৎ নেই ! মনে পড়লো, এবারে কপালে হাত দিয়ে মাথার চুল সরানো···

আলেকসিশ চেয়ে চেয়ে দেখছে ··হঠাৎ দেখে, কপালে হাত দিয়ে এক কন্যা কপালে-উড়ে-পড়া মাথার চুল সরাচ্ছে···

আলেকসিশ গিয়ে তার হাত ধরলো, বললে—ইনি, মহারাজ···

তিন তিন-বারই ঠিক। বিয়ে হবে।...বিয়ের কথা পাকা। রাজা বললে,—কিন্তু তার আগে এ রাজ্যে এক নিয়ম আছে···

আলেকসিশ তাকালো রাজার পানে...বুকখানা টিপটিপ করছে···আরো শক্ত কি ফরমাশ আবার তুলবে !...

রাজা বললে—আজ রাত্রে বিরাট ভোজ হবে। সে-ভোজে বরকে খেতে হয় বিশ' জনের খোরাক ···জল-রাজ্যের তাই নিয়ম।...যদি পারো...তবেই বিয়ে। না পারলে গর্দ্দানা।

···সর্ব্বনাশ ! মানুষে তা পাবে কখনো ! দরবার ভাঙ্গলো···আলেকসিশ এলো নিজের ঘরে। বিয়ে হবে ভেবে কি আনন্দই হয়েছিল। এখন রাজার এ-অসম্ভব কড়ার শুনে সব আনন্দ গেল উবে।

বাঁটুল তিনজন এসে বললে—কিসের ভাবনা, হুজুর ? বিয়ে হবে···আনন্দ করুন...তা নয়··· ভাবনায় কাতর !...

আলেকসিশ বললে—শুনেচো এ রাজ্যের নিয়ম ?

এক-নম্বর বাঁটুল বললে,—আমি আছি...বিশ জনের কেন, বিশ হাজার জনের খোরাক চক্ষের পলকে সাবাড় করে দিতে পারি। এ কথা বলে সে দিলে আলেকসিশকে পরামর্শ···

সন্ধ্যার পর ভোজে ডাক পড়লো···আলেকসিশ এসে দেখে, একটা বড় ঘরে শুধু বরের আসন পাতা সে আসনের সামনে পাহাড়ের মতো উঁচু খাবার···মাছ মাংস পোলাও পরমান্ন···এমন উঁচু হয়ে আছে যে ওদিকটায় নজর চলে না!

রাজা বললে—খেতে বসো···

আলেকসিশ বললে—খাবো...কিন্তু আমার বাড়ীর নিয়ম...ভোজ খাবার আগে আমার চাকরকে দিয়ে সব খাবার চাখিয়ে নিই...বিষ-টিষ থাকতে পারে খাবারে। তাছাড়া পচা বা আলুনি খাবার আমার মুখে রোচে না...মুখে দিলেই বমি! অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উগ্‌রে বেরিয়ে আসে! তাই আমার বাড়ীর নিয়ম···

রাজা বললে—বেশ। ডাকো তোমার চাকরকে···খাবার চাখুক···

আলেকসিশ বললে—আপনারা যান। আমাদের নিয়ম...বিয়ের আগে যে আইবুড়ো-ভাত খাওয়া, তা কারো সামনে খেতে নেই। খাবারে কারো নজর না লাগে। সে-নজরে খাবার হজম হয় না।

সকলে চলে গেল। ভোজের ঘরে আলেকসিশ আর আলেকসিশের ডাকে এলো খাস্তি!...

খাস্তিকে আলেকসিশ বললে—কেউ নেই। বসে যাও এবার।

এ কথায় খাস্তি বসলো আসনে...দেখতে দেখতে অমন পাহাড়-প্রমাণ খাবার...সব চলে গেল বাঁটুল খাস্তির পেটে!...দেখে আলেকসিশ অবাক! ঐ তো একরত্তি মানুষ...তার চেয়ে ছোট ...তার আবার এতটুকুন পেট...ও-পেটে এত খাবার সাঁটলো কি করে!

আধ ঘণ্টায় ভোজের পাত্র নিঃশেষ। ঢেকুর তুলতে তুলতে আলেকসিশ বললে—দেখুন এসে মহারাজ...

রাজা এসে দেখলো। রাজার চোখ হলো এত বড়-বড়। ব্যস রে···মানুষ এমন খোরাকি!...

আলেকসিশ বললে—পরমান্নটা আরো দু'দশ গামলা হলে পেটটা ভরতো। যাক, আঁচিয়ে ফেলেছি, আর কেঁচে গণ্ডূষ করতে পারি না।···এখন তাহলে...

রাজা ভাঙবে তবু মচকাবে না! রাজা বললে—এবারে দ্বিতীয় নিয়ম...মানে, সুমুদ্দুরে বাস করতে হয় কিনা...তাই কাল দিনের বেলায়···মানে, বিয়ের কথা পাকা হবার পর দ্বিতীয় দিনে... সাত-সুমুদ্দুরের সাত-জালা জল খেতে হয় বরকে। কাল দিনের বেলায় তোমাকে সাত-জালা জল খেতে হবে। পারো, জলের দেশের মেয়ের সঙ্গে হবে বিয়ে,...না পারো, গর্দানা দেবে।···

আলেকসিশের মনে পড়লো পাস্তির কথা...পাস্তিকে ডেকে বললে—রাজা বলেছে, কাল সাত সুমুদ্দুরের সাত জালা জল খেতে হবে···

পান্তি বললে—কুছ পরোয়া নেই, হুজুর! আমি রয়েছি পান্তি···হুঁঃ!

পরের দিন···খাবার হল-ঘরে বড় বড় সাতটা জালায় সাত সুমুদ্দুরের জল...আলেকসিশকে এনে রাজা বললে—এই সাত-জালা জল তোমায় খেতে হবে বাপু···

আলেকসিশ বললে—বেশ...কিন্তু আমার বাড়ীর নিয়ম হলো খাবার আগে আমার চাকর জল চাখে···জলে বিষ আছে কি না···কিম্বা কোনো রোগের ব্যাসিলি। আপনারা যান...আমি আমার চাকরকে ডাকি...

রাজা গেল চলে···পান্তিকে ডেকে আলেকসিশ বললে—ঐ সাত-জালা জল...

পান্তি বললে—হুঁ। এ তো সাত চুমুকে উড়িয়ে দেবো হুজুর।

সত্যই তাই করলে পান্তি··সাড়ে তিন মিনিটে পান্তি সাতটা জালা করলে খালি...

বেরিয়ে রাজাকে বললে আলেকসিশ—জালা খালি মহারাজ···আর কোনো নিয়ম-কর্ম্ম আছে কি না বলুন আপনার রাজ্যে?

রাজা বললে—হুঁ...আজ দিনে এই জল খাওয়া, রাত্রে নিয়ম···অর্থাৎ···জলে থাকি কিনা··· ঠাণ্ডা আর গরম দুই বেশী-বেশী সইয়ে নিতে হয়! আজ রাত্রে গরম কামরায় তোমাকে থাকতে হবে ...থাকতে পারো, কাল হবে বিয়ে। না পারো, গর্দানা যাবে!...

কথা শুনে বড় কন্যা বললে—কি সর্ব্বনাশ! সে ঘরের দেওয়াল জানলা দরজা কড়ি বরগা... সব একেবারে গণগণে আগুন···লাল টকটক করছে···সে ঘরে ঢুকবে কি! দশ হাত দূরে দাঁড়ালে পুড়ে ঝলশে খুন হয়ে যেতে হয়!

আলেকসিশ বললে—আমার ঐ চাকর আছে...জুড়োন্তি···আগুনকে সে জল করে জুড়িয়ে দিতে পারে।

রাজাকে বললে আলেকসিশ—ঘরটা দেখিয়ে দিন···আমার চাকরকে দিয়ে পরখ করাই...কড়ি বরগা ঝড়ঝড়ে কি না...দেওয়ালগুলো নড়বড়ে কি না···

রাজা বললে,—বেশ...

আলেকসিশ বললে—আপনারা তাহলে যান···

জুড়োন্তিকে ডাকলো আলেকসিশ...জুড়োন্তি বললে—চলুন, হুজুর···

জুড়োন্তি চললো আগে আগে···আলেকসিশ পিছনে···গরম ঘরের কাছে যেতে দেওয়াল... কড়ি বরগা···দরজা জানলাগুলো গনগনে-আগুনে সব লাল টকটক করছিল...সেগুলো হলো জুড়িয়ে ঠাণ্ডা...যেন জল!···

জুড়োন্তি বললে—এবার ঘরে ঢুকুন, হুজুর...

আলেকসিশ ঢুকলো ঘরে। সত্যি...ঘর দিব্যি ঠাণ্ডা। নিরাপদে রাত কাটিয়ে সকালে আলেকসিশ এসে রাজাকে বললে—আজ তো বিয়ে···কখন তা হবে, মহারাজ?

তাকে দেখে রাজার মনে হলো এক ফুঁয়ে সুমুদ্দুরকে ফুলিয়ে কাঁপিয়ে আকাশটাকে ধুয়ে মুছে দেয়! কিন্তু রাজা! কথার খেলাপ করলে রাজার মহিমা থাকবে না! তাই কি করে···বললে—দুপুর বেলায় বিয়ে···

দুপুর বেলায় বিয়ে হলো...খুব ধুমধাম···সাত সুমুদ্দুরের যেখানে ছিল যত মাছ···যত কুমীর, হাঙ্গর, শুশুক, তিমি, সাপ, পোকা-মাকড়···সব এসে জড়ো হলো। ভোজের ধুম...নাচের ধুম···গানের ধুম···

ধুমধামে সকলে মত্ত...তখন বড় কন্যা বললে আলেকসিশকে—এরা এদিকে ব্যস্ত···চলো, আমরা পুরীতে যাই। সেখানে গিয়ে বিয়ের পোষাক ছেড়ে দুজনে সাদাসিধে পোষাক পরি। তারপর দুজনে এখান থেকে পালাই। আমার বাবাকে তুমি চেনো না, জলের রাজা জলে থাকলে কি হবে, মেজাজ আগুনের চেয়েও গরম!···তোমার উপর বাবার রাগ কোনো কালে যাবার নয়... সমানে তোমাকে মারবার চেষ্টা চালাবে···কে জানে, কি-ভাবে এখন···

আলেকসিশ বললে—কিন্তু আমি এখন জামাই...

বড় কন্যা বললে—জামাই তো হয়েছে কি! জানো না কথা আছে, মাছের মার আবার পুত্তুরশোক! তা বাবা তো মাছ নয়···মাছেদের রাজা। তার পুত্তুরশোক নেই, কন্যাশোক নেই, জামাই-শোক তো নেই ই...

তাই হলো। দুজনে চুপি-চুপি এলো পুরীতে···বিয়ের পোষাক ছেড়ে সাদাসিধে পোষাক পরে দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে পুঁটলি বেঁধে দুজনে বেরুলো পুরী থেকে...সঙ্গে তিন বাঁটুল...খাস্তি, পাস্তি আর জুড়োস্তি!···

রাজার আস্তাবল থেকে পাঁচটা তেজী মকর নিয়ে তাদের পিঠে পাঁচজনে চেপে বসলো···সঙ্গে সঙ্গে মকররা চললো ভেসে ঝড়ের বেগে।

দিন-রাত্তির ভেসে ভেসে কতদিন পরে উঠলো শেষে ডাঙ্গায়। ডাঙ্গায় উঠে বড় কন্যা দু'হাতে তালি বাজালো। তালি বাজাবামাত্র পাঁচটা মকর জল ছেড়ে উঠে পড়লো ঘোড়ার মূর্ত্তি ধরে। পাঁচজনে তখন সেই পাঁচটা ঘোড়ায় চড়ে ছুটলো···ছুটলো···বড় কন্যা বললে—তোমাদের বাড়ী চলো।

পাঁচ ঘোড়া ছুটলো জল। মাঠ-পাহাড় ভেঙ্গে···বেশিল জমিদারের পুরীর দিকে। এক দিন এক রাত্রি সমানে ছোটার পর আলেকসিশ বললে বড় কন্যাকে—একটু জিরোও...খাওয়া-দাওয়া করি। ঘোড়া থামিয়ে খানিকক্ষণ অন্ততঃ বসি···

—না···না...না! বড় কন্যা বললে। ঘোড়া ছুটছে···বড় কন্যার মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ··· মাথার সামনের দিককার চুলের কুচিগুলো উড়ে কপালের ঘামে এঁটে বসেছে! বড় কন্যা বললে— একটুও বসা নয়···দাঁড়ানো নয়। তুমি জানোনা আমার বাবার মেজাজ! এতক্ষণে আমাদের পিছনে নিজেই ধাওয়া করে বেরিয়েছে!···ঐ···ঐ···ঐ শুনতে পাচ্ছো পিছনে অনেক দূরে ওড়া-পাখনার শব্দ···

চকিতের জন্য কাণ পেতে আলেকসিশ শুনলো···হুঁ...অনেক দূরে পিছনে...ঝড়ের আওয়াজের মতো আওয়াজ। ঝড় এগিয়ে এলে ঝড়ের আওয়াজ যেমন এগিয়ে আসে স্পষ্ট হয়ে, এ শব্দ ঠিক তেমনি। বড় কন্যা বললে—আমার বাবা অনেক রকম যাদু জানে...আমাদের পিছনে আসছে··· দুজনকেই মেরে ফেলবে!...শুধু ছোটা···ছোটা···ছোটা···সামনের দিকে···যত জোরে পারি।

ঘোড়া পাঁচটা ছুটলো...আরো আরো আরো জোরে···প্রাণপণে...পিছনে ঝড়ের শব্দ...ঝড় আসছে যেন ওদিককার সব কিছু ভেঙ্গে তচ্-নচ্ করে···কাছে···কাছে···আরো কাছে ও-শব্দ···

বড় কন্যা বললে—না···পারা গেল না। ঘোড়াগুলোর মায়া নয়···ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে নেমে পড়ো সকলে···

এ কথায় পাঁচজনে লাফ দিয়ে নামলো ঘোড়ার পিঠ থেকে...নেমেই বড় কন্যা দু-হাতে তিনবার বাজালো তালি। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলো হলো মস্ত নদী...জলে-ভরা নদী নয়, মধুর নদী···আর তার দু'পাড় বাদামী বরফির...বড় কন্যা আর আলেকসিশ রাজহংস-রাজহংসী হয়ে মধু-নদীতে সাঁতার দিতে লাগলো।

ওদিকে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে জলের রাজা এসে হাজির···বাতাসে উড়ছে প্রকাণ্ড লম্বা শ্যাওলার দাড়ি। মধু-নদী দেখে ঘোড়া মধু খেতে লাগলো...জলের রাজা তাকে মারছে শঙ্কর-মাছের কাঁটার চাবুক···দু পায়ের গুঁতো দড়াদ্দম—ঘোড়ার গ্রাহ্য নেই! জলের রাজারও ভয়ানক তেষ্টা পেয়ে গেল···ঘোড়া কিছুতে নড়চেনা দেখে সে-ও নামলো ঘোড়ার পিঠ থেকে···নেমে হাঁটু পেতে বসে আঁজলা ভরে নদীর মধু খায় আর পাড় থেকে বাদামী-বরফি ভেঙ্গে তাতে দেয় কামড়। মধু আর বাদামী-বরফি খেলো দুজনে···পেট ভরে। মায়ার মধু...মায়ার বরফি! খেতে আরম্ভ করলে খাওয়া ছাড়া যায় না। খেয়ে খেয়ে পেট হলো দুজনের ঢোল...তারপর ফট্-ফট্ করে গেল দুজনের পেট ফেটে। পেট ফাটবামাত্র রাজা আর ঘোড়া—দুজনের মৃত্যু। তখন হংসী এলো হংসর কাছে... বললে—আপদের শান্তি। এসো, আবার নিজের নিজের রূপ ধরি...

দুজনে উঠলো মধু থেকে নিজের নিজের মূর্তি ধরে···এত আনন্দ হলো যে ঘোড়াগুলো গেছে মধু হয়ে জলের রাজার আর তার পক্ষীরাজের পেটে, খেয়াল ছিল না! ঘোড়া নেই! কত পথ এখন বাকী! হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই!

আনন্দের চমক কাটলে দুজনে চারিদিকে চেয়ে দেখে, সন্ধ্যা হয়েছে...সামনে রাত্রি···অজানা গভীর জঙ্গল...এখন?

ছুজনে ভাবছে আর ভাবছে···ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছে না···এমন সময় আকাশ বয়ে উড়ে এসে নামলো ছুজনের সামনে সেই ঈগল পাখী।'

ঈগল বললে—কি গো ছোট হুজুর···জলের রাজার কাছ থেকে কনে পেয়েছো, এখন শুধু বাড়ী ফেরা দরকার। ঘোড়া গেছে···যাক্! আমি আছি। ওঠো আমার পিঠে···ছুজনকে পৌঁছে দেবো।

ছুজনকে ঠোঁটে করে তুলে পিঠে বসিয়ে ঈগল আকাশে উড়লো। একটু পরে চাঁদ উঠলো ···জ্যোৎস্নার আলো গায়ে পড়েছে···ঘুমন্ত পৃথিবী···জ্যোৎস্নায় কি চমৎকার দেখাচ্ছে!

উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে ভোরের আগে সকলে এসে পৌঁছুলো বেশিল-জমিদারের পুরীর ওদিকে যে-জঙ্গল, সেই জঙ্গলে।

কন্যা তখন ঈগলকে বললে—আমাকে এইখানে নামিয়ে দাও ঈগল···আমি এই বনে থাকবো ···আলেকসিশকে তুমি ওর বাড়ীতে পৌঁছে দাও। আলেকসিশ গিয়ে বিয়ের কথা জানাবে...তারপর শ্বশুর-শাশুড়ী যদি আমাকে আদর করে বৌ-বরণ করে নিয়ে যেতে চান, তখন আলেকসিশ এসে আমাকে নিয়ে যাবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর অজানিতে আমি শ্বশুর-বাড়ী যেতে চাই না।

তাই হলো। একটা কুঞ্জ-বিতানে বড় কন্যাকে নামিয়ে রেখে আলেকসিশকে পিঠে তুলে ঈগল আকাশে উঠবে···বড় কন্যা বললে আলেকসিশকে—একটা কথা মনে রেখো...খুব হুঁশিয়ার···বাবা-মাকে চুমো খেয়ো যত-খুশী···কিন্তু তোমার ছোট বোনকে আদর করে যেন চুমু খেয়ো না! তা যদি খাও, তাহলে আমার কথা ভুলে যাবে···আমাকে আর নিতেও আসবে না! আর তাহলে আমি মনের দুঃখে মরে যাবো। বুঝলে?···

সবে তখন ভোর হয়েছে···ঘুম ভেঙ্গে জেগে বেশিল-জমিদার পালঙ্কে বসে চেয়ে আছেন খোলা জানলা দিয়ে বাহিরের পানে···হঠাৎ দেখেন, হুশ্ করে ঈগল পাখী এসে নামলো সদর-বাড়ীর উঠোনে···ঈগলের পিঠে আলেকশিস। মহানন্দে চীৎকাব করে তিনি ডাকলেন জমিদার্নীকে —ওঠো, ওঠো, ওগো ওঠো সকলে···ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন...আমাদের আলেকসিশ এসেছে···ঈগল পাখী তাকে পিঠে করে নিয়ে এসেছে। জলের রাজার কাছ থেকে উদ্ধার পেয়েছে সে···উদ্ধার!

বলতে বলতে বেশিল জমিদার ছুটে উঠোনে এলেন···সঙ্গে জমিদার্নী···ছোট মেয়ে···লোকজন সকলে।

মা-বাপকে জড়িয়ে ধরে আলেকসিশ খেলো তাঁদের মুখে চুমু···চুমুর পর চুমু···ছোটবোনকে দেখে···বড় কন্যার কথা ভুলে তারো মুখে আলেকসিশ চুমু খেলে···

পুরীতে মহা-আনন্দ···ভোজ নাচ গান···হাসি খেলা...দিনের পর দিন···রাতের পর রাত সমানে চলেছে আমোদ-আহ্লাদ। সে আমোদে মশগুল আলেকসিশ...বড় কন্যার কথা ভুলে গেল।

বেচারী বড় কন্যা! একা কত-দূরে নিরালা জঙ্গলে পড়ে দিন-রাত ভাবছে, ঐ বুঝি আলেকসিশ এলো তাকে নিতে! কিন্তু কোথায় কে!

তিন দিন তিন রাত বড় কন্যা জঙ্গল ঢুঁড়ে ঘুরে বেড়ালো সারাক্ষণ অধীর প্রতীক্ষায়। চার দিনের দিন মন আর ধৈর্য্য মানে না। চাষার মেয়ে সেজে বড় কন্যা এলো জঙ্গল ছেড়ে সহরে...

এসে দেখে, পথে ঘাটে কী ভিড়! নাচ চলেছে...গান চলেছে...দোকানী-পশারীর দল দোকান ছেড়ে আমোদ-আহ্লাদ করছে।

কিসের এত আমোদ? একটি মেয়ে-মানুষকে বড় কন্যা জিজ্ঞাসা করলে—কেন গা, তোমাদের সহরে এত ধুমধাম কিসের?

সে বললে—ওমা, জানো না? জমিদারের ছেলে আলেকসিশ এতকাল নিখোঁজ ছিল...ফিরেছে ...তার বিয়ে হবে রাশিয়ার রাজ-কন্যার সঙ্গে...ছোট রাজকন্যা। তাই এত ধুমধাম।

শুনে বড় কন্যা চুপ করে রইলো...অনেকক্ষণ। তারপর মিনতি জানিয়ে বললে—আমি বিদেশী মানুষ...থাকবার জায়গা নেই...আজকের রাতটুকু আমাকে একটু ঠাঁই দেবে তোমার বাড়ীতে?

মেয়ে-মানুষটি বললে—কেন দেবো না, বাছা? এসো, তুমি এসো...

বড় কন্যা বললে—বিদেশী হলেও তোমাদের সহরে যখন এসেছি, আমি আইবুড়ো-ভাত পাঠাতে চাই তোমাদের জমিদারের ছেলের বিয়েতে। আমি খুব ভালো খাবার তৈরী করতে পারি। আমাকে ঢুকতে দেবে তো জমিদার-বাড়ীতে...সে-খাবার নিয়ে?

মেয়ে-মানুষটি বললে—কেন দেবে না? জমিদারের বাড়ীর দোর বিয়ের আমোদে খোলা... সকলে যাচ্ছে...তুমিও যাবে।

মেয়ে-মানুষের সঙ্গে বড় কন্যা এলো তার বাড়ীতে। সারা রাত জেগে নানারকম মেঠাই আর পিঠে তৈরী করলে।

পরের দিন সকালে মেয়ে-মানুষের দেওয়া প্রকাণ্ড পরাতে খাবার সাজালো...খাবারের সঙ্গে রাখলো এক হাঁড়ি ক্ষীর, আর জ্যান্ত দুটি ঘুঘু পাখী ..তারপর বারকোশে একখানা নক্সাদার খঞ্চিপোষ ঢাকা দিয়ে বড় কন্যা চললো জমিদার-বাড়ীতে...আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব নিয়ে!

জমিদার-বাড়ীর হেড-দরোয়ান পিঠের গন্ধে আকুল হয়ে বললে—আমায় একখানা দাওনা গো মেয়ে, খেতে...চমৎকার মিঠে খোশবু পাচ্ছি...

বড়-কন্যা তাকে একখানা পিঠে দিলে...পিঠে খেয়ে সে আহা-আহা করে তারিফ জানালো। তারিফ জানিয়ে বললে—চলো গো মেয়ে, আমি তোমাকে কর্ত্তা-গিন্নীর কাছে নিয়ে যাই।

বড় কন্যাকে নিয়ে দরোয়ান এলো বেশিল জমিদারের খাশ-কামরায়। সে কামরায় বসে গল্প করছেন বেশিল জমিদার, জমিদার্নী, আলেকসিশ আর বিয়ের কনে রাশিয়ার ছোট রাজকন্যা...

পরাতের উপর থেকে খঞ্চিপোষের ঢাকা খুলতেই ঘুঘু পাখী দুটি উড়ে সামনের টেবিলে বসলো।

পাখী বললে পাখিনীকে—আমাকে ঐ ক্ষীর একটু দাও তো...খাবো।...

পাখিনী বললে—উঁহু···এ ক্ষীর খেলে আমাকে তুমি ভুলে যাবে...ছোট·মনিব যেমন তাঁর জঙ্গলে-ফেলে-আসা বৌকে ভুলে গেছেন।

এ কথা শোনবামাত্র আলেকসিশ উঠে দাঁড়ালো···ঘরের চারদিকে তাকালো। ···কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে চাষার-মেয়ের-সাজে বড় কন্যা। তার উপর চোখ পড়তেই আলেকসিশ তাকে চিনলো···সঙ্গে সঙ্গে সব কথা মনে পড়লো।

তখনি ছুটে গিয়ে বড় কন্যার হাতখানা সে চেপে ধরলো...তারপর মা-বাপের কাছে তাকে এনে বললে—বাবা, মা—এই আমার বৌ...জলের রাজার মেয়ে.. এর জন্যই আমি প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছি।...এ কন্যা না থাকলে কবে আমার গর্দ্দানা নিতো জলের রাজা!···

জমিদার জমিদার্নী সব কথা শুনলেন। শুনে বড় কন্যাকে দুজনে আদর করে বুকে নিলেন। জমিদার্নী আদর করে বড় কন্যার মুখে চুমু খেয়ে বললেন—ওমা···ওমা···ওমা···আমার এমন সুন্দর বৌ!···এসো মা, এসো, আমার ঘরের লক্ষ্মী...

রাশিয়ার ছোট রাজকন্যা বললে—আমি তাহলে এখন···

জমিদার্নী বললেন—তোমার সঙ্গে তাহলে বিয়ে তো আর হতে পারে না মা! আশীর্ব্বাদ করি, রাজার ঘরে তোমার বিয়ে হোক। তুমি দুঃখ করোনা।

রাজকন্যা মেয়েটি ভালো...বললে—না, না···দুঃখ কিসের! এমন বৌ হয়েছে···একজন বর দুজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারেনা তো!

তারপর ?···

সুখের আর সীমা নেই! জলের রাজার বড় কন্যা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে···শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-যত্ন ···ছোট ননদকে ভালোবাসা... কোনো কাজে তার ত্রুটি নেই।

সকলে বলে—এমন বৌ অনেক তপস্যা করলে মেলে!

কাফ্রীদেশের রূপকথা

রাজ্যের রূপকথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ইণ্ডিয়ান প্রেস
এলাহাবাদ

দ্বিতীয় পর্ব্ব

পূর্ব্বকথা

এশিয়া-য়ুরোপ-আমেরিকার মতোই মহাদেশ কাফ্রীর দেশ আফ্রিকা। আফ্রিকা-মহাদেশে ছোট-বড় নানা প্রদেশ আছে। য়ুরোপে যেমন ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, রাশিয়া, ব্রিটেন—এশিয়ায় যেমন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, আরব, আঁফগানিস্তান—তেমনি আফ্রিকায় আছে মিশর, মরক্কো, আলজিরিয়া, কঙ্গো, কেপ-কলোনি প্রভৃতি। এইসব প্রদেশের আদি-অধিবাসীদের আচারে ব্যবহারে ভাষায় এবং জাতে কিছু কিছু তফাৎ আছে।

আধুনিক যুগে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ধারায় ভাঙচুর ঘটলেও আদি-যুগে এ পার্থক্য নানাভাবে প্রকাশ পেতো।

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, শিক্ষায় সংস্কারে কাফ্রী-জাত দুনিয়ার আর-সব জাতের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে! সে ধারণা কতখানি ভুল, তা নিয়ে জাতি ও-ভাষাতত্ত্ববিদরা তর্ক করুন, সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি, আদিযুগের আফ্রিকার নানাপ্রদেশের কাফ্রী-জাতের মধ্যে যে-সব রূপকথার প্রচলন ছিল, সেগুলি অন্য সভ্য দেশের রূপকথার মতোই যুক্তি-সঙ্গতিপূর্ণ; এবং সে সব গল্পে রস আছে, প্রাণ আছে, কল্পনার বিচিত্র মাধুর্য্য আছে। এ সব রূপকথার জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করে পণ্ডিতরা বলেন, এক-হাজার দু-হাজার বছর আগে এ সব গল্প জ্ঞানলোকবর্জিত নিরক্ষর নর-নারীর চিত্তে প্রথম রূপায়িত হয় এবং লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এগুলি চলে এসেছে আমাদের আধুনিক যুগের চিত্ত-তটে!

আফ্রিকার বহু রূপকথা আমরা সংগ্রহ করেছি। সেগুলি থেকে বাছাই করে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধরণেব কটি গল্প এ গ্রন্থে প্রকাশ করছি।

প্রথমেই বলছি কঙ্গোদেশের চারটি রূপকথা।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আদিযুগে কঙ্গোদেশের সব গ্রামে একদল লোক ছিল···তাদের সকলে বলতো আলোমান। এদের পেশা ছিল—আমাদের ভিখারীরা যেমন দোরে দোরে ঠাকুর-দেবতার গান গেয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে, তেমনি ভাবে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলকে রূপকথা শুনিয়ে ভিক্ষা করা। কঙ্গোর এ প্রাচীন রূপকথাগুলি হাস্যে ভাষ্যে যেমন অপরূপ, কল্পনার রঙে তেমনি রঙীন। গল্পগুলির ছত্রে ছত্রে যেন ছবি ফুটে চলেছে! এ চাবটি গল্প পড়লে সকলে বুঝবেন, কাফ্রী-জাতের প্রাচীন রূপকথায় যে সম্পদ ও বৈচিত্র্য, তার জোরে সেগুলি যে-কোনো সভ্য দেশের প্রাচীন রূপকথার সঙ্গে সমান আসন পাবার দাবী রাখে।

কলিকাতা—১৩৫৮

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কাফ্রীদেশের রূপকথা

এক বেরাল আর এক ইঁদুর...বনে থাকে। দুজনে খুব ভাব। দুজনের মনে মনে ভারী মিল—ঝগড়া নেই, ঝাঁটি নেই। বেরাল গাছ থেকে পাখী ধরে ধরে খায়, আর ইঁদুর খায় চীনা-বাদাম আর কফির ফুল ফল মূল!

একদিন ইঁদুর বললে বেরালকে—রোজ রোজ এক-জায়গায় এমন করে থাকতে আর ভালো লাগছে না দাদা। চলো...ওপারে ঐ গাঁ, ওখানে আছে লোকালয়, সেই লোকালয়ে গিয়ে আমরা থাকি।...তোমাকে তাহলে আর এমন করে গাছে চড়ে-চড়ে পাখী ধরতে হবে না—আমাকেও ফলমূল খুঁজে মরতে হবে না। লোকালয়ের হেঁশেলে তুমি পাবে তৈরী রকমারি খাবার, আর ভাঁড়ারে আমি পাবো চাল ডাল ফল-ফুলুরি অঢেল।

শুনে বেরাল বললে—মন্দ বলোনি, ইঁদুর-ভাই! কিন্তু মাঝখানে বিশ-ক্রোশ নদী...ও নদী পার হবো কি করে?

ইঁদুর বললে—কেন? নৌকো তৈরী করে সেই নৌকোয় চড়ে পার হবো।

বেরাল বললে—তাহলে এসো, নৌকো তৈরী করি আগে।

ইঁদুর তখনি কচি দেখে দেখে এত খেজুর-গাছ কেটে আনলো···দাঁত দিয়ে ভিতরগুলো কুরে কুরে কেটে তৈরী করলে মস্ত খোল···এমন খোল যে তার মধ্যে দুজনে আরামে শুতে-বসতে পারে। বেরাল নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে বাইরের-দিককার কাঁটা-খোঁচাগুলো চেঁছে দিব্যি সমান করে ফেললো। তারপর বড় দুটো ডাল নিয়ে দুখানা দাঁড় তৈরী হলো। সব তৈরী হলে নদীতে নৌকো এনে তার খোলে দুজনে বসে নৌকোখানা দিলে জলে ভাসিয়ে।

নৌকো ভেসে চললো। ওপারে কালো রেখার মতো গাঁ...সেই গাঁয়ের দিকে নৌকো চললো। বেরাল দাঁড় টানছে...ইঁদুর ধরেছে হাল···বাতাসে-ঢেউয়ে নৌকো দিব্যি ভেসে চলেছে।

বিশ-ক্রোশ চওড়া নদী...তার ওপারে গাঁ। সে-গাঁয়ে পৌঁছুনো চাট্টিখানি কথা! একদিন গেল, দুদিন গেল···তিনদিন গেল···তবু এখনো ওপার দেখাচ্ছে ধোঁয়ার মতো···কালো আবছাপানা!··· এদিকে নৌকোয় খাবার যা ছিল, ক'দিনে ফুরিয়ে গেল···তারপর উপোস।...জলের অথৈ বুকে জল ছাড়া আর কিছু মেলে না! সে জলও তেমনি···লোণা...খাবে কি! খেলেই ওয়াক্!

দাঁড় টানার মেহনৎ তার উপরে উপোস··বেরাল নেতিয়ে পড়লো; বললে,—বড্ড খিদে পেয়েছে ইঁদুর-ভাই...বড্ড খিদে ··খিদের জ্বালাতেই মরবো!

এ-কথা বলে দাঁড় ফেলে থাবা গুটিয়ে থাবায় মাথা গুঁজে বেরাল শুয়ে পড়লো নৌকোর খোলে। ইঁদুরেরও সেই দশা! হাল রেখে সেও পেটে পা চেপে শুয়ে পড়লো...বললে—সত্যি, বড্ড খিদে বেরাল-দাদা, বড্ড খিদে!

নৌকো চলেছে ভেসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে···কবে ওপারে লাগবে, কে জানে!

বাতাসের ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে এক-একটা ঢেউ ওঠে···নৌকো দোলে...বেরাল চোখ মেলে চায় ...বলে,—খিদে···উঃ, কী খিদে রে বাবা!

পাঁচদিনের দিন বেরাল ঝিমিয়ে পড়লো...চোখে খালি ঘুম আর ঘুম। খিদেয় পেট করছে চুঁইচুঁই! নাড়ীগুলো ধরে কে যেন দড়ির মতো পাকাচ্ছে·· নড়বার সামর্থ্য নেই! কোনোমতে মিহি গলায় চিঁ-চিঁ করে বেরাল বললে—খিদের জ্বালায় মলুম ইঁদুর-ভাই, খিদের জ্বালায় মলুম!

ইঁদুরেরও ঐ দশা! মুখে সে কিছু বলে না—চুপচাপ পড়ে আছে।

ঝিমুতে-ঝিমুতে বেবাল শেষে ঘুমিয়ে পড়লো। ইঁদুরের মনে হলো, আরে, মিথ্যা আমি খিদের জ্বালায় মরছি! খেজুর-গাছের যে-গুঁড়িতে নৌকো তৈরী করেছি···তার খোল এখনো শুকোয়নি··· শাঁস আছে, রস আছে—কুরে কুরে খাওয়া চলে তো! বাঃ!

এ-কথা যেমন মনে হওয়া, ইঁদুর কুট্-কুট্ কুট্-কুট্ করে দাঁত দিয়ে কুরে-কুরে খোল থেকে শাঁস খুলে খেতে লাগলো। কুট্-কুট্ শব্দে বেরালের ঘুম ভাঙ্গে...আধ-খোলা চোখে বেরাল বলে— কিসের শব্দ ইঁদুর-ভাই?

ইঁদুর চোখ বুজে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে...সাড়া দেয় না···যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন!

বেরাল আধখোলা চোখে দেখে, ইঁদুর ঘুমোচ্ছে। ও শব্দ তাহলে? বেরাল ভাবলো, তা হলে

ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখছিলুম হয়তো! বেরাল আবার চোখ বুজলো…এবং চোখ বুজতেই ঘুম। এমন ঘুম যে বেরালের নাক ডাকতে লাগলো ঘড়-ঘড়…ঘড়র-ঘড়…

বেরাল অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে ইঁদুর আবার নৌকোর খোলে দাঁত বসালো…নারকোল-কোরার মতো মিষ্টি…খেতে চমৎকার লাগছে! তার দাঁতের কুট্-কুট্ শব্দ …বেরালের আবার ঘুম ভাঙ্গলো। বেরাল ডাকলো,—ইঁদুর…

ইঁদুর এবার চুপ করে মড়ার মতো শুধু পড়ে রইলো না ··নাক ডাকাতে লাগলো।

বেরাল ভাবলো, নাঃ, স্বপ্ন!

বেরাল আবার চোখ বুজলো…এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো ··আবার তার নাক ডাকা সুরু।

ইঁদুর আবার গুঁড়ি কুরতে লাগলো…কুট্ কুট্…কুট্ কুট্…কুট্ কুট্…

এবারে এমন-কোরা কুরলো যে নৌকোর তলা হলো ফুটো; আর সেই ফুটো দিয়ে নৌকোর খোলে জল ঢুকলো! দেখে ইঁদুরের চক্ষুস্থির·! কিন্তু না, ভয় কি! ডাঙ্গা আর বেশী দূরে নয়!

খোলের জল বেরালের গায়ে লাগলো…ছ্যাঁক করে! বেরাল ভিজে জাব! তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। বেরাল লাফিয়ে উঠলো…বললে—জল আসে কোথা থেকে রে ইঁদুর?

শুনে ইঁদুর যেন চমকে উঠলো…বললে—জল! তার মানে?

মানে আর বেরালকে বলতে হলো না! দু'চোখ মেলে বেরাল যা দেখলো…নৌকোর খোল…অর্দ্ধেকটা ভরে গেছে জলে…জলের উপর ভাসছে খেজুর-কাঠের গুঁড়ো আর ইঁদুরের ঠোঁটে কোরা শাঁস। ইঁদুর বসে আছে যেন চোর!

বেরাল বুঝলো ইঁদুরের কীর্ত্তি! বললে—হুঁ…বটেরে হতভাগা! …এমনি করে ডুবিয়ে মারবি!…তার আগে তোকে আমি…বলেই ইঁদুরের কাণটা বেরাল চেপে ধরলো।

নৌকোর খোল জলে টৈ-টুম্বুর। সে জলে দুজনের লড়াই চলেছে…ইঁদুর বললে—আহাহা, করো কি, করো কি দাদা…এই জল-ভরা নৌকোয় হুড়োহুড়ি করলে নৌকো এখনি ডুববে। ডাঙ্গায় এসে পড়েছি…একটু সবুর করো। যা করবার করো…আগে ডাঙ্গায় নামি!

কোনোমতে ডুবন্ত নৌকোখানা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে ডাঙ্গার গায়ে এসে লাগলো। যেমন লাগা, দুজনে লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় নামলো…সঙ্গে সঙ্গে নৌকোখানা গেল টুপ্ করে ডুবে।

ডাঙ্গায় নেমে ইঁদুর পালাবে ঠিক করেছিল, কিন্তু জলে ভিজে দেহ একেবারে ঢিপ্সী ভারী… ছোটবার সাধ্য নেই!…

বেরাল ছাড়লো না, ঝাঁপ দিয়ে ধরলো তার ঘাড়খানা চেপে…বললে,— তোকে আমি খাবো… না, কিছুতেই ছাড়বো না। এত-বড় দুষমণ! আর একটু হলে ডুবিয়ে মেরেছিলি!

চিঁ-চিঁ গলায় ইঁদুর বললে—খেয়ো দাদা, খেয়ো…তার আগে একটু সবুর করো…ভিজে আমি ঢোল হয়ে আছি! এখন আমাকে খেলে স্বাদ পাবে না। লোণা জলে ভিজেছি! ভয়ানক নোস্তা লাগবে। আগে রোদে গায়ের জল শুকোতে দাও, তারপর খেয়ো…হ্যাঁ, খেয়ে তখন মজা পাবে!

বেরাল বললে—বটে···আর তুমি সেই ফাঁকে লম্বা দাও!

ইঁদুর বললে—এই ঢোলের মতো ভারী দেহ নিয়ে নড়বার সামর্থ্য নেই দাদা, লম্বা দেবো কি! ···নিজেও ভিজে স্যাঁতা হয়েছো! রোদে আগে নিজেকে শুকিয়ে নাও···না হলে সর্দ্দি হয়ে হেঁচে-কেসে মারা যাবে! তাছাড়া জানোতো, মানুষরা স্নান করে গায়ের জল শুকিয়ে তবে খেতে বসে। তোমার লোমগুলো ভিজে গায়ে নেপটে রয়েছে···বুকে-পিঠে জল বসছে···আগে গা শুকিয়ে নাও, তারপর আমাকে খেয়ো।

বেরাল ভাবলো, মিথ্যা নয়! গা যে-রকম জ্যাব্‌জ্যাব্‌ করছে···গাটা শুকিয়ে নিতে কতক্ষণ বা সময় লাগবে!
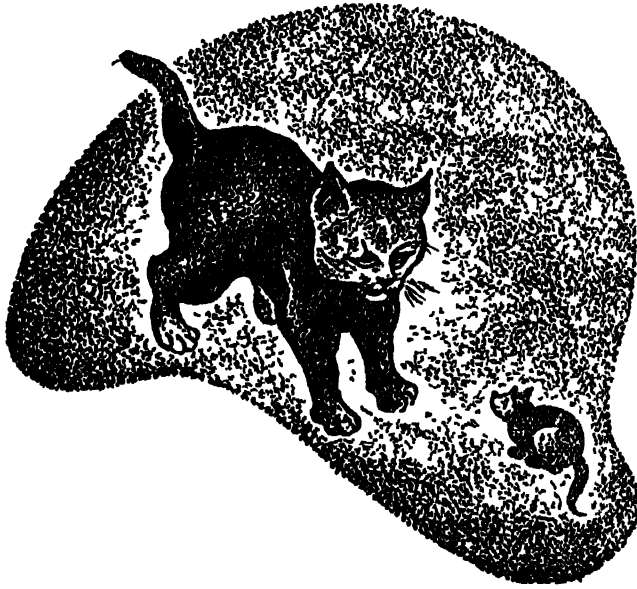
দুজনে রোদে শুয়ে পড়লো···ইঁদুরের এতটুকু দেহ···তাছাড়া গায়ে বেরালের মতো অমন লোম নেই···তার গা চট করে শুকোলো। বেরাল এপাশ ফিরে ওপাশ ফিরে ভিজে লোম শুকিয়ে নিলে। তারপর ভাবলো, স্নানটা যখন হয়ে গেল...তখন লোমগুলো একবার ব্রাশ করে নিই! নখ দিয়ে কুরে কুরে বেরাল নিবিষ্ট-মনে গায়ের লোম ব্রাশ করতে লাগলো।...

সেই ফাঁকে ইঁদুর করেছে কি, কুটুস-কুটুস মাটি খুঁড়ে এক গর্ত্ত তৈরী করেছে···এমন গর্ত্ত যে বেশ সহজে তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

লোম ব্রাশ করে বেরাল ফিরলো ইঁদুরের দিকে···বললে—এইবার...কেমন?

—হ্যাঁ···খাও আমাকে! বলে ইঁদুর সোঁ করে সেই গর্ত্তর মধ্যে গেল সেঁধিয়ে। গর্ত্তর মুখে মুখ দিয়ে বেরাল হুমড়ি খেয়ে পড়লো···কিন্তু সে-গর্ত্তে তার ল্যাজ ঢোকে না, সে সেঁধুবে কি!

গর্ত্তে ঢুকে ভিতর থেকে ইঁদুর বললে—খাশা জায়গা বেরাল-দা...এসো, নিশ্চিন্তে বসে আমায় খেতে পারবে এখানে।

কথাটা বলে ইঁদুর হো-হো করে হাসলো! সে হাসির আওয়াজ...বেরালের কাণে বাজলো বাজের আওয়াজের মতো! বেরাল বললে—আচ্ছা, থাকো, কতক্ষণ থাকবে ও-গর্ত্তে। আমি এই গর্ত্তর মুখে থাবা উঁচিয়ে বসে রইলুম···যেমন বেরুবে, অমনি ধরবো। দু-এক মাস থাকতে হয় যদি, থাকবো ...এখান থেকে এক-পা নড়বো না। না যদি বেরোও, না খেয়ে শুকিয়ে ঐ গর্ত্তে পচে মরবে, তাতেও আমার সুখ!

বেরাল বসে রইলো ওৎ পেতে গর্ত্তর মুখে চোখ রেখে! ইঁদুর গর্ত্তর ভিতরে-ভিতরে লম্বা সুড়ঙ্গ কেটে চললো···নীচের দিকে খানিকটা কেটে আবার উপর-দিকে মাটী কাটতে লাগলো···কেটে কেটে ওদিকে গর্ত্তর মুখ বার করলে একটা গাছের পাশে। সে-মুখে বেরিয়ে ইঁদুর দে দৌড়··· একেবারে গাঁয়ের দিকে। বেরাল টেরও পেলে না...সে বসে আছে সেই গর্ত্তর মুখে নজর রেখে··· নিঃশব্দে···ইঁদুরের জন্য ওৎ পেতে থাবা উঁচিয়ে।

সেই থেকেই বেরালে-ইঁদুরে ভাব গেছে চটে। ইঁদুর দেখলে বেরাল ঝাঁপ দিয়ে তাকে ধরবেই ...বেরালের ঘুমও হয়েছে তারপর থেকে এমন যে খুট করে শব্দ হলো, কি ইঁদুরের গন্ধ নাকে লাগলো তার ঘুম যায় ভেঙ্গে। আর ইঁদুরও হয়েছে ভয়ানক হুঁশিয়ার...যে-বাড়ীতে বেরাল থাকে, সে-বাড়ীর ভাঁড়ারে বা নর্দ্দামায় কি, সে বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায় না ইঁদুর!

বনে সে-বার এক-ফোঁটা বৃষ্টি হয় নি···খাল বিল সব শুকিয়ে খাঁ-খাঁ। বনের কোথাও এতটুকু জল নেই! তেষ্টায় ছাতি ফেটে কত জানোয়ার মারা গেল! তেষ্টায়-ছাতি-ফেটে মরা ··সে যেন একালের প্লেগ বসন্ত কলেরার মতো। এর আবাব টীকে নেই যে টীকে নিয়ে রক্ষা পাবে!···

সে-বনের রাজা সিংহ। চিন্তাকুল হয়ে সিংহবাজ একদিন সভা ডাকলো। সে সভায় বনের সমস্ত জন্তু জানোয়ার এসে হাজির।

সিংহ বললে—সকলে পরামর্শ করে উপায় ঠাওরাও, কি করে তেষ্টার জল মেলে। ছাতি ফেটে জানোয়ারবা সব মরে পাচার হয়ে গেলে কাদের নিয়ে রাজ্য চালাবো!

বনে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান···বানর। সে বললে—এ বন ছেড়ে চলুন পশুরাজ, সকলে অন্য বনে যাই···যে-বনে বৃষ্টি হয়েছে···খালে বিলে পুকুরে জল আছে।

কচ্ছপ বললে—তেমন বনে যেতে হলে সারা পৃথিবী চুঁড়তে হবে বাপু। আমার পিঠে এই ভারী খোলা···এ বোঝা নিয়ে এ-বয়সে অত পথ আমি চলতে পারবো না।

সাপ বললে—সকলে মিলে চুপচাপ পড়ে ঘুমোই আসুন পশুরাজ...তা হলে আর তেষ্টা পাবে না।

খরগোশ বললে—পাগল! না, আমি তা পারবো না। বেশী ঘুমোলে বাতে ধরবে!

নানা জানোয়াব নানা কথা বললে...কোনোটা তেমন লাগসই লাগলো না। তখন শেয়াল বললে—আমরা সবাই মিলে আসুন পশুরাজ, একটা পুকুর খুঁড়ি। কি বলেন? মস্ত পুকুর। এমন মস্ত—যে সারা বছরের রোদেও সে পুকুরের জল শুকোবে না।

সকলে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাঃ! শেয়ালের এ যুক্তি খুব ভালো। পুকুরের জল যদি সারা বছর না শুকোয়, তাহলে হোক অনাবৃষ্টি...কুছ পরোয়া নেই!

তখন পুকুর খোঁড়ার প্রোগ্রাম।...ঠিক হলো, পালা করে-করে প্রত্যেকটি জানোয়ার মাটী খুঁড়বে! শেয়াল যখন যুক্তি দেছে, তখন আর-সকলের খোঁড়া হলে শেয়াল করবে কাজ শেষ। অন্য জানোয়াররা আগে খুঁড়বে!

সকলে রাজী। পুকুর খোঁড়া সুরু হলো। গণ্ডার, বরা, বাঘ, হাঁতী, হরিণ থেকে খরগোশ, কচ্ছপ, মায় নেংটী ইঁদুর পর্য্যন্ত ...সকলে পালা করে খুঁড়চে, খুঁড়চে, খুঁড়চে। সাতদিনে মস্ত পুকুর হলো। এখন শেষ করবে শেয়াল। কিন্তু...কোথায় শেয়াল? বনের কোনোখানে শেয়ালের ল্যাজের ডগা দেখা গেল না! সে একেবারে উবে গেছে।

সকলে খুব গালি-গালাজ করতে লাগলো...ফাঁকিবাজ...বাক্যিবাগীশ···পাজী···

ছুঁচো বললে—আমি যে ছুঁচো ছুঁচোমি করি, শেয়াল আমার চেয়েও ছুঁচোমি করে।

পশুরাজ বললে—তাকে গালাগাল দিলে তো পুকুর-কাটার কাজ শেষ হবে না। এসো, তার পালা আমরা সকলে মিলে সারি।

সকলে মিলে লাগলো তখন পুকুর-কাটা শেষ করতে...

কাটা শেষ হলো। পাতাল পর্য্যন্ত খোঁড়া। হুড়হুড় করে জল উঠে পুকুর ভর্ত্তি। অথৈ অতল জল···ফটিকের মতো ঝকঝক করছে! আর খেতে কি মিষ্টি...যেন সরবৎ! জানোয়ারদের মহা-আনন্দ! আর ভয় নেই! মনের আনন্দে সকলে সে পুকুরে প্রাণ ভরে যত-খুশী জল খাবে, স্নান করবে।

পশুরাজ বললে—সব তো হলো। এখন আসল কাজ বাকী। শেয়াল যেমন ফাঁকি দেছে···তাকে জব্দ করবো। নিয়ম হোক, যারা এ পুকুর খুঁড়েছে, তারাই শুধু এর জল সরবে...তারা ছাড়া আর কেউ এ পুকুরে স্নান করলে কিম্বা এর জল খেলে তার গর্দ্দানা যাবে!...

পুকুরের চার পাড়ে বড় বড় কাঠে মোটা অক্ষরে লিখে দেওয়া হলো—

যারা এ পুকুর খুঁড়েছে, তারা এ জলের মালিক। মালিক ভিন্ন অপরে এ পুকুরে স্নান করলে বা এ পুকুরের জল খেলে তার গর্দ্দানা যাবে।

শেয়াল আড়ালে-আড়ালে দেখে···ঝোপে-ঝাপে লুকিয়ে থেকে শোনে এদের শলা-পরামর্শ। তারো জল চাই···খাবে, স্নান করবে। জলের সন্ধানে কোথায় যাবে? সে ভাবলো, হায়রে যুক্তি!...তোমরা যত আইন-কানুন করো, শেয়াল হয়ে শেয়ালের বুদ্ধি নিয়ে সে আইন-কানুনের আগড় যদি না ভাঙতে পারলো তো মিথ্যা সে শেয়াল-জন্ম নেছে! তা ছাড়া কথায় বলে বজ্জর্ আঁটুনি, ফস্কা গেরো!···

ফন্দী করে শেয়াল করলে কি,...ভোরে সুয্যি ওঠবার আগে বন যখন নিশুতি, সেই সময়ে সে আসে পুকুরে স্নান করতে। অথৈ অতল জল...রাতের হাওয়ায় চমৎকার ঠাণ্ডা···মনের আনন্দে শেয়াল ডুব দেয়···সাঁতার কাটে···আঁজলা-আঁজলা জল খায়। খেয়ে তারপর...কলসী নিয়ে আসে, সেই কলসী ভরে জল নিয়ে নিজের গর্ত্তে ফেরে। এ জল নিজে খাবে, শেয়ালনী খাবে,

ছানাপোনারা খাবে। এমন নিঃশব্দে এ কাজ করে···যে কাক-পক্ষী যে অত ভোরে ওঠে, সে ও টের পায় না।
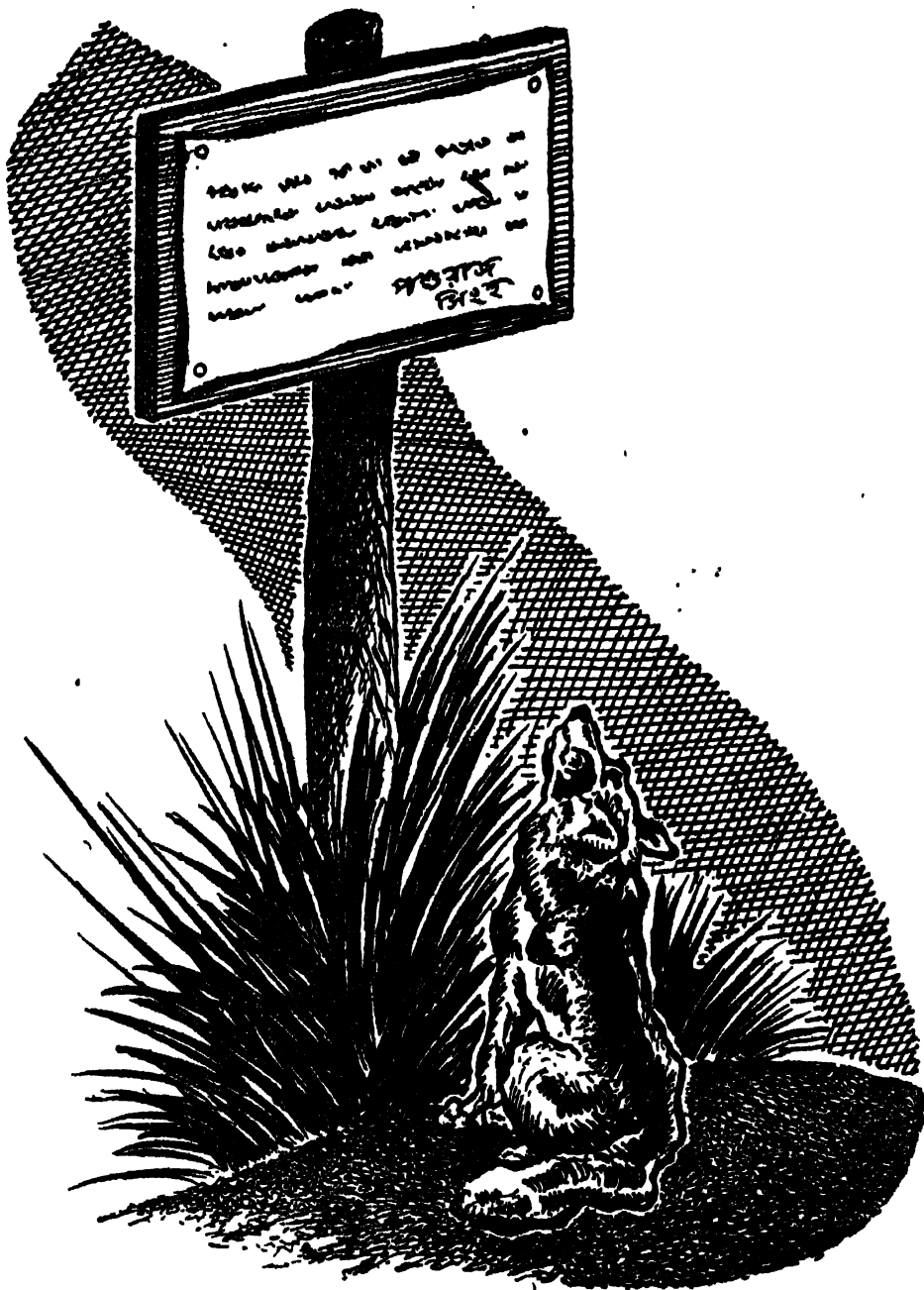
এমনি করে শেয়াল রোজ আসে পুকুরে জল সরতে···স্নান করে, জল খায়, জল নিয়ে যায়··· জানোয়াররা বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারে না।

কিন্তু জাতে শেয়াল…দুষ্টু বুদ্ধি না খেলালে তার জাতের ধর্ম্ম থাকবে কেন? ওরা যেমন শেয়ালকে একঘরে করেছে…শেয়াল ভাবলো, সেও তেমনি জানোয়ারদের দেবে শিক্ষা! সে-শিক্ষা দেবার জন্ম শেয়াল করলে কি, স্নান সেরে বাড়ীর জন্ম এক-কলসী জল ভরে নিয়ে কাদা-পাঁক ঘাঁটকে পুকুরের জল ঘোলা করে দিয়ে বাড়ী ফিরলো।…

বেলা হলে জানোয়াররা এলো পুকুরে স্নান করতে, জল নিতে। এসে দেখে, জল কাদা-ঘোলা…একেবারে যাচ্ছেতাই নোঙরা!

সিংহ বললে—জল ঘোলা করলে কে? অমল ফটিকের মতো পুকুরের জল…

হাতী বললে—তাই তো! আমার এত-বড় দেহ নিয়ে আমি স্নান করি…কত সাবধানে…জল কখনো ঘোলা হয় না!

গণ্ডার বললে—আমি গায়ের পাঁক মুছে তবে জলে নামি স্নান করতে…

মোষ বললে—কাদা-পাঁক না মাখলে আমার খিদে হয় না…আমিও জল ঘোলা করি না।

বাঘ বললে—চার পাড়ে কাঠে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে…

ইঁদুর বললে—এ কোনো দুষ্টু জানোয়ারের কাজ, নিশ্চয়!

পশুরাজ বললে—হুঁ… কিন্তু কে সে দুষ্টু জানোয়ার?

কেউ ঠিক করতে পারলো না। তখন সকলে মিলে জল সাফ্ করে স্নান সেরে যে যার ঘরে ফিরলো…সেদিনকার মতো।

পরের দিন স্নান করতে এসে সকলে দেখে, আবার সেই ব্যাপার!…জল কাদা-ঘোলা…

উপরি-উপরি চারদিন এমনি ধারা। বাঘ বললে—কোনো বদমায়েস জানোয়ার ইচ্ছা করে জল ঘোলা করে দিয়ে যাচ্ছে!

সিংহ বললে—হুঁ। সে বদমায়েসকে ধরতে হবে!

হাতী বললে—চৌকিদার বহাল করুন পশুরাজ!

কে করবে চৌকিদারী? বুড়ো কচ্ছপ বললে—আমি করবো।

ইঁদুর বললে—কিন্তু ভারী হুঁশিয়ার, দাদা!…আমার মনে হয়, এ কাণ্ড…

তার মুখের কথা লুফে বাঘ বললে—শেয়ালের…নির্ঘাৎ…নিঃসন্দ!

বানর বললে—হুঁ…না হলে তার ল্যাজের ডগা দেখি না কোথাও…ভাবো, সে চুপ করে থাকবার জানোয়ার?

পশুরাজ বললে—হুঁ…

বাঘ বললে—হালুম…হুম!

হাতী বললে—কি করে ধরবে? হাতে-নাতে ধরা চাই মোদ্দা।

কচ্ছপ বললে—আমি ধরবো। তোমরা শুধু এক কাজ করো…দুপুর রাতে আমি এসে পুকুরের পাড়ে বসবো খোলার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে।' তার আগে তোমরা আমার খোলার উপর খুব পুরু করে

চট্‌চটে মোম মাখিয়ে দিয়ে যাবে। ব্যস্‌! রাত জেগে পাহারা দিয়ে আমি ঠিক ধরবো সে-বদমায়েসকে।

তাই হলো। রাত্রে ইঁদুর এসে ল্যাজে করে কচ্ছপের খোলায় কষে মোম ল্যাব্‌ড়ালো··· চট্‌চটে আঠার মতো মোম। মোম মাখিয়ে ইঁদুর গেল বাসায়। কচ্ছপ তার মুখ আর পাগুলো খোলার মধ্যে পুরে জলের কিনারায় পাথরের চাঙড়ের মতো পড়ে রইলো—নিথর! দেখলে কে বলবে, কচ্ছপ! মনে হবে, বড় একখানা পাথর পড়ে আছে!

সারা রাত কেটে গেল···ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে···কচ্ছপ শুনলো ঝোপের মধ্যে শুকনো-পাতায় পায়ে-চলার খশখশ শব্দ! কচ্ছপ কাণ খাড়া করে আছে···শব্দ এগিয়ে আসছে··· আরো এগিয়ে···কচ্ছপ নিশ্বাস বন্ধ করে একদম নিঃসাড়...যেন পাথর!
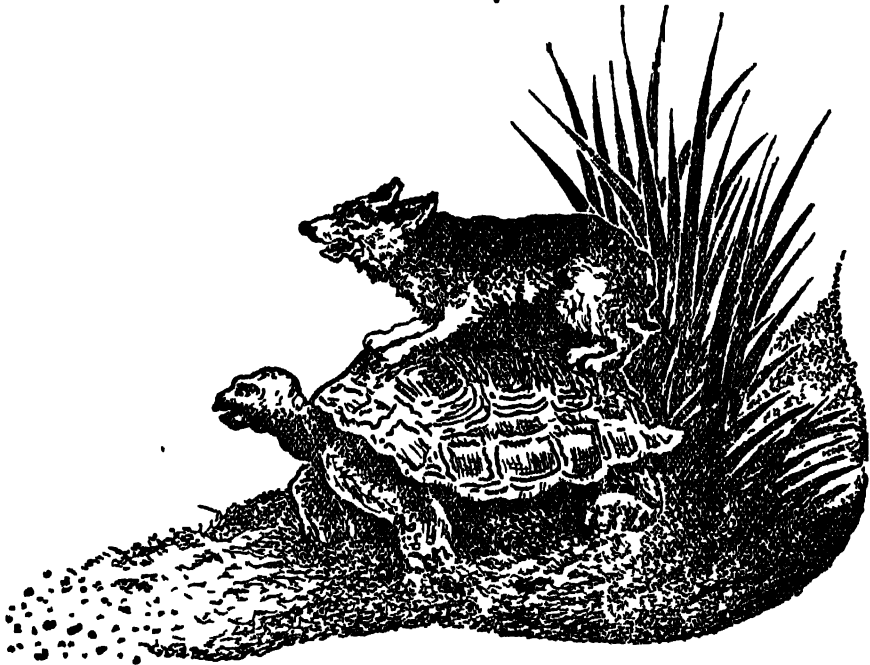
শেয়াল এলো পুকুরের পাড়ে। তারপর জলে নামা। পুকুরে ঘাট নেই··· শেয়াল দেখলো, জলের কোলে মস্ত একখানা পাথর পড়ে আছে। বাঃ, চমৎকার! শেয়াল ভাবলো, যেন শাণ-বাঁধানো ঘাট! স্নান করে ফেরবার সময় ঐ পাথরে পা দিয়ে ফিরবে...পায়ে কাদা লাগবে না।

স্নান করে কলসীতে জল ভরে উঠে সামনের দু'পা সে দিলে তুলে সেই পাথরের উপর···আর যায় কোথা? কচ্ছপের খোলায় আঠার মতো জ্যাব্‌জেবে মোম···সেই মোমে তার পা দুখানা গেল সেঁটে। শেয়াল হ্যাঁচকা টান মারে···তবু সে আঠা থেকে পা আর ওঠে না!

শেয়াল প্রমাদ গণলো…এ কি আপদ!…তখন পিছনের পা-দুখানা দিয়ে মারলো জোরে লাথি পাথরখানার গায়ে। যেমন মারা, সে দু'খানা-পাও অমনি গেল মোমে সেঁটে আটকে। শেয়ালের অবস্থা…সে আর বলবার নয়!

শেয়াল বুঝলো, বন্দী!…হুয়া-হুয়া ক্যা-ক্যা-হুয়া করে চীৎকার! তারপর শেয়াল বললে—ছাড়্, ছাড়্, ছাড়্…ওরে আমায় ছাড়্। এ চালাকি সত্যি আমার ভালো লাগচে না!

খোলার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কচ্ছপ বললে হেসে—তুমি ভাবো, তুমি একাই শেয়ান্! এঁ্যা? হাঃ হাঃ হাঃ…

শেয়াল বললে—হুয়া-হুয়া! ওরে ছেড়ে দে, কচ্ছপ…নাহলে কামড়ে তোর খোলা আমি ছিরকুটে দেবো।

কচ্ছপ বললে—দিয়ো…তার আগে আমার পিঠে চড়ে চলো তো বাপু পশুরাজের কাছারিতে… …হাঃ হাঃ! দিব্যি রথে চড়ে যাবে! বলে, বাবে-বারে তুমি যাদু খেয়ে যাও ধান, এবারে তোমার আমি বধিব পরাণ! হা হা…হা…হা…হা… .

শেয়ালকে পিঠে করে কচ্ছপ চললো পশুরাজের কাছারিতে। শেয়ালের প্রাণপণ-চেষ্টা…আঠা থেকে পাগুলোকে উদ্ধার করবে…কিন্তু হিমসিম খেয়ে গেল ..গায়ে দর-দর ধারে ঘাম ঝরছে… কী আঠালো মোম…একখানা পা-ও তার নড়লো না!… হাঁ করে কচ্ছপের পিঠে কামড় বসাতে গেল…কিন্তু মোমে যেমন মুখ লাগা…মুখখানাও গেল আঠায় আটকে! শেয়ালের তখন এক বিদিকিচ্ছি মূর্ত্তি!

শেয়ালকে নিয়ে কচ্ছপ এলো পশুরাজের কাছারিতে।

শেয়ালের চীৎকারে পথে জন্তু-জানোয়ারের ভিড় জমে গেল। তারাও এলো সঙ্গে সঙ্গে কাছারিতে।

বিরাট সভা। পশুরাজ সভায় বসে…কচ্ছপ বললে—চোরকে ধরে এনেছি পশুরাজ…

সে-মূর্ত্তির পানে চেয়ে পশুরাজ অবাক! শেয়ালকে চেনা যায় না…কচ্ছপের পিঠে চার ঠ্যাঙ এক হয়ে এঁটে আছে…মুখখানাও চার ঠ্যাঙের সামনে আঠায় সেঁটে আছে…

পশুরাজ বললেন—কে এ?

কচ্ছপ বললে—আজ্ঞে, চতুর-চূড়ামণি শেয়াল।

পশুরাজ বললে—হুঁ…বটে!

জানোয়াররা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো—দশ দিন চোরের, একদিন সাধের। ওকে ছাড়া হবে না পশুরাজ—ভীষণ সাজা দিন, যাতে করে জন্মের মতো ও ঢিট হয়।

পশুরাজ বললে—তাই হবে। এ্যায়সা সাজা দেবো যে শেয়াল-জাতটা তাতে থরহরি কম্পমান থাকবে…এর পর থেকে।

পশুরাজ চাইলো শেয়ালের পানে, বললে—শোনো, কাল তোমার প্রাণদণ্ড হবে। চিরদিন বন্ধুর মতো বাস করেছো···তার জন্য একটু অনুগ্রহ করবো এই যে কিভাবে তুমি মরতে চাও, বলো···তোমার সে-ইচ্ছা পূরণ করবো।

শেয়াল বললে—আপনার অসীম অনুগ্রহ, পশুরাজ···কিন্তু কাল পর্য্যন্ত আমাকে এমনি কচ্ছপের পিঠে সেঁটে থাকতে হবে? আমার তাতে আপত্তি নেই অবশ্য···তবে কচ্ছপ-বাহাদুরের কষ্ট হচ্ছে! মানে···

বাঘ বললে—থামো! কচ্ছপের জন্য আর তোমাকে দরদ দেখাতে হবে না। কাল পর্য্যন্ত তোমাকে রাখবার ব্যবস্থা পশুরাজই করবে!

সিংহ বললে—ওকে তুলে সরিয়ে কচ্ছপকে আগে মুক্তি দাও···তারপর শেয়ালের কথা শুনবো···কি ভাবে ও মরতে চায়!

হাতী এলো এগিয়ে···শেয়ালকে শুঁড়ে জড়িয়ে কচ্ছপের পিঠ থেকে নিলে তুলে; সঙ্গে সঙ্গে পশুরাজের হুকুমে গণ্ডার এসে দাঁড়ালো নাকে খড়্গ উঁচিয়ে শেয়ালের পাহারায়···শেয়াল না পালাতে পারে!

পশুরাজ বললে—এখন বলো, কি ভাবে মরতে চাও?

নিশ্বাস ফেলে শেয়াল বললে— অনুগ্রহ যখন করবেন, তখন আমার ইচ্ছা নিবেদন করি··· একদিন দেখেছিলুম আমাদের বানর-বন্ধুকে···একটা ধেড়ে-ইঁদুরের ল্যাজ ধরে আচ্ছাসে চর্কীপাক ঘুরিয়ে তাকে এক মোটা গাছের গায়ে দিয়েছিল ছুড়ে ধাঁইশে ভীষণ জোরে, গাছে লাগবামাত্র ইঁদুরের দেহখানা ছিঁড়ে কুটে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। আমি সেই ইঁদুরের মতো মরতে চাই। মানে, আমার ল্যাজ ধরে বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে ছুড়ে দেবেন মোটা একটা গাছের গুঁড়ি তাগ করে···আর আমার হবে পঞ্চত্ব নয়, পশুরাজ···সহস্রত্ব-প্রাপ্তি।

পশুরাজ বললে—বেশ, তাই হবে। হায়েনা তোমার ল্যাজ ধরে বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে ঐ বিরাট যে শাল্মলী গাছ,··· ও-গাছের গুঁড়ি কাঁটাওলা···ওর গুঁড়ি তাগ করে ছুড়ে দেবে।

শেয়াল বলে উঠলো—ঠিক, ঠিক, এই তো আমি চাই! ···আমার গোটা দেহখানা অমনি হাজার টুকরো হয়ে ঝরে পড়বে···হাউই বাজির আগুনর ঝুরির মতো!

শেয়ালকে গারদখানায় বন্ধ রাখা হলো···গণ্ডার রইলো খড়্গ তুলে গারদখানার পাহারায়।

সন্ধ্যার সময় পশুরাজ এলো শেয়ালকে দেখতে···বললে—তুমি খুব ভোজনপটু···মরবার আগে কি খেতে চাও, বলো···আজ রাত্রে জন্মের মতো খেয়ে নাও। কাল থেকে আর খেতে পাবে না তো!

শেয়াল বললে—তাহলে পেট ভরে আমায় মাংস খাওয়ান পশুরাজ···মাংস পেলে আমি আর কিছু খেতে চাই না। তাছাড়া পরের জন্মে গাছ হবো, কি, পাথর হবো, গরু হবো, কি, ছাগল হবো, ঠিক নেই। আর যদি তা হই, সে-জন্মের মতো মাংস খাওয়া বন্ধ থাকবে···তাই এ-জন্মটা শেষ হবার আগে আমার বাসনা, পেট ভরে মাংস খেয়ে নিই!

পশুরাজ বললে—বেশ…একটা মস্ত ষাঁড় মারা গেছে…শুনছি, তার জ্ঞাত-কুটুম কেউ নেই… একেবারে বেওয়ারিশ লাশ। সেই ষাঁড়টা আনিয়ে দিচ্ছি, যত পারো, খাও।

শেয়াল বললে—আহাহা, দীর্ঘজীবি হোন,—অশেষ ধন্যবাদ পশুরাজ আপনার এ অনুগ্রহের জন্য!

সন্ধ্যার পর বরার পিঠে চাপিয়ে আনা হলো মরা ষাঁড়।…সেটাকে গারদখানায় দেওয়া হলো শেয়ালের সামনে। ষাঁড় দেখে শেয়াল সাজার কথা ভুলে গেল! কি নধর পুষ্ট দেহ ষাঁড়টার… আহাহা!

ষাঁড়ের দেহখানা কামড়ে ছিঁড়ে চর্ব্বিটুকু আলাদা করে রেখে পেট ভরে শেয়াল মাংস খেলো… মাংস খেয়ে তারপর সেই ডাঁই-করা চর্ব্বি থেঁৎলে থেঁৎলে হড়হড়ে করে নিজের ল্যাজে জবজবে করে মাখালো। চর্ব্বি মেখে ল্যাজ এমন হলো, সে-ল্যাজে হাত দেবামাত্র হাত যায় পিছলে!

ল্যাজের হাল দেখে খুশী হয়ে শেয়াল চুপ করে বসে রইলো…ভোরের আলো ফোটবার আশায়।

ভোরের আলো ফুটলো। গারদখানার চাবি খুলে শেয়ালকে বাইরে আনা হলো। তারপর গারদখানা থেকে নখ-দন্তওয়ালা জানোয়ারদের পাহারাদারীতে তাকে আনা হলো মশানে।

প্রকাণ্ড খোলা মাঠ…জন্তু-জানোয়ারের ভিড়ে ভরে গম্‌গম্‌ করছে।…পশুরাজ বসেছে উঁচু মাচার উপর।…শেয়ালকে এনে দাঁড় করানো হলো পশুরাজের সামনে। হায়েনা নখে মাটী আঁচড়ে চার-পায়ে বেশ করে মাটী মাখাচ্ছে।

শেয়াল এসে বললে—একটা নিবেদন আছে, পশুরাজ…

—এখনো নিবেদন? বেশ, বলো।

জন্তু-জানোয়ারদের দিকে দেখিয়ে শেয়াল বললে—এঁরা তামাসা দেখতে এসেছেন…কিন্তু যেভাবে সব বসেছেন, তাতে বিপদের ভয় আছে।…মানে, হায়েনা যখন আমার ল্যাজ ধরে বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে শাল্মলী-গাছের গুঁড়ি তাগ করে ছুড়ে দেবে…তখন, ধরুন, বলা যায় না, দৈব…মানে, ধরুন, গাছের গুঁড়িতে না লেগে আমি যদি ছিটকে এঁদের কারো গায়ের উপর এসে পড়ি…অত জোরে পড়লে ওঁদের দেহ চুর হয়ে যাবে না?

একটু চিন্তা করে পশুরাজ বললে—হুঁ…ঠিক কথা।

শেয়াল বললে—তাই মানে, আমার নিবেদন, শাল্মলী-গাছের দিকটা ছেড়ে যেন ওঁরা বসেন… তাহলে আর কি, তেমন বিপদের ভয় থাকে না!

পশুরাজ আবার ভাবলো, ভেবে বললে—ঠিক কথা। এ-কথা আমাদের মাথায় আসেনি তো।

বাঘ বললে—মরবার সময় শুভবুদ্ধি হয়েছে শেয়ালের…ভালো! ভালো!

জন্তু-জানোয়াররা পশুরাজের কথায় শাল্মলী-গাছের দিক ছেড়ে অন্য দিকে বসলো।

পশুরাজ বললে—আর কোনো নিবেদন আছে তোমার ?

শেয়াল বললে—আজ্ঞে না, পশুরাজ ! ঐটিই শেষ।

পশুরাজ ডাকলো—হায়েনা…

হায়েনা বললে—আমি তৈরী।

পশুরাজ বললে—ধরো শেয়ালের ল্যাজ…ধরে'…

বাঘ বললে—হ্যাঁ, খুব জোরসে ধরবে…তারপর ঘুরোনো।

হায়েনা ধরলো শেয়ালের ল্যাজ…কিন্তু যেই তুলবে…ল্যাজে হড়হড়ে চর্ব্বি মাখানো…ল্যাজ গেল ফশকে।…পায়ে আবার হায়েনা মাটী মাখালো…মাটী মাখিয়ে পা দিয়ে আবার চেপে ধরলো শেয়ালের ল্যাজ…ল্যাজ তবু ফশকায় !

ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে ল্যাজের ডগাটুকু হায়েনা কোনোমতে চেপে ধরলো। তারপর যেমন তুলে ঘোরানো…দু-পাক ঘোরাতেই তার পা ফশকে শেয়াল পড়লো ছিটকে…বেশ খানিকটা দূরে। পড়েই গাছের দিকটা ফাঁকা…সেদিকে কোনো জন্তু-জানোয়ার নেই…শেয়াল দিলে ছুট…চোঁচা ছুট ! রাত্রে পেট ভরে মাংস খেয়ে গায়ে রীতিমত জোর …তার উপর কথায় বলে, প্রাণ নিয়ে পালানো… চোখে কারো পলক পড়লো না…জন্তু-জানোয়াররা ব্যাপার বোঝবার আগেই শেয়াল একেবারে ছুটে পগার পার…নাগালের বার !

পশুরাজ বললে,—আরে, আরে, সব দেখছো কি ! ওকে ধরো…ধরো…

জন্তু-জানোয়াররা অনেক ছুটোছুটি করলে…বনের খোলা জায়গায়…ঝোপে-ঝাপে কত সন্ধান ! শেয়ালের ছায়াও কেউ দেখলো না কোনোখানে !

এক বুড়ো আর তার বুড়ী। দুজনেই রোগা-চিম্‌সে···হাড় জির-জির করছে। দেখলে মনে হয়, যেন কাঠি!···বুড়ো-বুড়ী ভারী গরীব। ভিক্ষা করে খায়-দায়। গাঁয়ের লোক শেষে চটে গেল···বলে—চিরজন্ম ভিক্ষা করে খাবি? চাল-ডাল এখন আগুনের দর···কোনোমতে তাতে আমাদের দিন চলে—এর থেকে ভিক্ষা। না বাপু, ভিক্ষা আর মিলবে না···পথ ছাখো।

গাঁয়ে ভিক্ষা বন্ধ···ভিন-গাঁয়ে কে যায় কষ্ট করে! বুড়ো-বুড়ী তখন চুরি ধরলো।

সেদিন এক পড়শীর ঘরে গিয়ে দুজনে ঢুকেছে··· পড়শী ঘরে একা···জ্বরে কাঁথা-মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে ধুঁকছে, উঠতে পারে না···ঘরের কোণে ছিল তার এক-কলসী কড়ি···বুড়ো-বুড়ী ঘরে ঢুকে তার সেই কড়ির কলসী চুরি করে বেরিয়ে এলো।

পড়শী চেঁচিয়ে উঠলো—ওগো আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল গো···

চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কাঁথা-মুড়ি দিয়ে পড়শী এলো পথে···সমানে চ্যাঁচাচ্ছে—আমার সব নিয়ে গেল চোরে··· এক-কাঁড়ি কড়ি গো,···এক-কাঁড়ি কড়ি! হায় হায়! হায় হায় হায়!

তার চীৎকার শুনে পাড়ার পাঁচজন বেরিয়ে এলো···বললে—কে? কে? কে নেছে?

পড়শী বললে—কে আবার,? ঐ চিমসে বুড়ো-বুড়ী···

তারা বললে,—হুঁ। তা, জ্বর-গায়ে তুমি আর বেরিয়ো না···ঘরে গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো। আমরা করছি তোমার কড়ি উদ্ধার।

কড়ি-পড়শীকে বাড়ী পাঠিয়ে পাড়ার পাঁচজন এলো বুড়ো-বুড়ীর ঘরে···বুড়ো-বুড়ী এর মধ্যে ঘরে এসে কড়ির কলসীটা বাড়ীর পিছনে যে ঝাঁকড়া বড় গাছ, সেই গাছের মগ-ডালে পাতার আড়ালে বেঁধে রেখে ঘরে এসে বসে দম নিচ্ছে,—সেই পাড়ার পাঁচজন এসে তাদের ঘরে দাঁড়ালো।

পাঁচজন এসে বললে,—দে, দে বার করে শীগগির পড়শীর কড়ির কলসী···শীগগির দে, বলছি।

চোখ কপালে তুলে বুড়ো-বুড়ী বললে—ওমা, সে কি কথা! না হয় দুঃখী-ভিখিরী মানুষ ভিক্ষাই দেবে না, তা বলে এমন চোর-অপবাদ!

পাঁচজন বললে—নে, নে, ন্যাকামি করতে হবে না। শীগগির দে কড়ির কলসী।

জিভ কেটে বুড়ো-বুড়ী বললে—অমন কথা বলো না মশাইরা…আমরা কি জানি কড়ির কলসী?

পাঁচজন তখন বুড়ো-বুড়ীর ঘর তল্লাশ করলে—উনুনের ছাই ঘেঁটে, কাঁথা-কানি উল্টে…কিন্তু কোথাও কড়ির কলসী মিললো না।…কলসী কি, একটা কড়ির চিহ্ন পাওয়া গেল না।

হাঁফ ছেড়ে বুড়ো-বুড়ী বললে—দেখলে তো মশাইরা…কড়ি পেলে? বলছি, আমরা চুরি করিনি!

বুড়ো-বুড়ী যাই বলুক, পাঁচজন তাদের কথায় কাণ দিলে না। তাদের বিশ্বাস, বুড়ো-বুড়ী চুরি করেছে…চুরি করে ঘরে নয়, আর কোথাও কড়ির কলসী এর মধ্যেই সরিয়েছে।

তারা বললে—শীগগির বার করে রাখ্, বলছি। আমরা এখনি ফের আসচি ঘুরে। এবারে আসবো ছিপোর চামড়ার চাবুক নিয়ে। কড়ি না পাই, সেই চাবুকের চোটে তোদের হাড়গুলো চামড়া থেকে খশিয়ে আলাদা করে ছাড়বো!

বুড়ো-বুড়ী বললে,—ন্যাও, শোনো কথা! জানিনা…নিইনি…তবু…বলো, চাবুক মারবো!

লোকেরা বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চাবুক নিয়ে আসছি…ভালো কথায় বলে গেলুম, কলসী বার করে রাখ্—না হলে চাবুকের চোটে…

এ-কথা বলে পাড়ার পাঁচজনে গেল হিপোর চামড়ার চাবুক আনতে।…

বুড়ো-বুড়ী চট করে ঝাঁকড়া-গাছে উঠে গাছ থেকে কড়ির কলসী পেড়ে চালের বাতায় শুকনো পাতাগুলোর মধ্যে লুকিয়ে রাখলো…রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনে ছুটলো জঙ্গলের দিকে…জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে বলে।…

কিন্তু রোগা চিম্‌সে দেহ…তার উপর খায়না-দায়না…কত ছুটবে? পাড়ার পাঁচজন ওদিকে চাবুক নিয়ে এলো। বাড়ীতে বুড়ো-বুড়ীকে না পেয়ে সকলে পথে বেরুলো তাদের খোঁজে!

খুঁজতে খুঁজতে তারাও এলো জঙ্গলের পথে… বুড়ো-বুড়ী পিছন ফিরে দেখে, পাড়ার পাঁচজন এসে পড়েছে! যদি ধরে ফেলে? জঙ্গলে ঢুকেই একটা বড় গাছ…বুড়ো-বুড়ী ধাঁ করে উঠে বসলো সেই বড় গাছের মগ-ডালে…পাড়ার পাঁচজনও এসে পৌঁছুলো সেই ঝাঁকড়া গাছের নীচে।

উপর-দিকে চেয়ে তারা বুড়ো-বুড়ীকে দেখলো,—দেখে তারা বললে,—কতক্ষণ ওখানে থাকবি? নামতে হবে না? আমরা এই গাছতলায় মাটী চেপে বসলুম…নড়বো না। যেমন নামবি, পিঠে এই চাবুক…

লম্বা লম্বা পাঁচখানা চাবুক তুলে পাঁচজনে দেখালো।

বুড়ো বললে বুড়ীকে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ওরা চলে যায়, আমরা এ গাছ থেকে নামবোনা বুড়ী।

বুড়ী বললে—না, কক্‌খনো না।

পাঁচজনে শুনলো বুড়োর কথা…শুনে তারা বললে—আমরাও নড়বো না…যতক্ষণ না তোরা নামিস! বসলুম সকলে গট্ হয়ে এই গাছতলায়।

গাছের উপরে বুড়ো-বুড়ী চুপ…গাছতলায় এরা পাঁচজনও চুপ…কারো এতটুকু নড়ন নেই, চড়ন নেই। অনেকক্ষণ…তারপর বুড়ো বললে বুড়ীকে—ওরা যখন খেতে যাবে, বুঝলি বুড়ী, সেই তক্কে…নেমেই ভোঁ দৌড়।

এ-কথাও পাঁচজনে শুনলো…পাঁচজন বললে—আমরা খাবো না…না খেয়ে এখানে বসে থাকবো।…তোদের খেতে হবে না? তখন?

বুড়ো-বুড়ী আবার রইলো চুপচাপ—ও-পাঁচজনও তাই।

তারপর বুড়ো বললে বুড়ীকে—বুঝলি বুড়ী…না খেয়ে ওরা কদ্দিন বসে থাকবে? হুঁ…যেদিন যাবে, সেইদিন…

পাঁচজন বললে—আমরা এখান থেকে নড়বো না। যতদিন না তোরা নামবি, এখানে এই গাছতলায় চালা বেঁধে আমরা সেই চালায় থাকবো—পালা করে-করে বাড়ী গিয়ে নেয়ে খেয়ে আসবো…এইখানেই থাকবো। দেখি তোদের কত মুরোদ!

তাই হলো। গাছতলায় চালা বেঁধে সেই চালায় পাঁচজনে থাকে···পালা করে এক-একজন বাড়ী গিয়ে নেয়ে-খেয়ে আসে।

এমন ভাবে অনেকদিন গেল কেটে। দিনের পর হপ্তা...হপ্তার পর মাস...মাসের পর বছর ফিরতে যায়, গাছে যত ফল ছিল, খিদের জ্বালায় বুড়ো-বুড়ী সব ফল মুড়িয়ে খেয়ে শেষ করলো! গাছে আর একটি ফল নেই! তখন তারা খেলো সেই সব ফলের বোউল···তারপর খেলো গাছের যত কচি পাতা। কচি পাতাও খেয়ে নিঃশেষ···তখন দুজনে খেলো বড় বড় শুকনো পাতাগুলো··· তারপর গাছের ছাল কামড়ে খেতে লাগলো! গাছে বসে আছে দুজনে···কারো চোখে ঘুম নেই... ঘুমোলে ডাল থেকে যদি ঝুপ করে পড়ে যায়!...

এমনি খেয়ে-খেয়ে আর এমনিভাবে থেকে-থেকে দুজনের দেহ হলো শেষে আরো চিমসে···শুটিয়ে দেহ ছোট হলো! ঘুম নেই বলে চোখগুলো গেল কোটরে ঢুকে! গাছের ছাল আর ফলের আঁঠি খেতে খেতে দাঁতগুলো হলো যেমন লম্বা তেমনি ধারালো···পায়ের নখ হলো এত বড় বড়...যেন জানোয়ারের, না, পাখীর নখ!

একদিন বুড়ো বললে বুড়ীকে—আমার হাতের চামড়া ছ্যাখ...কি রকম শক্ত টাইট্ হয়ে উঠেছে।

বুড়ী তার হাত বাড়িয়ে বুড়োকে দেখালো, বললে—তোর হাত দেখাচ্ছিস কি! আমার হাত ছ্যাখ্···ছ্যাখ্ আমার হাত টিপে···একটুও মাষ্ নেই রে!

পায়ের দিকে চেয়ে দুজনে দেখে, দুজনের পাগুলো হয়েছে লিকলিকে সরু···গায়ের চামড়া টাইট...যেন আঁট-পাজামা পরেছে!

বুড়ো বললে—কি আশ্চয্যি···এঁ্যা?

বুড়ী বললে—তাইতো!

বর্ষা নামলো...বৃষ্টির জলে ভিজে বুড়ো-বুড়ী ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো...

তারপর একদিন সকালে রোদ উঠলে বুড়ো বললে বুড়ীকে—আমার সর্ব্বাঙ্গে কি ঘন লোম বেরিয়েছে রে···ছ্যাখ্...

বুড়ী বললে—আমারো···এই ছ্যাখ্।

বুড়ো বললে—ইস্! তোকে চেনা যায় না বুড়ী।

বুড়ী বললে—তোকে দেখলেও কে বলবে, তুই সেই বুড়ো!

সত্যই তাই···দেখলে কে বলবে, সেই বুড়ো-বুড়ী! ক' বছর আগে একদিন এ গাছে চড়েছিল যে বুড়ো-বুড়ী, এরা তারাই?

আর একদিন...সকালে বুড়ো বললে—আমার শিরদাঁড়াটা কেমন টন্‌টন্ করছে বুড়ী···

বুড়ী বললে—আমারো রে···উহুহু···

তারপর আর একদিন বুড়ো বললে বুড়ীকে—তোর পিছনে ও কি? এঁ্যা…ল্যাজের মতো?

বুড়ী বললে—ও-বুড়ো, তোর যে দেখছি দিব্যি ল্যাজ গজিয়েছে!

পিছন-দিকে হাত বুলিয়ে বুড়ো দেখে, তাই তো!…ল্যাজই!

বুড়ো বললে বুড়ীকে—দুজনের চেহারা যা হয়েছে, এখন গাছ থেকে নামলে ওরা চিনতে পারবে না!

বুড়ী শিউরে উঠলো…বললে—না, না…অমন কাজও করে!…বাপরে!

বুড়ো বললে—কিন্তু বাঁচতে হবে তো। এ গাছে একটা ফল নেই, পাতা নেই যে খাবো।…অন্য গাছে গিয়ে উঠতে হবে। নাহলে মারা যাবো যে।

বুড়ী বললে—দেহগুলো কেমন যেন হালকা মনে হচ্ছে! দেখবো একবার লাফিয়ে ঐ পাশের গাছের ডালটা ধরতে পারি কি না? হাত দুটো হয়েছে পায়ের মতো লম্বা, তার উপর ওদিকে আছে লম্বা ল্যাজ! তাতে ভর দিয়ে…কি বলিস?

বুড়ো বললে—চেষ্টা করে দেখি আয়…কিন্তু খুব সাবধানে বুড়ী…

বুড়ী বললে—নিশ্চয়!

বুড়ো-বুড়ী মিলে তখন এ গাছের কাছাকাছি আর একটা যে-গাছ ছিল, লাফ দিয়ে সেই গাছের ডালে পড়ে ও গাছের ডাল ধরে ফেললো।

তারপর থেকে দুজনের গাছে-গাছে বাস…মাটিতে নামতে পারে না—লাফ দিয়ে দিয়ে শুধু গাছ বদল করে।

খায় দায়, নিশ্চিন্ত মনে থাকে…সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হলো দুজনের।

তারপর তাদের ছেলেমেয়ে হলো।…অনেকে বলে—সেই থেকেই বানর-জাতের সৃষ্টি।

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা···জন্তু-জানোয়াররা যখম বনে গাঁ তৈরী করে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাস কবতো···সেই তখনকার কথা বলছি :

এক কুমীর—তার খুব বাগানের সখ। নদীর ধারে মস্ত বাগান করেছে—বাগানে ফল-ফুলের কত গাছ। যখন খুশী জল থেকে উঠে কুমীর সেই বাগানে আসে···ফল-ফুলের তদ্বির করে···বাগানে শুয়ে ঘুমোয়...আবার খুশী হলে জলে নেমে যায়।

একদিন কলা-ঝাড়ের পাশে শুয়ে কুমীর রোদ পোহাচ্ছে···এক খরগোশ এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

কুমীরকে দেখে খরগোশ বললে—খাশা আছো তুমি কুমীর-কাকা···ভাবনা নেই, চিন্তা নেই··· শুধু স্নান, আহার, নিদ্রা। বাঃ!

কুমীর উঠলো ধমকে—বললে—যা, যা, ডেঁপোমি করতে হবে না। আমাকে ঘুমোতে দে···

এ কথা বলে কুমীর চোখ বুজলো। খুব ঘুম পেয়েছে...চোখ বুজতেই কুমীর ঘুমিয়ে পড়লো।

খরগোশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছে...গাঢ় ঘুমে কুমীরের শেষে নাক ডাকা সুরু হলো। তখন খরগোশ দেখে, যে-কলাঝাড়ের ধারে শুয়ে কুমীর ঘুমোচ্ছে, সে-ঝাড়ের একটা গাছে কলার এত বড় কাঁদি···কলার ভারে কাঁদিটা নুয়ে পড়েছে···ঠিক কুমীরের নাকের কাছে! আর সে কাঁদির কলায় পাক যা ধরেছে...কলার রঙ কাঁচা সোনার মতো!

দেখে তার জিভ্ লক্‌লকিয়ে উঠলো। পায়ে পায়ে খরগোশ এলো এগিয়ে...ঝুলন্ত একটা পাতা ধরে কাঁদিটাকে টানবে, এমন সময় পাতার ছোঁয়া লাগলো কুমীরের গায়ে।...সে-ছোঁয়া লেগে কুমীরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে কুমীর বললে—এখনো এখানে দাঁড়িয়ে···উঁ। কি করছিলি? কলা চুরি?

খরগোশের মনে ভয়ানক লোভ...খরগোশ বললে—চুরি নয়, কাকা। কলা পেকেছে, দেখছি··· তুমি তো কলা খাওনা···দাওনা আমাকে কাঁদি থেকে ···বেশী নয়, দুটি কলা!

—না, না, না! ভাগ্ বলছি এখনি। কুমীর উঠলো ধমকে···বললে—কলা আমি খাইনা, তাতে কি! সখের জন্য বাগান করেছি···সখের জন্য পুঁতেছি কলা-গাছ...সে গাছে কলা হয়েছে·· দেখেই আমার সুখ!—যা, কলা পাবি নে। চলে যা, বলছি, আমার বাগান থেকে···নাহলে এমন কামড় দেবো যে নিজের নাম ভুলে যাবি।...

এ কথা বলে কুমীর হাঁ করলো···বড় বড় ধারালো দাঁতের পাটি ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো··· যেন কতকগুলো ধারালো সড়কি!

দেখে খরগোশ সুড়্‌সুড় করে চলে এলো···কিন্তু তার মেজাজ রইলো চটে।

চটে খরগোশ ঘরে এলো। ঘরে এসে খরগোশনীকে আর ছানাদের ডেকে বললে—কুমীরের বাগানে কি কলাই ফলেছে রে, দেখে এলুম। পেকে হলুদ-বরণ...যেন সোনা ফলেছে! দুটো খেতে চাইলুম, তা হাঁ করে একরাশ ধারালো দাঁত দেখালো! ওটা ভারী ইতর!

খরগোশনী বললে—আর যেন ও-বাগানে যেয়োনা...বদ জানোয়ার! শেষে কি জান খোয়াবে!

খরগোশ খ্যাঁক করে উঠলো—জান্ এত শস্তা নয় যে কুমীরের দাঁতে খুইয়ে বসবো।...শুধু কলা না-দেওয়া নয়···আমাকে অপমান করেছে। বলেছে—সরে পড়্ এখনি বাগান থেকে! ···তাড়িয়ে দেওয়া! এ অপমান আমি গায়ে মেখে থাকবো, বলতে চাস? কক্‌খনো না।

খরগোশনী বললে,—পাঁচটা জানোয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর যা করবার করো মোদ্দা··· নাহলে জাতে কুমীর···অমন পাজী আর আছে!

খরগোশ বললে—কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে না রে, আমার নিজের বুদ্ধিতেই ওর যে হাল করি, দেখিস'খন।···

মনে-মনে মতলব ভেঁজে পরের দিন খরগোশ বললে খরগোশনী আর ছানাদের ডেকে—তোরা আয় সকলে কুমীরের বাগানে...তামাসা দেখবি। যেতে যেতে সকলে কুড়িয়ে নিয়ে যাবো যেখানে যত পাই, খড়, শুকনো পাতা, ঘাস আর গাছের ডাল···সেই সঙ্গে চকমকি পাথর নেবো।···

কুমীরকে দেখে এলুম...বাগানে গাছের ছায়ায় পড়ে চার পা ছড়িয়ে ঘুমে অচেতন। হা-হা-হা...কী মজাই হবে!

ছানারা বললে—কি করবে বাবা?

খরগোশ বললে—কি করবো, দেখিস তখন। এখন চুপিসাড়ে সকলে আয় দিকিনি···শুকনো পাতা, ডাল, ঘাস, খড় আর কাঠি-কুটো কুড়িয়ে নিয়ে···

সকলে মিলে স্তূপাকার করে বয়ে আনলো শুকনো পাতা ঘাস খড় আর কাঠিকুটি···খরগোশ পা টিপে টিপে সেগুলোক সাজালো চক্রাকারে কুমীরকে ঘিরে। এমন চক্র-গণ্ডী করে সেগুলো সাজালো যে তার কোথাও এতটুকু ফাঁক রইলো না!

তারপর খরগোশনী আর ছানাদের বললে—তোরা যা ঐ ঝোপটার আড়ালে গিয়ে বোস্...ঐ শুকনো খড়ে আগুন লাগাবো আমি। বাজি হবে রে, বাজি! ছুঁচো-বাজি···সাপ-বাজি··· ব্যাঙ-বাজি নয়···কুমীর-বাজি। আগুন লাগিয়ে আমিও তোদের কাছে আসছি এখনি।

ছানাদের নিয়ে খরগোশনী গিয়ে লুকোলো ঝোপের আড়ালে···চকমকি ঠুকে খরগোশ সেই শুকনো পাতার আঙিলে লাগালো আগুন...

আর যায় কোথা! জোরে হাওয়া বইছে—চক্ষের পলকে শুকনো খড় পাতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো …

আগুনের আঁচ লাগচে গায়ে…কুমীরের ঘুম ভাঙলো! ঘুম ভেঙে কুমীর দেখে, বেড়া আগুনে ঘেরা! ল্যাজ নাড়তে গিয়ে ল্যাজে লাগলো ছ্যাঁকা…কুমীর ল্যাজ গুটিয়ে নিলে।

আগুনের তেজ বাড়ছে, বাড়ছে, আরো বাড়ছে…তার হল্‌কায় কুমীরের দেহ ঝলশে যাচ্ছে…সঙ্গে সঙ্গে মিষ্‌ কালো ধোঁয়া…সে ধোঁয়া কুমীরের নাকে মুখে ঢুকছে…অমনি ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ হাঁচি আর খক-খক কাসি! কুমীর কেবলি হাঁচে আর কাসে…কাসে আর হাঁচে। সে হাঁচি-কাসির বিরাম নেই… সঙ্গে সঙ্গে গনগনে আগুনের আঁচ…দম বন্ধ হয়ে আসছে!…কুমীর ভয়ে আকুল…পুড়ে মরবে? পালানো চাই…পালাতে হবে।

কিন্তু কি করে পালাবে? চারিদিকে আগুন…এতটুকু ফাঁক নেই। পালাতে গেলে গা পুড়ে একদম্ ··

তবু পালাতে হবে। পালাতে গেলে গায়ের খানিকটা পুড়বে·· কিন্তু না-পালালে গোটা দেহ নিয়ে পুড়ে ছাই হতে হবে! ল্যাজ গুটিয়ে কুমীর মারলো লাফ…পিঠের চামড়া ভয়ানক পুরু তার… পুড়লো না ··কিন্তু পেটের খানিকটা আগুনে পুড়ে গেল…সঙ্গে সঙ্গে দগ্‌দগে ফোস্কা!

কোনোমতে অগ্নিকুণ্ড থেকে কুমীর বেরুলো…বেরিয়ে পেটের জ্বালায় কাতরানি…ফোস্কাগুলো তার উপর গেল ছিঁড়ে। চিৎ হয়ে চার পা তুলে কুমীর যা করতে লাগলো…

দেখে ঝোপের মধ্যে খরগোশের ছানারা উঠলো হো-হো করে হেসে।

হাসি শুনে ঝোপের দিকে চেয়ে কুমীর দেখে, খরগোশ! একা নয়…একেবারে গুষ্ঠীশুদ্ধ।

দাঁত কিড়মিড় করে কুমীর বললে—হুঁ…এসো এবার নদীর ধারে! এতটুকু প্রাণী বলে তোর পানে কখনো ফিরে তাকাইনি। কিন্তু আর দয়া-মায়া নয়, দেখলেই টুক্ করে গালে পুরবো…

কুমীরের হুঙ্কার শুনে ছানাদের নিয়ে খরগোশনী ক্ষেত টোপকে বাসায় ছুটলো, খরগোশ গেল না। দু-পায়ে ভর দিয়ে সে খাড়া দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলো। নাচতে…নাচতে! গান

> দেখে যারে তোরা দেখে যা, আজ কুমীর কাকা চিৎ!
> ছেড়ে দেছে বুকে চলা আর, বুকে শোয়ার রীত!

পোড়া পেটের জ্বালায় কুমীর ছটফট করছে তার উপর ঐ ছড়া। কুমীর কটমট করে তাকালো, বললে—হুঁ! মজা! মজা পেয়েছো! আচ্ছা, আজকের মতো তরে গেলি! এর পর…ছানা-ধাড়ি কাকেও ছাড়বো না…খরগোশ পেলেই টুক্ করে গিলে খাবো।…হুঁ…

এ-কথা বলে সে গিয়ে জলে নামলো···খরগোশ তখন কলার কাঁদি পেড়ে সেই কাঁদি নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

এ-ব্যাপারের পর থেকে খরগোশ পারতপক্ষে নদীর ধারে যায় না···কুমীরও জল ছেড়ে ডাঙ্গায় বেশী উপরে আর আসেনা। ডাঙ্গায় বাগান করবার সখও কুমীরের জন্মের মতো মিটে গেছে!

পূর্ব্বকথা

কেপ্ কলোনির যে-কটি রূপকথা আমরা সঙ্কলিত করেছি, সেগুলি আজ দু-হাজার বছর চলিত আছে কেপ-কলোনি এবং কেপ-কলোনির সীমান্ত প্রদেশে। দিনের কাজ শেষ হলে সেখানে পাড়ায় পাড়ায় আজো বসে গল্পের আসর; এবং সে-সব আসরে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ-সকলে বসে গল্প বলে, গল্প শোনে। এমনি করে লোকের মুখে মুখে গল্পগুলি চলে এসেছে।

যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে চলে আসার দরুণ প্রতি-যুগের মনের রঙের ছোপ লেগে-লেগে গল্পে রদ-বদল হয়েছে সত্য; তা হলেও মূল প্লট বা আসল মর্ম-কথা বদলায়নি! এ গল্পগুলি পড়লে বেশ বোঝা যাবে শিক্ষা-সংস্কারের বৈচিত্র্য-হেতু দেশে দেশে মানুষের মনে যত-পার্থক্যই ঘটে

থাকুক—মানুষের আদিম মন সব দেশে ছিল একই রকম—অলৌকিকের কল্পনায় সেই এক-ধারা। সব দেশের মানুষের আদিম মন কল্পনা-জগতে একই ভাবে অবাধ বিচরণ করতে চায়—। বাস্তবের সঙ্গে মনের কল্পনা মিলিয়ে মনের ভাব-প্রকাশে সব দেশের সব-জাতের মানুষের মন সমান উৎসুক অর্থাৎ শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কারের বাহিরে কোনো দেশের মানুষের মনে অমিল নেই।

এ গল্পগুলিতে সেকালের কল্পনার সঙ্গে পর-পর নানা যুগের বাস্তবের ছোঁয়া লাগলেও পণ্ডিতরা বলেন, গল্পগুলিতে সেকালের রঙ বজায় আছে।

গল্পগুলির বয়স, পণ্ডিতদের মতে,অন্ততঃ দু-হাজার বছর।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক লোকের দুই মেয়ে। দুটি মেয়েই বড় হয়েছে। তাদের বিয়ে দিতে হবে। দু-মেয়ের বাবা একদিন নদী পার হয়ে নদীর ওপারে যে গাঁ, সেই গাঁয়ে চললো বরের সন্ধানে।

নদী পার হয়ে আসতেই সে-গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে ধরলো, বললে—ওগো ও ও-পারের গাঁয়ের মানুষ, তোমাদের গাঁয়ের খবর কি, বলো?

মেয়ের বাপ বললে—আমাদের গাঁয়ে নতুন কোনো খবর নেই, তাই তোমাদের গাঁয়ের খবর নিতে এলুম।

তারা বললে—আমাদের গাঁয়ের খবর, আমাদের সর্দ্দার বিয়ে করবে। তাই একটি কন্যার খোঁজ করছি আমরা গাঁয়ের সকলে মিলে।

এ-কথা শুনে দু-মেয়ের বাপ আর এক মিনিট এ-গাঁয়ে রইলো না, তখনি নদী পার হয়ে এপারে নিজের গাঁয়ে ফিরলো। ফিরে বাড়ীতে এসে দু-মেয়েকে ডেকে বললে—ওরে শোন্ শোন্, খুব ভালো খবর আছে। ওপারের গাঁয়ের সর্দ্দার বিয়ে করবে বলে একটি কন্যা খুঁজছে। তা তোদের দু-বোনের মধ্যে কে তাকে বিয়ে করতে চাস্…বল?

বড় মেয়ের নাম মুম্প্রিকাঁজি। সে বলে উঠলো—আমি বড়…আমার বিয়ে হবে আগে। ও ছোট…ওর বিয়ে আমার বিয়ের পরে।…আমি করবো সর্দ্দারকে বিয়ে।

বাপ বললে—বেশ, তাহলে সেজে-গুজে তৈরী হও।…আমি তোমার যাবার ব্যবস্থা করি।

মুম্প্রিকাঁজি ছুটলো সাজ-গোজ করতে। বাপ বেরুলো পাড়ায়…যেখানে যে পড়শী আছে, বন্ধু আছে, জ্ঞাত-কুটুম আছে, সকলকে ডেকে জড়ো করে নিয়ে বাড়ী ফিরলো—বাড়ী ফিরে বড় মেয়েকে বললে—কি রে বড়, তৈরী হয়েছিস?

সেজে-গুজে বড় মেয়ে তৈরী হয়েছে অনেকক্ষণ। বাপের ডাকে ঘর থেকে এলো বেরিয়ে, এসে উঠানে এত লোক দেখে বড় মেয়ে বললে—আমি তৈরী। কিন্তু এত লোক কেন? এরা?

বাপ বললে—নদী পার হয়ে ও-গাঁয়ে চলেছো বিয়ে করতে, তাও যে সে বর নয়, ও-গাঁয়ের

সর্দ্দারের সঙ্গে বিয়ে। একা-একা গেলে মান থাকবে কেন?' তাই এদের সবাইকে নিয়ে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে......কন্যা-যাত্রীর দল।

মুখ খিঁচিয়ে মুণ্ডিকাঁজি বললে—উঁহুহু। কন্যাযাত্রী আবার কি। যার বিয়ে, শুধু সে যাবে—সে করবে বিয়ে। কন্যা-যাত্রীরা তো বিয়ে করবে না। তারা কেন যাবে?

মেয়ের কথা শুনে বাপের দু-চোখ ঠিকরে পড়বার জো! বাপ বললে—কন্যার বিয়েতে কন্যার সঙ্গে কন্যা-যাত্রীদের যেতে হয়। নিয়ম। নাহলে তারা বলবে, কোথাকার কি-লোকের ঘর থেকে কন্যা এলো···কন্যার না আছে বাপ, না আছে আত্মীয়-বন্ধু, বা কোনো পড়শী। তাই এ রীত।

ভুরু কুঁচকে বড় মেয়ে বললে—ও রীত আমি মানি না। আমি একা যাবো, তোমরা কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। তোমরা গেলে আমি যাবো না।

মেয়ের যখন ইচ্ছা নয়, তখন তারা কি বলে যাবে? বাপ বললে—বেশ, আমরা তাহলে যাবো না। তুমি একাই যাও।

তাই হলো। মেয়ে একা বেরুলো পথে।

খানিক দূর গেছে...এক ইঁদুরের সঙ্গে দেখা। ইঁদুর বললে—ও কন্যে, ও কন্যে, বলি, কোথায় চলেছো গো?

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মেয়ে বললে—যেখানে যাই, তোর কি?

ইঁদুর বললে—আহা, বলোই না। বললে কি দোষ? রাগ করছো কেন?

বড় মেয়ে বললে—আমি যাচ্ছি নদীর ওপারে যে-গাঁ, সেই গাঁয়ে...সর্দ্দারকে বিয়ে করবো।

ইঁদুর বললে—বটে! বটে! তা আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে?

—তোকে! বড় মেয়ে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো! সে বললে—শোনো কথা···কোথাকার এক-রত্তি নেংটি...উনি যাবেন, আমার সঙ্গে! না, তুই যাবি না আমার সঙ্গে।

ইঁদুরকে ধমক দিয়ে বড় মেয়ে চললো হন-হন করে এগিয়ে।

যেতে যেতে খানিক-আগে দেখা ব্যাঙের সঙ্গে। ব্যাঙ বললে—ও মেয়ে, ও মেয়ে, কোথায় চলেছো এমন হন-হন করে?

বড় মেয়ে ক্ষেপে উঠলো। সে বললে—ওরে আমার গ্যাঙর-গ্যাঙ কোলা-ব্যাঙ, আমি কোথায় যাচ্ছি, ওঁকে তা বলতে হবে!

ব্যাঙ বললে—জানি গো জানি···আর বলতে হবে না। ওপারের সর্দ্দারকে বিয়ে করতে চলেছো। তা একা কেন? ভিনগাঁ। ভিনগাঁয়ে একা যেতে নেই। আমায় সঙ্গে নাও, না হলে কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে শেষে হাজির হবে!···

মুখ-ঝামটা দিয়ে বড় মেয়ে বললে—থাক্, থাক্ গর্ত্তর ব্যাঙ গর্ত্তয় থাক্ গ্যাঙর-গ্যাঙ করে আমাকে উপদেশ দেয়, আস্পর্দ্ধা কম নয়!

এ-কথা বলে বড় মেয়ে আবার পথ চলে।

চলে, চলে···যত চলে···পথ আর ফুরোয় না। চলে চলে মেয়ের পায়ে ব্যথা···তেষ্টায় টাগ্‌রা জ্বালা করছে···আর পেটে তেমনি জ্বলছে খিদের আগুন। সে একটা বড় গাছের নীচে ছায়া···মেয়ে সে

ছায়ায় বসলো। সঙ্গে পুঁটলিতে বাঁধা খাবার। পুঁটলি খুলে খাবার মুখে দেবে, এক রাখাল-ছেলে কোথায় ছাগল চরাচ্ছিল, সে এসে সামনে দাঁড়ালো...বললো—দিদিগো, দিদি, ও দিদি···

চোখ তুলে বড় মেয়ে দেখে, একটা রাখাল-ছেলে। তাকে সে চেনে না, জানে না, চোখেও কখনো দেখেনি।

রাখাল-ছেলে বললে—কোথায় যাচ্ছো দিদি?

বড় মেয়ে বললে—ওরে আমার সাত-পুরুষের ভাইরে...দিদি বলে আদর কাড়াতে এলেন! ভাগ্ ·· কে তোর দিদি?

রাখাল-ছেলে বললে—বেশ, বেশ, দিদি না হও, নাই হলে। এক-গাঁয়ে থাকি তো। তাই বলছি, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে—একটু জল দাও না গো খেতে···তোমার ঐ ঘটির জল!

মুখ বেঁকিয়ে মেয়ে বললে—দেবো বৈ-কি জল···নিশ্চয় দেবো।···তোমার জন্য আমি ঘটি করে জল এনেছি···না? যা, যা, যা বলছি আমার সামনে থেকে।

রাখাল-ছেলে বললে—ওরে বাবা, মেজাজ নয়, যেন দুপুর-রোদের ঝাঁজ! এত ঝাঁজ ভালো নয় গো! নিজেই ওতে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে!

বড় মেয়ে বলে—আচ্ছা, আচ্ছা, ছাই হই, আমি হবো। তুই এখন ভালো চাস তো চলে যা, নাহলে দেখবি এখনি মজা!

—না, আর মজা দেখতে চাই না! আমি যাচ্ছি।

এ-কথা বলে রাখাল-ছেলে চলে গেল। বড় মেয়ে জিরিয়ে খাবার খেয়ে আবার পথ চলতে সুরু করলো।

খানিক দূর গেছে, এক থুথ্‌ড়ো-বুড়ীর সঙ্গে দেখা। বুড়ীর মাথার চুলগুলো যেন শণের নুড়ি··· বুড়ী একখানা পাথরে বসে আছে!

মেয়েকে দেখে বুড়ী বললে—তুমি কোথায় যাচ্ছো, কেন যাচ্ছো, আমি জানিগো মেয়ে···তাই সে কথা জিজ্ঞাসা করবো না। তবে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো···শুনে মনে রেখো। কথা হচ্ছে, আরো খানিক দূর এগিয়ে পাবে গভীর বন। সে বনে যেমন পা দেবে, অমনি বনের গাছগুলো হো-হো করে হেসে উঠবে, তাদের সে-হাসি শুনে তুমি যেন হেসো না। খবর্দার, নয়! তার পর বন পার হয়ে দেখবে এক সরোবর···দুধ-সরোবর। সে-সরোবরের সে-দুধ মুখে দিয়ো না যেন, খবর্দার···নয়! সে-সরোবরের পর এক মানুষের সঙ্গে দেখা হবে। সে মানুষের মাথা নেই ধড়ের উপর···মাথাটা সে বগলে পুরে বসে আছে। তোমাকে সে খাবার দেবে। তার সে-খাবার খবর্দার মুখে দিয়ো না···বুঝলে? আমার এ কথাগুলি শুনো বাছা, না হলে অনর্থ হবে!

বড় মেয়ে কাণ দিয়ে শুনলো বুড়ীর কথা···শুনে মেয়ে বললে—যা, যা, শোণের নুড়ি বুড়ী··· আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না!

তবু বুড়ী বললে—ভালো কথা বললুম···না শোনো, দুঃখ পাবে!

এ কথা মেয়ের কাণেও গেল না। হন্‌হন করে সে এগিয়ে চললো।

যেতে যেতে সেই বন। বনে পা দেবামাত্র বনের যত গাছ, হো-হো করে হেসে উঠলো। মেয়ে অবাক! ভারী মজা তো! গাছ আবার হাসে? মেয়েও হেসে উঠলো।

বনের পর হুধ-সরোবর। কী ঘন হুধ···সর জমে আছে! যেন রাবড়ি! মেয়ের লোভ হলো। নেমে আঁজলা ভরে সে খেলো হুধ-সরোবরের সেই হুধ।···

তারপর আরো খানিক দূর যাবার পর সেই মানুষের সঙ্গে দেখা। ধড়ে মাথা নেই···মাথা তার বগলদাবায়! মাথা-কাটা মানুষের হু'হাতে খাবার। সে বললে—অনেক পথ হেঁটে এসেছো মেয়ে, খিদে পেয়েছে খুব। এই নাও, খাবার খাও।

চমৎকার-চমৎকার খাবার···মেয়ে খেলো সে খাবার। তারপর আবার পথ চলা।

পথের শেষে নদী। নদী পার হয়ে মেয়ে গিয়ে উঠলো সর্দ্দারের গাঁয়ের ঘাটে। ঘাটে একটি মেয়ে কলসীতে করে জল ভরছে। বড় মেয়েকে দেখে এ-গাঁয়ের মেয়ে বললে—তোমাকে দেখছি ভিন-গাঁ থেকে আসছো! তা এখানে যাবে কোথায়? কার কাছে?

মুক্তিকাঁজির যে তিরিক্ষি মেজাজ···ঝাঁজালো গলায় সে বললে—কে তুমি গো আমার সাত-পুরুষের কুটুম যে তোমাকে সব কথা বলতে হবে!

এখন এ মেয়েটি হলো এ-গাঁয়ের সর্দ্দারের বোন...যে-সর্দ্দারকে বড় মেয়ে বিয়ে করতে আসছে। সর্দ্দারের বোন রাগ করলো না বড় মেয়ের ঝাঁজালো হুঙ্কারে।

সর্দ্দারের বোন বললে—যেখানে যার কাছেই যাও, এ পথে যেন গাঁয়ে ঢুকো না! ঐ যে দেখছো বড় গাছ···ও গাছের ছায়ায় যে-পথ, সেই পথে গাঁয়ে ঢুকো। নাহলে বিপদে পড়বে।

বড় মেয়ে কারো কথা শোনে না। বয়ে গেছে তার সর্দ্দারের বোনের কথা শুনতে! সেই ছায়া পথে না ঢুকে বড় মেয়ে সোজা সিধা পথ ধরে গিয়ে গাঁয়ে ঢুকলো। গাঁয়ে সর্দ্দারের ঘর। সে ঘরের সামনে ভিন-গায়ের মেয়ে এসে দাঁড়ালো। দেখে গাঁয়ের যত লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো—জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কোথায় যাবে? কার কাছে?

বুক ফুলিয়ে বড় মেয়ে বললে—আমি এসেছি ওপারের ভিন-গাঁ থেকে···এ-গাঁয়ের সর্দ্দারকে বিয়ে করবো বলে!

এ-কথা শুনে সকলে অবাক! তারা বললে—তাই না কি! তা একা এসেছো কেন? কোন্ হাঘরের মেয়ে তুমি? বাপ নেই, আত্মীয়-বন্ধু নেই, পড়শী নেই, কেউ নেই···যে তোমার সঙ্গে আসে।

বড় মেয়ে বললে—তাদের আসার দরকার? তারা তো বিয়ে করবে না যে তারা আসবে! তা যাক, তোমাদের সর্দ্দারের দেখা পাবো কোথায়, বলতে পারো?

তারা বললে—সর্দ্দার এখন ঘরে নেই—বেরিয়েছে, ফিরবে সেই সন্ধ্যার পর। তুমি যাও—সামনে ঐ রান্নাঘর। গিয়ে সর্দ্দারের জন্য রান্নাবান্না করে রাখবে। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে সর্দ্দার যদি তোমার হাতের রান্না খেয়ে খুশী হয়, তাহলেই তোমাকে বিয়ে করবে!

লোকজন বড় মেয়েকে এক-থলি গম দিলে, দিয়ে বললে—এই গম ভেঙে আটা করবে সেই আটার রুটী তৈরী করতে হবে।

মেয়ে বাড়ীতে ঢুকলো। ঢুকে গম ভেঙে আটা করলো। খুব মোটা মোটা দানা—সুরকির মতো। তারপর ছাঁকা নয়, চালা নয়, সেই মোটা-দানা আটা মেখে রুটী তৈরী করলো। রুটী তৈরী করে সে বসে রইলো সর্দার ফিরবে সন্ধ্যায়, সর্দারের পিত্যেশে।

সন্ধ্যা হলো। আকাশ জুড়ে প্রকাণ্ড কালো মেঘ···বাতাসে সোঁ-সোঁ গর্জন! মেয়ে ভাবলো, ভয়ানক ঝড় আসছে!

কিন্তু ঝড় নয়। বাতাসে গা মেলে সর্দার এসে নামলো ঘরের সামনে। সর্দারের দেহ অজগর সাপের। আর মাথা একটা নয়—চার-চারটে মাথা। চার মাথায় চারখানা মানিক জ্বলছে দপ্-দপ্ করে···যেন চাঁদ, না, সূয্যি···আর চার মাথার নীচে আটটা চোখ যেন আগুনের ভাঁটা।

মূর্ত্তি দেখে বড় মেয়ের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি!

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সর্দার বললে—খাবার তৈরী?

ভয়ে ভয়ে মেয়ে বললে—হ্যাঁ।

—দে খাবার।

মেয়ে একগোছা রুটী তৈরী করে রেখেছিল···সেই রুটীর গোছা সর্দারের সামনে দিলে ধরে। সর্দার এ রুটীতে কামড় দেয়—ও রুটীতে কামড় দেয়—কামড় দিয়ে থু-থু করে ফেলে দেয়।

ফেলে দিয়ে সর্দার বললে—এ রুটী কেউ খায়? রুটী, না, চামড়া! যা, তোকে আমি বিয়ে করবো না।

মেয়ের মুখে কথা নেই, ভয়ে সে কাঁটা!

সর্দার বললে—আমি এখন কি খাই? ভয়ানক খিদে···সারাদিনের খাটুনি। তোকে খাবো··· হ্যাঁ!

এ-কথা বলে বড় মেয়েকে সর্দার ফণায় জড়িয়ে পিষে গুঁড়ো করে চেটে-পুটে খেয়ে ফেললো চক্ষের নিমেষে!

এ-খবর কথায় কথায় গিয়ে পৌঁছুলো ওপারের ভিন-গাঁয়ে বড় মেয়ের বাপের কাণে। বাপ তখন ছোট মেয়েকে ডাকলো। ছোট মেয়ের নাম মুগ্লানিয়ানা।

মুগ্লানিয়ানা এলে বাপ তাকে বললে—তুই যদি সর্দারকে বিয়ে করতে চাস্ তো যা।

ছোট বললে—যাবো।

বাপ বললে—দাঁড়া। তাহলে সব লোকজনকে খবর দিই—কন্যাযাত্রী। যে-যে যায় সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

বাপের কথায় ছোট মেয়ে কোনো কথা বললে না।

পরের দিন পাড়া-পড়শী আর আত্মীয়-কুটুম্বদের কন্যাযাত্রী নিয়ে ছোট মেয়ে বেরুলো নদীর ওপারের গাঁয়ে সর্দ্দারকে বিয়ে করতে।

খানিক পথ আসতে সেই ইঁদুরের সঙ্গে দেখা। ইঁদুর বললে—কোথায় চলেছো গো মেয়ে এত লোকজন নিয়ে?

ছোট মেয়ে বললে—নদীর ওপারে গাঁ...সেই গাঁয়ের সর্দ্দারকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।

ইঁদুর বললে—আমাকে সঙ্গে নেবে—আমি পথ দেখিয়ে দেবো?

ছোট মেয়ে বললে—বেশ তো, তাহলে খুব ভালো হয়। এ পথ আমি চিনি না। এসো সঙ্গে।

ইঁদুর চললো আগে আগে···পথ দেখিয়ে—ছোট মেয়ে চললো কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে তার পিছনে। আরো খানিক দুর গিঁয়ে সেই ব্যাঙের সঙ্গে দেখা···ব্যাঙকেও ছোট মেয়ে নিলে সঙ্গে। তার পর যেই বুড়ীর সঙ্গে দেখা। বুড়ী বললে,—বুঝেছি গো, তুমি নদীর ওপারের গাঁয়ে চলেছো—ও গাঁয়ের সর্দ্দারকে বিয়ে করতে।

ছোট মেয়ে বললে—হ্যাঁ, বুড়ী-মা!

বুড়ী বললে—শোনো, আমি পথ বলে দি···সেই পথে যেয়ো। নাহলে বিপদ হবে।

মুঙ্গানিয়ানা বললে—হ্যাঁ বুড়ী-মা, তুমি পথ বলে দাও। এ পথ তো আমি জানি না।

বুড়ী বললে—এ পথে সোজা গিয়ে যেখানে দেখবে এ-পথ শেষ হয়েছে—সেখানে তেমাথা। সামনে সিধে যে-পথ আর ডান দিকে যে-পথ—সে দুটো পথ বেশ চওড়া, তা হোক···সে-দুপথে যেয়ো না যেন বাছা, খবর্দ্দার! বাঁদিকে যে-পথ সেই পথে, যাবে। বুঝেছো? এ-পথ কিন্তু সরু···গলি-পথ। সে পথে বন—সে বনে গাছপালা হাসে, সে পথে···

ছোট মেয়ে বললে—তা হোক, বাঁয়ের পথেই যাবো বুড়ী-মা।

বুড়ী বললে—হ্যাঁ। তাহলে ভয় নেই, বিপদে পড়বে না। বুঝেছো?

মুঙ্গানিয়ানা বললে,—বুঝেছি, গলি-পথে যাবো।

—হুঁ।

চলতে চলতে পথের শেষে তেমাথা—সামনে আর ডান দিকে চওড়া পথ—বাঁয়ে সরু গলি। কন্যাযাত্রীদের নিয়ে মুঙ্গানিয়ানা সেই গলি-পথে চললো। চলে···চলে সকলে এলো নদীর ধারে। সেখানে দেখা এক বাঁটুল বামনের সঙ্গে। বাঁটুল বামন বললে—শোনো গো, নদীর ওপারে গিয়ে দেখবে, ঘাটে একটি মেয়ে কলসীতে জল ভরতে এসেছে। সে মেয়েটি হলো ঐ সর্দ্দারের বোন। তার সঙ্গে বেশ হাসি-মুখে মিষ্টি কথা কইবে। তারপর সর্দ্দারের বাড়ীতে গেলে সেখানে তোমাকে দেখে থলি-ভরা গম···সেই গম গুঁড়িয়ে যে আটা হবে, সেই আটায় তোমাকে তৈরী করতে হবে সর্দ্দারের জন্য রুটী। আটা বেশ মিহি করে ভেঙো—আর সর্দ্দারকে দেখে যেন ভয় পেয়ো না···বুঝলে?

মাথা নেড়ে ছোট মেয়ে বললে—বুঝেছি।

নদীর ওপারে ঘাটে নেমে সেই মেয়েটির সঙ্গে ছোটর দেখা…কলসী নিয়ে মেয়েটি জল ভরছিল…সর্দ্দারের বোন!

ছোট মেয়েকে দেখে সর্দ্দারের বোন বললে—কোথায় চলেছো দিদি?

ছোট মেয়ে বললে—এই গাঁয়েই আসছি, ভাই।

বোন বললে—কেন গো দিদি? ভিনগাঁয়ের মেয়ে তুমি, এ গাঁয়ে কেন এসেছো?

ছোট মেয়ে বললে—এই তা দেখছো দিদি, সঙ্গে কন্যাযাত্রী…আমি এসেছি এ-গাঁয়ের সর্দ্দারকে বিয়ে করতে।

সর্দ্দারের বোন বললে—বটে! বটে! তা এসো, এসো…কিন্তু সর্দ্দারকে দেখে ভয় পেয়ো না!

ছোট মেয়ে বললে—না, ভয় পাবো কেন?

বোন তখন দেখিয়ে দিলে দূরের গাছ…বললে—ঐ গাছের গা ঘেঁষে ছায়া-করা যে-পথ, সেই পথে গাঁয়ে ঢুকো। একটু গিয়েই ঘর পাবে।…

কন্যাযাত্রীদের নিয়ে ছোট মেয়ে সেই পথে সর্দ্দারের ঘরে এলো। বেশ বড় ঘর…কন্যাযাত্রীদের জন্য খাবার এলো, জল এলো।

সর্দ্দারের মা এসে ছোট মেয়েকে একরাশ গম দিয়ে বললে,—এই গম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আটা করে সেই আটাতে রুটী তৈরী করে রাখো। সর্দ্দার সন্ধ্যাবেলায় ফিরে রুটি খাবে।…

ইঁদুর দাঁতে গম কেটে মিহি-দানা আটা করে দিলে—সে আটা মেখে রুটী তৈরী করলো ছোট, তারপর…

সন্ধ্যাবেলায় তেমনি ঝড়ের দোলা…সে দোলাতে ঘরের খুঁটী-দরজা সব কাঁপছে। ছোট মেয়ে তাতে ভয় পেলো না। তার পর এলো সর্দ্দার। প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ…তার ঘাড়ে চার-চারটে মাথা।

এসেই সর্দ্দার চাইলো খাবার। ছোট মেয়ে দিলে তার সামনে ধরে রুটী…নিজের হাতে গড়া মিহি আটার রুটী।

রুটী খেয়ে খুশী হয়ে সর্দ্দার বললে—বাঃ, চমৎকার রুটী।—খেয়ে আমি খুশী হয়েছি। হুঁ, তোমায় আমি বিয়ে করবো।

ধুমধামে সর্দ্দারের সঙ্গে হলো ছোট মেয়ের বিয়ে। ছোট মেয়েকে সর্দ্দার অনেক গহনা দিলে…বিয়ের পর সাপের দেহ ছিঁড়ে খশে সর্দ্দারের হলো মানুষের শরীর। চার-মাথা মিলিয়ে একটি মাথা হলো।…দিব্যি সুপুরুষ! সকলের খুশীর আর সীমা নেই!

এক মা। মায়ের অনেক ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা খুব ছোট। মাকে একদিন যেতে হবে অনেক দূরে···ফিরতে দেরী হবে। ছেলেমেয়েদের কার কাছে রেখে যায়? কে দেখবে? ঘরের পাশে থাকে এক খরগোশ। মা বললে খরগোশকে—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি···ছেলেমেয়েরা একা থাকবে···তুমি এদের একটু দেখবে, যতক্ষণ না আমি ফিরি?

খরগোশ বললে—তা কেন দেখবো না? পাশাপাশি থাকি···পড়শী। তুমি যাও, আমি দেখবো তোমার ছেলেমেয়েদের।

মা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল···খরগোশ এসে বসলো মায়ের ঘরের দরজায় ছেলেমেয়েদের পাহারায়।

এখন মায়ের ঘরের সামনে যে পথ, সে পথ গেছে বনে। সে-পথে জন্তু-জানোয়াররা আসা-যাওয়া করে। মা চলে যাবার পর সে-পথে এলো অনেক জন্তু-জানোয়ার···সিঙ্গী, ভাল্লুক, বরা, গণ্ডার...আরো কত জানোয়ার। তাদের দেখে খরগোশের বুক কেঁপে উঠলো...ঘরের দোর ছেড়ে ছুটে খরগোশ গিয়ে লুকোলো একটা খেজুর-ঝোপের পিছনে। ঝোপ থেকে মায়ের দরজা দেখা যায়। ঝোপে বসে খরগোশ নজর রাখছে ঘরের দিকে—জানোয়ার ঢোকে কিনা। তারা ঢুকলো না—সোজা বনের দিকে গেল। কিন্তু···

জানোয়ারদের রাজা ভীষণ রাক্ষস···জানোয়ারদের রাক্ষস। জানোয়ারদের পিছনে-পিছনে সে আসছিল। জালার মতো তার পেট, বড় হাঁড়ির মতো মুখ, আর চোখ দুটো যেন উপুড়-করা দুটো পিদীম! জানোয়ারদের রাক্ষস দেখেছে খরগোশকে ছুটে যেতে। সে এসে দাঁড়ালো ঝোপের সামনে—ডাকলো,—ওরে খরগোশ···এই খরগোশ...

খরগোশের বুকখানা ধড়াশ করে উঠলো! কথাটি না কয়ে সে ঝোপের মধ্যে সেঁধিয়ে মাথা লুকোলো। কিন্তু মাথা লুকোলে কি হবে, তার কাণদুটো—সেই কাণদুটো রইলো খাড়া—নিশানের মতো! দেখে খরগোশের সে দুই কাণ ধরে তুলে সামনে এনে রাক্ষস বললে—ডাকছি... জবাব দিস না যে বড়!

কাঁচুমাচু মুখে খরগোশ বললে—আঁ...আঁ...আঁ...আঁ···আজ্ঞে, আমি কাণে কম শুনি!

রাক্ষস বললে—রাখ তোর কাণে কম শোনা! ঘরের দোরে বসেছিলি; ও ঘরে কে থাকে?

খরগোশ বললে—আ্...আ...ও ঘরে থাকে এক মা···আর মায়ের একগাদা ছেলেমেয়ে। তা... তা মা গেছে অনেক দূরে কি কাজে...আমায় বলে গেছে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, তার ছেলেমেয়েদের যেন দেখি! তাই আ-আ আমি ওর দোরে বসে পাহারা দিচ্ছিলুম।

—বটে! বলে খরগোশকে নামিয়ে দিয়ে রাক্ষস এসে দাঁড়ালো মায়ের ঘরের দোরে···দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের ডাকলো—এই···তোরা বেরিয়ে আয়...বেরিয়ে আয়!

কে ডাকে?...দেখতে ছেলেমেয়েরা এলো ঘরের বাইরে। যেমন আসা, রাক্ষস তাদের ধরে এত-বড় হাঁ করে সেই হাঁয়ের মধ্যে টপ্ টপ্ করে ফেললো তাদের... যেন রসগোল্লা গিলছে!

ওদিকে সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে মা দেখে, ঘর খালি···ছেলেমেয়েদের চিহ্ন নেই! মায়ের হলো মহা-ভাবনা। মা ডাকলো—খরগোশ...ও খরগোশ...

খরগোশ তার গর্ত্তে বসে আকাশ-পাতাল অনেক কথা ভাবছিল...মায়ের ডাকে বেরিয়ে এলো।

মা বললে—আমার ছেলেমেয়েরা?

খরগোশ তখন মাকে সব কথা খুলে বললো। বলতে বলতে খরগোশ কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতে খরগোশ বললে—যে করে আমার কাণ দুটো ধরে আমায় তুলেছিল মা, আমার কিছু করবার জো ছিল না!...

খরগোশের কথা শুনে দুঃখের চেয়ে মায়ের রাগ হলো বেশী। নিঃশব্দে মা তখন একরাশ শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে খুব গন্‌গনে আগুন তৈরী করলো...করে' লোহার বড় বড় দুটো শিক সে-আগুনে তাতিয়ে লাল করলো...করে' সেই তপ্ত শিক দুটো নিয়ে মা চললো বনের দিকে।

সে-রাক্ষস বনের রাজা। বনের মধ্যে মস্ত পাহাড়...মা এলো সেই পাহাড়ের গুহায়। এই গুহায় থাকে রাক্ষস। গুহার সামনে এসে মা ডাকলো—কোথায় আছিস, রাক্ষস? আয়, বেরিয়ে আয়, বলছি! আমার ছেলেমেয়েদের খেয়েছিস...তার মজা তোকে দেখাতে চাই!

মেয়ে-মানুষের মুখে এত বড় কথা! শুনে রাগে গস্‌গস করতে করতে রাক্ষস এলো গুহা থেকে বেরিয়ে...বললে—কে? কে তুই? কি চাস, শুনি?

মা বললে—আমার ছেলেমেয়েদের তুই পেটে পুরেচিস···দে, দে তাদের এখনি পেট থেকে বার করে!

রাক্ষস বললে—আমি কাণে কম শুনি! কি বলছিস, শুনতে পাচ্ছি না! কাছে এসে বল্।

এ কথায় মা গেল এগিয়ে রাক্ষসের দিকে···একেবারে তার নাগালে। যেমন নাগালে পাওয়া, রাক্ষস ক্যাঁক করে ধরে টক্ করে মাকে ফেললো গলার মধ্যে!

রাক্ষসের এত বড় পেট···সে পেটের মধ্যে আস্ত দেহ নিয়ে ঢুকে মা দেখে, নিজের ছেলেমেয়েদের ···সঙ্গে আরো কত মানুষ, কুকুর, ঘোড়া, গাধা, ছাগল, ভেড়া! রাক্ষসের পেটের মধ্যে যেন একটা চিড়িয়াখানা! রাক্ষস আজ এদের সকলকে গিলেছে! এখনো হজম হয়নি—সব তাজা আছে!

মাকে দেখে ছেলেমেয়েরা বললে—বড্ড খিদে পেয়েছে মা…কতক্ষণ খাইনি।

মা বললে—রোস্…খাবার তো আমি সঙ্গে আনিনি। তবে…আচ্ছা, এখনি খেতে দিচ্ছি। একটু সবুর কর্।

এ কথা বলে মা সেই লোহার শিকের খোঁচায় রাক্ষসের পেটের ভিতরকার খানিকটা মাংস

নিলে খুবলে ছিঁড়ে…তারপর আগুন জ্বেলে সে-মাংস সিদ্ধ করে' ছেলেমেয়েদের দিলে খেতে। মাংস খেয়ে ছেলেমেয়েদের খিদে ঘুচলো।

আর যে-সব মানুষ ছিল পেটের মধ্যে, তারা বললে—আমাদেরো ভারী খিদে পেয়েছে গো।

মা বললে—তাহলে আরো মাংস কাটি। কেটে সিদ্ধ করে দি, সকলে খাও।

রাক্ষসের পেট থেকে মা আরো খানিকটা মাংস কাটলো। কেটে সে মাংস সিদ্ধ করে তাদের দিলে খেতে…খেয়ে সকলের কি আরাম!

ওদিকে পেটের মধ্যে মাংস কাটা…তার উপর সে-মাংস সিদ্ধ করা! রাক্ষসের পেটে দারুণ যাতনা। যাতনায় রাক্ষস ছটফট করতে লাগলো। পাত্র-মিত্র মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালো। বদ্যি এলো।…রাক্ষস বললে—পেটের মধ্যে অসহ্য যাতনা! পেটের ভিতরটা যেন কে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে বিঁধছে, কাটছে…আর যেন আগুন জ্বলছে পেটের মধ্যে! আমাকে বাঁচাও! আমাকে সারাও!

বদ্যি দিলে ওষুধ…পাত্রমিত্রের দল গা-হাত টিপতে লাগলো…তবু পেটের যাতনা যায় না। রাক্ষস গড়াগড়ি খেতে লাগলো—আর এই গড়াগড়ি খেতে খেতেই তার সব শেষ!

গড়াগড়ি দেখে আর চীৎকার শুনে পাত্রমিত্রের দল গুহা ছেড়ে সরে পড়েছিল—কি জানি, জ্বালার চোটে যদি আর কারো ঘাড় মটকায়!

গুহার মধ্যে সাড়া নেই, শব্দ নেই…রাক্ষসের গলা শোনা যায় না…একদম্ চুপচাপ। অনেকক্ষণ। জানোয়াররা বললে বানরকে—তোমার ভাই আমাদের সকলের চেয়ে বুদ্ধি বেশী! একবার গিয়ে ছাখোনা, কি ব্যাপার! রাজামশায় হঠাৎ এখন চুপচাপ কেন?

বানর গুহায় ঢুকলো পা টিপে টিপে হুঁশিয়ার হয়ে…তারপর বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বললে সকলকে—গতিক ভালো নয়। পাহাড়ে যাদের বাস, এখনি তারা সব পাহাড়ে দাও পাড়ি…যে যার আস্তানায় ভাগো। আমি দাদা, গিয়ে গাছে উঠি।

বানরের মুখে এ-কথা শুনে জন্তু-জানোয়াররা নিঃশব্দে সরে পড়লো…যে যতদূরে পারে…এ বন, সে বন পার হয়ে একেবারে অজগর বনে! ওদিকে মা কিন্তু, চুপ করে ছিল না—দু'হাতে সেই তপ্ত লোহার শিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাক্ষসের পেট ফুঁড়ে মস্ত ফোকর করলো—তারপর সেই ফোকর দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রথমে বেরুলো মা—তার পর রাক্ষসের পেটে ছিল যত মানুষ-জন, গরু-বাছুর, ঘোড়া, কুকুর-ছাগলের পাল।

বেরিয়ে এসে গরু বললে—হাম্বা…কে বাঁচালে গো?

কুকুর বললে—ঘেউ ঘেউ…কে আমায় বার করে আনলো রে?

ঘোড়া বললে—চিঁ হিঁ হি…কার দৌলতে আবার দেখছি মাথার উপর ঐ আকাশ?

মা বললে—আমি গো, আমি। পাজীটা একলা পেয়ে আমার ছেলেমেয়েদের পেটে পুরেছিল। আমাকেও গিলেছিল। আমি ওর পেট কেটে সকলকে মাংস খাইয়েছি। তারপর এই শিক দিয়ে পেট ফুটো করে বেরুতে পেরেছি!

গরু কুকুর ঘোড়া বললে—হুঁ। মানুষের বুদ্ধিতে আমরা বেঁচেছি! আমরা বনে থাকবো না। বনে কে রক্ষা করবে এর পর বিপদ হলে! মানুষের সঙ্গে থাকবো আজ থেকে…মানুষের কাজ করবো, হুকুম শুনবো।

তখন···গরু কুকুর ঘোড়াদের নিয়ে মা বেরুলো বন থেকে। সেইদিন থেকে জানোয়াররা থাকে বনে—আর মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এই লোকালয়।

এরপর মায়ের ছেলেরা বড় হয়ে একদিন শিকারে বেরুলো। ঘোড়া চললো তাদের পিঠে করে...কুকুর চললো বন ঢুঁড়ে জানোয়ার বার করতে—গরু রইলো ঘরে। সে বললে, আমি দুধ দেবো। সে দুধে হবে ননী, ছানা, রাবড়ী, ক্ষীর···মানুষ খেয়ে গায়ে পাবে শক্তি।

ষাঁড়ের শিং

একজনের বারো-বারোটি বৌ। বৌয়েরা সব সময়ে এমন ঝগড়া-চ্যাঁচামেচি করে যে বাড়ীর ত্রিসীমায় কাক-চিল এসে বসতে পারে না! একদিন বৌয়েদের ঝগড়া-চ্যাঁচামেচি এমন বেড়ে উঠলো যে লোকটা আর সইতে পারলো না। ধুত্তোর বলে' বিবাগী হয়ে সে গেল বাড়ী থেকে বেরিয়ে।

সে যাবার দু বছর পরে বড় বৌ গেল মরে এগারো সতীনের জ্বালায়। বড় বৌয়ের এক ছেলে, তার বয়স দশ বছর। মা মরে গেলে সৎমারা তাকে ভয়ানক যাতনা দিতে লাগলো। পাঁচ বছর ধরে সৎমায়েদের জ্বালা-যাতনা সয়ে থাকবার পর পনেরো বছর বয়সে ছেলেও বাড়ী ছেড়ে পথে বেরুলো—ভাবলো, ঘুরতে ঘুরতে যদি বাবার দেখা পাই, বাবাকে নিয়ে বাড়ী ফিরবো। না পাই, আর বাড়ী-মুখো নয়!

বাড়ীতে থাকতে বাবা তাকে কবে একটি ষাঁড় দিয়েছিল—সেই ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ছেলে বেরুলো পথে।

দুদিন দশ দিন চলবার পর ছেলে এক মাঠে এলো। মাঠে অনেক গরু আর বলদ চরছে——তাদের মধ্যে যেটা সর্দ্দার-বলদ, সে এলো শিং নেড়ে তেড়ে ছেলেকে গুঁতোতে।

ষাঁড় তখন ছেলেকে বললো—একবার নামো তো—ওর সঙ্গে লড়াই দি! ওকে হারিয়ে আমরা ঐ পাহাড়-পথে উঠবো।

ছেলে নামলো ষাঁড়ের পিঠ থেকে। তার ষাঁড় গেল লড়াই করতে সর্দ্দারের সঙ্গে। লড়াইয়ে সর্দ্দারের হার হলো। লড়াই জিতে ছেলেকে পিঠে তুলে ষাঁড় উঠলো পাহাড়ে চড়াই-পথে।

কাশ্মীর দেশের রূপকথা

যখন পাহাড়ের মাথায় উঠলো, বেলা তখন দুপুর—ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। ষাঁড় বললে—এবারে দুটি খেয়ে নাও।

ষাঁড়ের ডান শিংয়ে ছেলে মারলো টোকা। টোকা মারতে রাশি-রাশি খাবার! যত পারে খেয়ে ছেলে টোকা মারলো ষাঁড়ের বাঁ শিংয়ে—সঙ্গে সঙ্গে বাকী খাবার কোথায় গেল মিলিয়ে—একটু গুঁড়ো পর্য্যন্ত পড়ে নেই!

তারপর আবার চলা।

সারাদিন চলে চলে সন্ধ্যার পর পাহাড়ের উপর এক জায়গায় দুজনে শুয়ে রইলো।

পরের দিন সকাল হলে পাহাড় থেকে নেমে তারা এলো এক মাঠে।

এ-মাঠেও একপাল গরু চরছে…গরুদের সঙ্গে তাদের সর্দ্দার বলদ।

মানুষ দেখে এ সর্দ্দারও এলো শিং উঁচিয়ে তেড়ে। তখন ছেলের ষাঁড় বললে—আর একবার নামো। এর সঙ্গে লড়াই করি। যদি জিতি, ভালো! আর যদি ওর শিংওর গুঁতোয় মরি তো আমার শিং দুটো কেটে সঙ্গে রেখো। ডান শিঙে টোকা মারলেই খাবার পাবে—যে খাবার যত চাও…আর যা কিছু চাও, তাও।

ছেলে নামলো ষাঁড়ের পিঠ থেকে। ষাঁড় গেল লড়াই করতে। এবারে কিন্তু সে আর জিততে পারলো না—সর্দ্দারের শিঙের গুঁতোয় বেচারী মরে গেল!

লড়াই জিতে সর্দ্দার মহা-খুশী—তার গরুর পাল নিয়ে সে চলে গেল।

ছেলে তখন ষাঁড়ের শিং দুটো কেটে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো।

চলে চলে ছেলে এলো এক গাঁয়ে। গাঁয়ে এসে দেখে, এখানকার লোকজন গাছের পাতা আর শিকড় খাচ্ছে।

ছেলে জিজ্ঞাসা করলে—তোমারা এমন কচুঘেঁচু খাচ্ছো কেন?

তারা বললে—এ ছাড়া গাঁয়ে আর কোনো খাবার জিনিষ পাওয়া যায় না।

বটে!…ছেলে আর কোনো কথা না বলে গাঁয়ের এক বাড়ীতে ঢুকলো। বাড়ীর মালিককে বললে—আমায় যদি রাত্রে থাকতে দাও, তাহলে খুব ভালো ভালো খাবার খাওয়াবো।

মালিক বললে—বেশ কথা—থাকো।

ছেলে তখন ষাঁড়ের ডান শিঙে মারলো টোকা। চোখে পলক পড়লো না—তখনি ভালো ভালো কত খাবার পড়লো! দেখে মালিক অবাক!

ছেলে বললে—খাও, যত পারো।

মালিক খেলো খাবার…ছেলেও খেলো। খাওয়া হলে মালিক বললে—এবারে ঘুমোনো যাক—কেমন?

ছেলে বললে—হ্যাঁ।

দুজনে শুলো পাশাপাশি। শোবামাত্র ছেলের চোখে ঘুমের বোঝা এসে নামলো। অপরাধ

কি! এত পথ হেঁটেছে! ছেলে অঘোরে ঘুমোতে লাগলো। বাড়ীর মালিকের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ছেলেকে নিঃসাড়ে ঘুমোতে দেখে সে উঠে চুপিচুপি তার সে শিং দুটো নিয়ে লুকিয়ে রাখলো। রেখে—ছেলের শিয়রে.নিজের ঘরে ছিল দুটো বলদের শিং—সেই শিং দুটো এনে রাখলো।

সকালে ঘুম ভেঙে ছেলে বললে মালিককে—এবার আসি।

—এসো।

ছেলের মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। বদলানো সেই বাজে শিং দুটো নিয়েই, সে চললো। অনেকখানি পথ এসে দুপুর বেলা খিদে পেয়েছে···ছেলে তখন শিংয়ে মারলো টোকা। কিন্তু এ হলো বাজে শিং—এতে টোকা মারলে খাবার পাবে কেন? খাবার পেলে না।

দেখে ছেলে বুঝলো ব্যাপার। ছেলে আর দাঁড়ালো না, তখনি ফিরে এলো সেই মালিকের ঘরে।

ঘরের কাছাকাছি এসে শুনতে পেলে বাড়ীর মধ্যে মালিকের গলা। মালিক বলছে শিংকে—খাবার দে শিং···খাবার দে···কাল রাত্রে যেমন ভালো ভালো রকমারি খাবার দিয়েছিলি, তেমনি খাবার···

ছেলে ঢুকলো বাড়ীতে···ঢুকেই মালিকের কাছ থেকে শিং দুটো নিলে কেড়ে—কেড়ে নিয়ে মালিকের সেই বাজে শিং দুটো সেখানে ফেলে ছেলে আবার এলো পথে।

চলে চলে দুদিন পরে আর এক গাঁ। এ গাঁয়ের এক বাড়ীতে এসে মালিককে দেখে বললে—আমায় থাকতে দেবে···একদিনের জন্য?

মালিক বললে—না।

ছেলে বললে—যদি থাকতে দাও, তাহলে' তোমায় দেখাবো খুব আশ্চয্যি ব্যাপার! তেমন ব্যাপার তুমি কখনো চোখে ছাখোনি!

মালিক বললে—না, না! এখানে জায়গা হবে না। তোমার ঐ ছেঁড়া পোষাক···আব রোদেপোড়া শুকনো চেহাবা···নিশ্চয় তোমার চুরির মতলব!

মালিক তাকে ঠাঁই দিলে না। হাঁটতে হাঁটতে ছেলে এলো এক নদীর ধারে। নিরালা, নির্জ্জন জায়গা। ছেলে বসলো নদীর ধারে···শিংকে বললে,—এমন করে ঘুরে বেড়াতে আর পারি না শিং!···ও লোকটা ঠাঁই দিলে না শুধু ছেঁড়া পোষাকের জন্য—আমায় তুমি ভালো পোষাক দাও, শিং···

যেমন বলা, বাতাসে ভেসে এলো চমৎকার সব পোষাক।

সেই পোষাক পরে ছেলে আবার চলতে লাগলো।

চলে চলে' এলো আর এক গাঁয়ে। দেখে, বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরূপ রূপসী এক কন্যা! কন্যার বাপকে ডাকলো ছেলে। বাপ এলে বাপকে ছেলে বললে—আজ রাত্রের মতো আমায় থাকতে দেবে?

ছেলেকে ঘুমোতে দেখে সে উঠে চুপি-চুপি পৃঃ ১৭৮

ছেলের পোষাক দেখে বাপ ভাবলো, বুঝি কোনো দেশের রাজপুত্তুর। বাপ বললে—দেবো না কেন? নিশ্চয় দেবো।

সে রাত্রে ছেলে সেখানে রইলো—ছু'শিংয়ে টোকা দিয়ে ভালো ভালো কত খাবার আনালো—কত ভালো ভালো পোষাক আনালো—আরো কত-কি জিনিষ।

পরের দিন সকালে ছেলে বললে—আমি এবার যাবো।

বাপ বললে—না, তুমি এখানে থাকো। আমার ঐ একটি মেয়ে...মেয়ের বিয়ে দেবো বলে আমি পাত্র খুঁজছি। তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করো।

মেয়ের সঙ্গে বাপ দিলে ছেলের বিয়ে। ছু শিঙ্-এ টোকা মেরে ছেলে তুললো গাঁয়ের বুকে মস্ত বাড়ী···সে-বাড়ীতে আনালো রাজার ঐশ্বর্য্য...আনিয়ে বৌ নিয়ে সুখে সেখানে ঘরকর্ণা করতে লাগলো।

এক শেয়াল...শিকারে বেরিয়েছে...হঠাৎ দেখা সিংহর সঙ্গে।

সিংহ বললে,—একা-একা শিকার-করা আর চলে না। দুজনে ভাগে শিকার করলে কি হয়, শেয়াল?

শেয়াল···তার কি সামর্থ্য···কত শিকার করতে পারে? সিংহর সঙ্গে ভাগে শিকার। ওঃ, তাহলে দুদিনে মুটিয়ে উঠবে। শেয়াল বললে,—খুব ভালো কথা বলেছো, মামা। আমার বুদ্ধি, আর তোমার বল। মানুষরা বলে—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

সিংহ বললে—এখন থেকেই তাহলে···কি বলো?

শেয়াল বললে,—নিশ্চয়। শুভস্য শীঘ্রং!

শেয়ালকে নিয়ে সিংহ বেরুলো শিকারে। ক'পা যেতেই এত-বড় এক হরিণ! সিংহ এক লাফে তাকে করলো সাবাড়। সাবাড় করে সিংহ বললে শেয়ালকে—এক কাজ করা যাক! শিকারে ফিরেন নয়! আমি শিকার করতে করতে এই পথে এগুই—তুমি ধাঁ করে আমার বাড়ী যাও...ছানাদের খবর দাও, তারা এসে হরিণটাকে টেনে গুহায় নিয়ে যাবে।

শেয়াল বললে—বেশ বলেছো, মামা। তুমি এগোও, আমি যাই তোমার গর্ত্তে তোমার ছানাদের খবর দিতে।

সিংহ ওদিকে এগিয়ে চললো।...শেয়াল করলে কি, সিংহর গর্ত্তে গেলনা—গেল নিজের গর্ত্তে। গিয়ে নিজের ছানাদের বললে,—মস্ত হরিণ মেরে ওখানে রেখে এসেছি রে...তোরা আয়···সেটাকে টেনে গর্ত্তে এনে রাখবি।

শেয়ালের গর্ত্ত এক পাহাড়ের মাথায়। শেয়ালের ছানারা তখনি দড়িদড়া নিয়ে বাপের সঙ্গে এলো, এসে হরিণটাকে দড়িতে বেঁধে টেনে নিয়ে গেল।

শেয়াল তখন হাঁটতে হাঁটতে এলো সিংহর কাছে। সিংহ আরো একটা হরিণ মেরে শেয়ালের জন্য বসে আছে—শেয়ালকে দেখে বললে,—এই নাও, আর একটা!···সেটা নিয়ে গেছে?

শেয়াল বললে,—হ্যাঁ। তোমার ছানারা নিয়ে গেল দেখে তবে আমি আসছি—তাইতো আমার দেরী!...এটা তাহলে?

সিংহ বললে,—আর একবার কষ্ট করে যাও—গিয়ে তাদের খবর দাও, তারা এসে এটাকেও নিয়ে যাবে। আমি আরো এগুই। বরাত ভালো, দেখছি...পটাপট শিকার মিলছে!

সিংহ গেল জঙ্গলে আরো এগিয়ে। শেয়াল আবার ফিরলো নিজের গর্তে...ছানাদের বললে—আর একটা হরিণ রে! আয় তোরা চট্ করে...সেটাকেও নিয়ে আসবি! আগেরটাকে ভালো করে রেখেছিস তো?

তারা বললে—হ্যাঁ। মা সেটাকে কেটে কুটে ঠিক করছে! চলো, এখন এটাকে নিয়ে আসি।

ছানারা এলো শেয়ালের সঙ্গে—এসে এটাকেও নিয়ে গেল দড়ি বেঁধে টেনে। শেয়াল আবার ছুটলো সিংহর কাছে।

তারপর দুজনে এ-জঙ্গল ও-জঙ্গল তোলপাড় করে ফেললো। শিকার আর মিললো না। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হয়ে সিংহ বললে—না, আজ আর মিলবে না। সন্ধ্যা হলো—চলো, বাড়ী ফিরি।

দুজনে ফিরছে...ফিরতে ফিরতে সিংহ বললে—এক কাজ করো...আমার ওখানেই চলো! কিছু মাংস নিয়ে যাবে—তুমি খাবে, শেয়ালনী খাবে, তোমার ছানারা খাবে।

শেয়াল ভাবলো, বটে! এর নাম ভাগে কারবার! কোথায় বলবে দু'টো হরিণ পাওয়া গেছে...একটা তুমি নেবে, আর একটা আমি! তা নয়...আমাকে একটু মাংস দেওয়া! হুঁ! ভাগ্যে দুটোকেই পাচার করেছি!

শেয়াল বললে—সারাদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে ধুলো-কাদা মেখেছি, মামা—আমি বলি, তুমি তোমার গর্তে যাও, আমি আমার গর্তে যাই! সেখানে চানটান করবো...করে সাফ হয়ে তোমার ওখানে যাবো—গিয়ে মাংস নিয়ে আসবো।

সিংহ বললে—বেশ, কিন্তু দেরী করোনা। খিদে যা পেয়েছে, তোমাকে কিছু মাংস দিয়ে তবে আমরা খেতে বসবো।

দুজনে মোড়ে ছাড়াছাড়ি। সিংহ চললো সিংহর গর্তর দিকে—শেয়াল তার গর্তর দিকে।

গর্তে এসে সিংহ শুনলো, সিংহিনী বললে, শেয়াল সেখানে মোটে যায়নি...হরিণের খবর তারা কেউ জানে না। জানলে তক্ষুণিতো ছানারা গিয়ে নিয়ে আসবে।

সিংহ বললে—শেয়াল আসে নি? তাহলে, হরিণ দুটো?

সিংহিনী বললে,—তোমার যেমন বুদ্ধি! শেয়াল...বনে অত-বড় ধূর্ত্ত জানোয়ার আর আছে! তাকে কেউ বিশ্বাস করে? বলে, খিদেয় আমাদের পেট জ্বলছে...তোমার শিকারের আশায় আছি!

রাগে সিংহর কেশর উঠলো ফুলে! হুঁ, আমার সঙ্গে চালাকি! দেখছি সে কত চালাক! আজ তাকে গুষ্টিশুদ্ধ...বলে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সিংহ তখনি ছুটলো শেয়ালের গর্তর দিকে শেয়ালকে ধরতে!

শেয়াল ওদিকে···সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে, ধকল হয়েছে—খিদেয় নাড়ীগুলো পেটের মধ্যে পাক খাচ্ছে···ধুঁকতে ধুঁকতে ঠুকুর ঠুকুর করে যে-পাহাড়ে তার গর্ত, সেই পাহাড়ের নীচে এলো···পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কত রকমের গাছ, সেইসব গাছ ধরে পাহাড়ে উঠছে···এমন সময় সিংহ এসে হাজির! শেয়ালকে দেখে পা টিপে এসে একটি লাফ দিয়ে শেয়ালকে ধরবে—কিন্তু ঠ্যাং ধরতে পারলো না—ধরলো শেয়ালের ল্যাজ—ধরেই এক টান! দাঁতের সে-কামড় শেয়াল বুঝলো···তার গা শিরশির করে উঠলো! এইরে, এবার আর রক্ষা নেই! কিন্তু জাতে শেয়াল, বুদ্ধি তার কত! টক্ করে শেয়াল বললে,—এই যে তুমি এসেছো, মামা! তা আমাকে না ধরে গাছের শিকড়টা ধরলে কেন? তোমার ভারে গাছ এখনি উপড়ে পড়বে···তখন হাড়গোড় ভেঙ্গে মারা যাবে যে!

শেয়ালের কথা শুনে সিংহ ভাবলো, তাই নাকি! শেয়ালের ল্যাজ না ধরে আমি টানছি গাছের শিকড়! দেখতে হলো তো!···এই ভেবে ল্যাজ ছেড়ে সিংহ যেই দেখবে, শেয়াল অমনি সড় সড় করে উঠে গেল একেবারে পাহাড়ের মাথায়—উঠে তার হা-হা হো-হো হাসি!

ভয়ানক ঠকিয়েছে তো! সিংহ লজ্জায় আর দাঁড়ালো না। ভাবলো, আচ্ছা, এক পৌষে শীত পালায় না! যাবে কোথায়? কতদিন সরে থাকবে শেয়াল? পাহাড় থেকে নামতে হবে না? তখন? আমি ওৎ পেতে থাকবো। এই ভেবে সিংহ সেদিনকার মতো জঙ্গলে নিজের গর্তে ফিরলো।

তারপর থেকে রোজ সে রাখছে নজর···শেয়াল কখন পাহাড় থেকে নামে।

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিন দিন গেল। দু-দুটো হরিণ এনেছে—তা খেয়ে চারদিন আরামে কাটলো শেয়ালদের। তারপর···কিছু না আনলে গুষ্টিশুদ্ধ উপোস দিতে হবে!

শেয়ালনী বলে—চারদিন খেয়ে ভেবেছো আর খেতে হবে না? খাবার-দাবারের চেষ্টা দ্যাখো।

শেয়াল বললে,—বেরুবো কি! সিংহর সঙ্গে যে-কাণ্ড করে এসেছি···ওৎ পেতে কোথায় আছে ঘুপ্‌টি মেরে···যেই নামবো, ঘাড়টি ধরবে বাগিয়ে···আর ধরেই মুখে পুরবে! তখন?

শেয়ালনীর মহা ভাবনা, তাইতো! তাহলে উপায়? শেয়ালনী বললে—ঐ তোমার ভারী দোষ··· না বুঝে এমন কাজ করো যে পরে তাল সামলানো দায় হয়! এখন কি করবে, শুনি? উপোস করে গোনাগুষ্ঠী শুকিয়ে মরবো?

শেয়াল বললে—দাঁড়া, বুদ্ধি করে যাহোক একটা উপায় বার করছি—তুই দ্যাখ্ না।

শেয়াল খুব সাবধানে নামলো পাহাড়ের এদিক ছেড়ে···ওদিকে। ওদিকে মস্ত পুকুর,—সে পুকুরে অনেক কাঁকড়া আর মাছ। সেখান থেকে সেদিন মাছ আর কাঁকড়া নিয়ে এলো—তাই খেয়ে সেদিনটা কাটলো!

সিংহ কিন্তু দেখেছে—তখন সিংহ করলে কি, জলের পাশে ঝোপ—সেই ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে বসে রইলো···শেয়াল এলে ক্যাঁক করে তাকে ধরবে!

শেয়াল এলো পরের দিন কাঁকড়া আর মাছ নিতে—এসে দেখে, পুকুরের জল থির, নিথর···জলে মাছেরা সাঁতার কাটছেনা, কাঁকড়াগুলো সরে কোথায় লুকিয়ে আছে! এমন কোনোদিন হয় না!

সিংহর গায়ের গন্ধও পেলো। চুপচাপ আছে কোথাও !···শেয়াল ভাবলো, ভালো কথা নয়···নিশ্চয় সিংহ মামা কাছাকাছি ঘুপটি মেরে বসে আছে! শেয়ালের আর মাছ-কাঁকড়া নেওয়া হলো না··

সে সরে পড়লো। বসে থেকে থেকে সিংহ একবারটি উঁকি মারতেই চোখে পড়লো—শেয়াল চলেছে পাহাড়ে! ভাবলো, নাঃ, ভেস্তে গেল! নিশ্চয় টের পেয়েছে! সেদিনটাই তার মাটি!

তারপর আর একদিন···শেয়ালের মনে একটু সাহস হয়েছে। পাহাড় থেকে সে নামলো··· নেমে পা টিপে টিপে এগুচ্ছে, হঠাৎ ঝপাৎ করে সিংহ পড়লো সামনে লাফিয়ে—পড়েই বললে—এবারে? হুঁ হুঁ, আর রক্ষা নেই। তোকে খাবো।

শেয়ালের বুকখানা ধড়াশ্ করে উঠলো! কিন্তু ফন্দীবাজ তো! সে বলে উঠ্লো—খেয়ো মামা কিন্তু তার আগে···পাহাড়ের ওধারে ইয়া এক মোটা হরিণ···তুমি এসেছো, ভালো হয়েছে—আমার সাধ্য কি, ও হরিণকে ধরি! আমাকে পরে খেয়ো। আমার এই চিম্‌সে শরীর...কতটুকু-বা মাংস পাবে? আমি তো আছিই। এক কাজ করো—তুমি এখানে ঘুপটি মেরে দাঁড়াও··· আমি ওদিক থেকে হরিণটাকে তাড়া দিই। আমার তাড়া খেলেই তাকে এদিকে আসতে হবে—এলে সেটাকেও···বুঝলে কি না?

সিংহ ভাব্লো, মন্দ নয়! শেয়াল তো হাতে আছে—মোটা হরিণটাকে যদি এত সহজে পাই—খুব ভালো! সে বল্লে—বেশ, আমি তাহলে দাঁড়াই। তুমি তাড়া দিয়ে হরিণটাকে এধারে পাঠাও।

শেয়াল নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো! সে বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এর আর কথা আছে!

এ-কথা বলে শেয়াল পাহাড়ের দিকে গিয়ে একদম পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসলো—বসে হা-হা হাসি! সে-হাসি শুনে সিংহ চটে উঠ্লো, বুঝলো, শেয়াল তাকে এবারো খুব ঠকিয়েছে! রাগে গর্‌গর্ করে কেশর ফুলিয়ে সিংহ নিজের গর্ত্তে ফির্‌লো।

তারপর কিছুতে আর শেয়ালকে সে পায় না! একদিন সিংহ মস্ত একটা মোষ মেরেছে। এত-বড় মোষ! কি করে নিয়ে যাবে, ভাবছে—এমন সময় সামনে শেয়াল! সিংহ ভাবলো, ওর যা কর্‌বার, তা তো করবো, এখন এ-মোষটা···

সিংহ বললে—এই যে ভাগ্নে, খুব সময়ে এসেছো। এক কাজ করো দিকিন···এত বড় মোষ কি করে একা নিয়ে যাই! ভাবছি, কেটে কেটে টুকরো করি—টুক্‌রোগুলো তুমি নিয়ে গিয়ে যদি আমার গর্ত্তে পৌঁছে দাও!

শেয়াল বললে—এ আর বেশী কথা কি, মামা! তুমি কাটো—আমি একটি একটি করে বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসবো।

সিংহ বললে—সেবারের মত করবে না তো?

শেয়াল বললে—না না, কি যে বলো। দৈবাৎ একটা ভুল করেছি বলে কি বারে-বারে ভুল করবো!...আমার জান্ তো তোমার হাতে!···

সিংহ খুশী হলো; বললে—বেশ।

তারপর মোষটাকে সিংহ দাঁত দিয়ে দিয়ে ছিঁড়তে লাগলো—ছিঁড়ে চামড়া আর মাংস আলাদা করলে। তারপর শেয়ালকে বললে—আমি এখানে বসে পাহারা দেবো, তুমি একটা একটা টুকরো নিয়ে গিয়ে সিংহিনীর কাছে দিয়ে এসো।

মাংস নিয়ে শেয়াল গেল নিজের গর্তে···সেখানে শেয়ালনীকে টুকরোটা দিয়ে সিংহর কাছে এলো ফিরে।

সিংহ বললে—দিয়ে এসেছো?

—হ্যাঁ, মামা! এবারে আর চালাকি নয়!

সিংহ বললে—বেশ, এবারে এই ছালগুলো নাও—ছালগুলো তোমার শেয়ালনীকে দিয়ে এসো—এসে আবার মাংস নিয়ে যাবে সিংহিনীর কাছে।

ছাল নিয়ে শেয়াল এলো সিংহিনীর কাছে, বললে—এই নাও মামী, মামা পাঠিয়েছে!

ছাল দেখে সিংহিনী রেগে আগুন! বললে—বটে! চালাকি! ছাল নিয়ে কি করবো? মাংস গেল কোথায়?

শেয়াল বললে—মেজাজ দেখাচ্ছো কি! মামা দিলে ছাল, আর তুমি চোখ রাঙাও আমাকে!

বলেই সিংহিনীকে ধরে শেয়াল তার গালে ঠাশ্ করে মারলো চড়—মেরে ছালখানা ফেলে দিয়ে সিংহর কাছে এলো।

সিংহ বললে হেসে—ছাল পেয়ে শেয়ালনী কি বললে?

—ওঃ, ভারী খুশী, মামা! শেয়াল বললে—ছানাদের নিয়ে সে-ছাল সে চাটতে বসে গেছে!

তারপর মাংস আর ছাল বওয়া...সিংহ ভাবছে, মাংস যাচ্ছে সিংহিনীর কাছে আর ছাল শেয়ালনীর কাছে! কিন্তু হচ্ছে ঠিক উল্টো!

কাজ চুকতে সন্ধ্যা হলো। তারপর যে যার নিজের গর্তে ফিরলো।

সিংহকে দেখে সিংহিনী উঠলো গর্জ্জন করে, বললে—তুমি না সিংহ! কোথাকার একটা শেয়াল···সে এসে আমাদের মেরে ধুমসে দিয়ে যায়!

—তার মানে?

সিংহিনী বললে—মানে, মোষের ছাল এনে শেয়াল বলে কিনা—তুমি পাঠিয়েছো...আমরা ছাল খাবো! আমি বললুম, ছাল কি কেউ খায় যে ছাল নেবো? এ-কথায় সে আমাকে ঠাশ্ ঠাশ্ করে চড় মেরে কি করে গেছে; দ্যাখো। সিংহিনী দেখালো গায়ের ফুলো আর কাটা-ছড়া দাগ।

হুঁ! সিংহ দাঁড়ালো না—রাগে গর্গর্ করতে করতে তখনি ছুটলো শেয়ালের ওখানে।

শেয়াল ওদিকে পাহাড়ে উঠেছে। কি ফূর্ত্তি! এত বড় মোষের মাংস···ছাল-ছাড়ানো...তৈরী... মুখে দিলেই হয়! বুক ফুলিয়ে শেয়ালনীকে আর ছানাদের বলছে নিজের বুদ্ধির কথা···পাহাড়ের নীচে থেকে সিংহ ডাকলো—শেয়াল, বলি, শেয়াল···

শেয়াল বললে;—এই রে, এসেছে! জানি, আসবে! কিন্তু এত শীগ্গির!

শেয়ালনী বললে—উপায়?

শেয়াল বললে—বুদ্ধি! বুঝলি শেয়ালনী, এই বুদ্ধি! ও হলো সিংহ···ওর নখে জোর, থাবার জোর,···দেহে জোর! আমার ও-সব জোর নেই, আমার শুধু বুদ্ধি। বুদ্ধির জোরে কি করি, ভাখ্!

গর্ত্তর বাইরে এসে শেয়াল বললে—কে? কি চাই? কেন এসেছো? কোথা থেকে এসেছো? নাম? বাপের নাম?...একসঙ্গে একেবারে সাতশো প্রশ্ন।

...সিংহ বললে—আমি সিংহ, তোমার মামা···তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কথা আছে—খুব দরকারী কথা।

—ও, মামা এসেছো! তা এসো, এসো, সোজা উপরে চলে এসো। ওখানে কেন?

সিংহ বললে—কি করে যাবো? যে খাড়া পাহাড়ের টঙয়ে থাকো।

—বটে! বটে! তা দড়ি নামিয়ে দিচ্ছি—সেই দড়ি ধরে উঠে এসো।

শেয়ালের ভাঁড়ারে ছিল নেংটি-ইঁদুরের ছাল দিয়ে তৈরী পল্‌কা দড়ি—সেই দড়ি শেয়াল দিলে ঝুলিয়ে···দিয়ে শেয়াল বললে—থাবা দিয়ে কষে চেপে ধরো—আমি উপর থেকে টেনে তোমাকে তুলি।

সিংহর মন নেচে উঠলো! উপরে উঠলে হয়···সবংশে আজ শেয়ালকে নিধন! সিংহ পণ করে বেরিয়েছে, শেয়ালের গুষ্ঠী ধ্বংস না করে ফিরবে-না! দড়ির খুঁট সে ধরলো চেপে।···শেয়াল মারতে লাগলো টান...হেঁইয়ো হেঁই···

সিংহ উঠছে···উঠছে...কিন্তু পচা পলকা দড়ি—সিংহর ভার সইতে পারবে কেন? আধাআধি উঠেছে, দড়ি গেল পটাং করে ছিঁড়ে...অত উঁচু থেকে সিংহ অমনি পড়লো ধপাস করে নীচে পাথরের উপর।...পা ভেঙ্গে, পিঠের হাড় ভেঙ্গে, তার দশা যা হলো, বলবার নয়! তার চীৎকার শুনে পাঁচটা জানোয়ার এসে কোনোমতে কি করে তাকে তার গর্ত্তে পৌছে দিয়ে এলো—ওঃ, সে এক কাহিনী আবার!

দক্ষিণ-আফ্রিকায় সেকালে বাস করতো হটেন্‌টট্‌ জাতের কাফ্রী। এখনকার অধিবাসীরা সেই প্রাচীন জাতের বংশ-সম্ভূত। .আমাদের দেশে গোঁড়া-মহলে আজো যেমন প্রদেশ-ভেদে ব্রাহ্মণ জাতের আচার-রীতিতে ভেদ দেখা যায়—যেমন বাঙালী ব্রাহ্মণ, ভোঁশলে প্রাহ্মণ, কনৌজী ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, এঁদের মধ্যে এখনো বিবাহাদি চলেনা—দক্ষিণ-আফ্রিকার হটেনটট জাতের কাফ্রীদের মধ্যে তেমনি রীতিমত ভেদ-বিভেদ আর সংস্কারের প্রাচীর আজো অটুট আছে।

কাফ্রী-জাতের মধ্যে এই হটেনটটরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে সবচেয়ে হীন। তাদের রূপকথায় তাই বুদ্ধির যেমন জৌলুশ দেখা যায় না, বৈচিত্র্যেরও তেমনি অভাব।

এদের কটি রূপকথা কজন জার্মান পাদরির চেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড ক্রনলিনের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক শেয়াল···তার সঙ্গে হলো হায়েনার বিয়ে।

বিয়ে যখন হলো, তখন বিয়ের ভোজ চাই! কোথায় কি পাবে—ভোজের আয়োজন কি হবে—ভেবে শেয়াল করলে কি···পাড়ায় এক-ঘর পিঁপড়ে থাকে—পিঁপড়েদের গোয়ালে আছে একটা গরু—সেই গরুটাকে শেয়াল রাত্রে চুপিচুপি আনলো টেনে। মানে, সেটাকে মেরে তার মাংস রেঁধে জন্তু-জানোয়ারদের নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়াবে।

গরুটাকে মেরে তার চামড়াখানা শেয়াল দিলে হায়েনা-বৌকে, বললে—এই চামড়া দিয়ে তোমার কুর্ত্তা বানাও।

তারপর শেয়াল বাড়ীর উঠানে তিনটে খুঁটা পুঁতলো। সেই তিন খুঁটাকে খিঁক করে তার উপরে চাপালো প্রকাণ্ড হাণ্ডা—চাপিয়ে সেই হাণ্ডার মাংস রাঁধতে বসলো। সে বসলো হাণ্ডার সামনে—মাটীতে কটা খুঁটা পুঁতে মাচা বানিয়ে, সেই মাচার উপর। সিংহ এলো নেমন্তন্ন খেতে। এসে সিংহ হাঁকলো—কোথায় হে শেয়াল...খাবারের দেরী কত?

শেয়াল বললে—এই যে, মাংসটা নামলেই পাত পেতে দেবো, পশুরাজ।

সিংহ বললে,—তাহলে একটু বসি।

শেয়াল বললে—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

শেয়াল ডাকলো তার শেয়ালনী-বোনকে। বোন এলো। শেয়াল বললে—একটা দড়ি নিয়ে আয় তো···

বোন একটা দড়ি নিয়ে এলো···শেয়াল বললে—দড়ির একটা দিক দে আমাকে...ছুড়ে।

বোন তাই করলো। শেয়াল সে-খুঁট বাঁধলো খুঁটার মটকায়, বেঁধে সিংহকে বললে—দড়িটা চেপে ধরুন পশুরাজ,—আমি টেনে আপনাকে উপরে তুলে নি—একেবারে মটকায়।

সিংহ দড়িটা চেপে ধরলো। শেয়াল টানতে লাগলো দড়ি—হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো!...

শেয়ালের সে-টানে দড়ি ধরে সিংহ উঠলো খুঁটির মাচার কাছাকাছি—যেমন সেখানে ওঠা,

শেয়াল অমনি দিলে তার খোঁড়ার খোঁচায় দড়ি কেটে—সঙ্গে সঙ্গে সিংহ পড়লো জোরসে ধপাং করে নীচে মাটির উপর। তার হাড়-পাঁজরা ঝনঝনিয়ে উঠলো।

শেয়াল দিলে তার বোনকে ধমক—মজবুত দেখে দড়ি আনতে পারলি নে। আরেকটু এখনি অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়েছিলি! তাও যার-তার নয়, পশুরাজের অপঘাত! যা, একটা মজবুত দেখে দড়ি এনে দে।

বোন আর একটা দড়ি এনে দিলে। শেয়াল বললে—যাক, যা হবার হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই। গায়ের ধুলো ঝেড়ে এবার এই দড়ি ধরে উঠুন, পশুরাজ। এ দড়ি মজবুত।

উপরে মাংসের হাঁড়ি থেকে ভুরভুরে গন্ধ বেরুচ্ছে...সিংহের খুব খিদে। হাড়-পাঁজরায় লাগার কথা সিংহ ভুলে গেল। গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে সে এ দড়ি ধরলো চেপে। শেয়াল টানছে দড়ি,—মারো জোয়ান হেঁইয়ো...

টানে-টানে দড়ি উঠছে উপরে—সিংহও দড়ি ধরে উপরে উঠছে। ক্রমে সিংহের মাথাটা এলো শেয়ালের নাগালে। শেয়াল বললে—হাঁ করুন পশুরাজ—রান্না কেমন হলো, একবার চেখে দেখুন।

সিংহ হাঁ করলো। এত বড় হাঁ! শেয়াল হাতায় করে এক-হাতা টগবগে-ফুটন্ত মাংসের ঝোল তুলে তার সবটুকু দিলে সিংহের হাঁ-য়ে ঢেলে।

আগুনের মতো ঝোল···যেমন গলায় পড়া, সিংহের টাগরা থেকে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত গেল জ্বলে। সেই জ্বলুনির চোটে সিংহ তখনি মরে গেল।

পিঁপড়েরা ওদিকে বাড়ী ফিরে এসে দেখে, গোয়ালে গরু নেই। কে নিলে? কে চুরি করলে? পিঁপড়েরা বেরুলো গরু খুঁজতে।

খুঁজতে খুঁজতে তারা এলো শেয়ালের বাড়ী। তাদের দেখে শেয়াল চুপিচুপি খিড়কির পথে সরে পড়লো।

শেয়ালের বাড়ীতে ঢুকে পিঁপড়েরা দেখে, গরুর চামড়ায় মাথা থেকে ল্যাজ পর্য্যন্ত ঢেকে হায়েনা বুড়ী বসে আছে।

পিঁপড়েরা রেগে আগুন। তারা বললে—বটে, তোর কাজ। গরু চুরি!

রাগে তারা হায়েনাকে মারতে লাগলো দড়াম-দড়াম লাঠি...সেই সঙ্গে তেয়োদের কুটুস-কাটুস কামড়।

চোখে কিছু দেখবার অবকাশ মিললো না হায়েনার। সে ভাবলো, শেয়াল তাকে ঠ্যাঙাচ্ছে। ভাবলো, বৌ-ভাতের দিনে বৌকে ঠ্যাঙানো বুঝি শেয়াল-জাতের রীত।

হোক রীত, তা বলে মেরে ফেলবে? হায়েনা সহ্য করতে পারলো না। সে উঠলো ডুকরে চেঁচিয়ে—রীত বলে এমন মার মারবি, হতভাগা! পিঠ আমার ভেঙে গেল যে...

মারের চোটে গরুর চামড়াখানা তার মুখ থেকে খসে পড়লো—তখন হায়েনা দেখে, শেয়াল নয়—রাজ্যের পিঁপড়ে বাড়ী-চড়াও হয়ে তাকে বেদম-মার মারছে।

কোনো মতে পালিয়ে হায়েনা দিলে চম্পট লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে—একেবারে গভীর জঙ্গলে।

সেই থেকে হায়েনারা আর লোকালয়ে মাথা গলায় না।
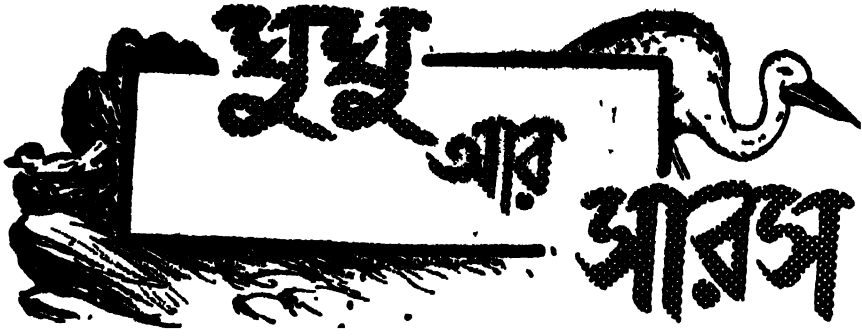
খুব উঁচু পাহাড়···পাহাড়ের মাথায় ঝুলন্ত পাথরে বাসা করে থাকে ঘুঘু পাখী।

পাহাড়ের নীচে শেয়াল এসে রোজ ঘুরঘুর করে, আর ঘুঘুর বাসার পানে তাকায়।

একদিন এসে পাহাড়ের নীচে থেকে শেয়াল ডাকলো—ও ঘুঘু; ঘু-ঘু-ঘু, শুনছো?

ঘুঘু বললে—কি?

শেয়াল বললে—তোমার অত ছানা—একটা ছানা আমায় দাও না?

শেয়ালের গুণ ঘুঘুর জানা আছে।

ঘুঘু বললে—না, কক্‌খনো না।

শেয়াল বললে—কেন? কেন দেবে না, বলো?

ঘুঘু বললে—এর আবার কেন কি। তোমাকে ছানা দিলে সে আর ফিরবে?

শেয়ালের ভারী অপমান বোধ হলো। অপমানে মেজাজ হলো খাপ্‌পা। ঝাঁজ-মেজাজে শেয়াল বললে—দিতে হবে। আলবৎ দেবে। এখ্‌খুনি দেবে। না দাও, আমি এখনি হুশ করে উড়ে তোমার বাসায় গিয়ে উঠবো।

এ-কথা শুনে ঘুঘুর ভারী ভয় হলো। তাইতো, আসে যদি? তাহলে ছানাদের একটিকেও রাখবে না। তার চেয়ে···

একটি ছানা সে দিলে শেয়ালের কাছে ফেলে।···শেয়াল ছানা নিয়ে চলে গেল।

দু দিন পরে শেয়াল আবার এসে ডাকছে—ওগো ও ঘুঘু···ও ঘু-ঘু-ঘু···

ঘুঘু বললে—কেন?

শেয়াল বললে—আজ একটি ছানা দাও।

ঘুঘু বললে—আবার?...না।

এক মানুষ···পাহাড়ের পথে চলেছে। সে-পথে পাথর-চাপা পড়ে একটা সাপ কাৎরাচ্ছে—পাথর ঠেলে কিছুতে আর বেরুতে পারে না!

মানুষকে দেখে সাপ বললে ডেকে—ওগো ও মানুষ...ও মানুষ...আমাকে বাঁচাও গো!

মানুষের মনে দয়া হলো। হোক সাপ, ভগবানের জীব! অসুখ নয়, বিসুখ নয়—পাথর-চাপা পড়ে মরবে! পাথর সরিয়ে সাপকে সে বাঁচালো।

পাথরের চাপ সরাতেই সাপ হলো নিশ্চিন্ত। ফণা তুলে সে ফোঁশ করে উঠলো! তার কাৎরানি গেল মিলিয়ে!

মানুষ বললে—চাও কি তুমি, শুনি?

সাপ বললে—তোমাকে কামড়ে খাবো।

মানুষ বললে—বাঃ! আমি তোমাকে বাঁচালুম—আর তুমি বলছো, আমাকে খাবে!

সাপ বললে—হ্যাঁ, খাবো...নিশ্চয় খাবো। ভয়ানক খিদে পেয়েছে আমার। জানো, কদিন ঐ পাথর-চাপা পড়ে আছি—কিছু মুখে দিতে পাইনি।

মানুষ বললে—বটে, তাহলে খাবার কথাই তো। তা খেয়ো; আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু পাঁচজনে বলবে কি? দু-পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করো, তারা কি বলে?

সাপ বললে—তার মানে?

মানুষ বললে—মানে, কাছেই থাকে এক খরগোশ। চলো, দুজনে সেই খরগোশের কাছে যাই। গিয়ে তাকে সব কথা বলি, যা হয়েছে···আর তুমি যা করতে চাও।

সাপ আবার বললে—তার মানে?

মানুষ বললে—মানে, খরগোশকে আমি বলবো, তুমি পাথর-চাপা পড়েছিলে—মরার জো—সেই পাথর সরিয়ে আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। এখন তোমার খিদে—আমাকে খেতে চাইছো।...এ কথা শুনে খরগোশ যদি বলে, আমাকে খেতে পারো, তখন খেয়ো! আমি তো পালাচ্ছি না!

কথাটা সাপ ভালো বুঝতে পারলো না। তবু ভাবলো, মানুষটা নাগালে আছে, যাবে কোথায়? যখন এ কথা বলছে, আচ্ছা! সাপ বললে—তুমি বলছো...বেশ, চলো খরগোশের কাছে।

দুজনে এলো খরগোশের কাছে। এসে দুজনে বললে খরগোশকে দুজনের কথা।

শুনে খরগোশ বললে—হুঁ, সাপের যখন ভয়ানক খিদে পেয়েছে, সত্যই তো, কদিন খেতে পায়নি...সামনে অন্য খাবার যখন মিলছে না, তখন সাপ তোমাকে খাবে। আলবৎ খাবে।

মানুষ বললে—এ কেমন বিচার হলো? চলো, আমরা যাই হায়েনার কাছে, সে কি বিচার করে।

দুজনে এলো হায়েনার কাছে—এসে হায়েনাকে সব কথা বললে।

শুনে হায়েনা বললে—খরগোশের কাছে তোমরা গিয়েছিলে! খরগোশ বলেছে, খাবে, আলবৎ খাবে। আমারো ঐ কথা...খাবে, আলবৎ খাবে।

মানুষ বললে—না, এ তো ঠিক বিচার হলো না। চলো, শেয়াল-পণ্ডিতের কাছে। তার বুদ্ধিশুদ্ধি ভালো।

এলো দুজনে শেয়ালের কাছে। শেয়ালকে সব কথা বলা হলো। শুনে ভুরু কুঁচকে শেয়াল বললে—পাথরের তলায় চাপা পড়েছিল সাপ···নড়তে পারছিল না...আর তুমি মানুষ, সেই পাথর সরিয়ে সাপকে করেছো উদ্ধার?

দুজনেই বললে—হ্যাঁ।

শেয়াল বললে—কত বড় পাথর? কোথায় সে পাথর? আমি চোখে দেখতে চাই।...শক্ত মকর্দমা! ভালো করে সব না দেখলে সুবিচার হতে পারে না তো!

দুজনেই বললে—চলো, দেখবে...বেশী দূরে নয় সে-জায়গা। পাথরও আছে সেখানে।

শেয়ালকে নিয়ে মানুষ আর সাপ এলো সে-জায়গায়।

সাপ বললে—ঐ সে পাথর।

শেয়াল বললে—বটে!

মানুষ বললে—আর এ পথে এইখান দিয়ে আমি যাচ্ছিলুম।

শেয়াল বললে—বটে!

দুজনেই বললে—হ্যাঁ।···দেখলে তো?

শেয়াল বললে—দেখলুম। কিন্তু আরো কিছু দেখতে হবে, বাপু। বিচার করতে হলে সব-কিছু ভালো করে দেখা উচিত।

দুজনেই বললে—আর কি দেখতে চাও?

শেয়াল বললে—এখন দেখাতে চাই, ঐ পাথরখানার তলায় কিভাবে তুমি চাপা ছিলে। তোমার

২৫

ল্যাজ ছিল কোন দিকে···মুখখানা কোন দিকে...আর দেহখানা কি ভাবে...। সেই সঙ্গে দেখা চাই। পাথর থেকে কত খানি তফাতে মানুষ চলেছিল।

সাপ বললে—বেশ, আমি ঠিক সেই জায়গায় শুই। পাথরখানা আমার উপর চাপা দাও—তাহলেই দেখবে।

সাপ শুয়ে পড়লো ঠিক সে-জায়গায়—মানুষ তার গায়ের উপর চাপালো পাথরখানা···সাপ না বেরুতে পারে, এমন করে।

শেয়াল বললে—এমনি তো? ভাখো, ভুল নয়? ঠিক?

সাপ বললে—হ্যাঁ। এবারে মানুষকে বলো, দেখিয়ে দেবে, কত তফাৎ দিয়ে ও যাচ্ছিল? তার পর···

তার কথা শেষ হলো না। শেয়াল তাকালো মানুষের দিকে, তাকিয়ে মানুষকে বললে—এবারে সরে পড়ো বাপু মানুষ। যে খল, যে পাজি, তার ভালো করতে নেই কখনো, বুঝলে, করলেই গ্যাছো—সাপ যেমন খল—থাক্ ঐ পাথরের নীচে চাপা। না-খেয়ে ও মরবে। ওর মরাই উচিত। পাথর সরিয়ে যে ওকে বাঁচাবে, ওর হাতে তার মরণ। আরে, এমন পাজি···যে তোকে বাঁচালো, তাকে তুই খেতে চাস। ঠিক হয়েছে। থাক ও এমনি। পাথরের নীচে চাপা থেকে শুকিয়ে মরুক। ···কথায় বলে, যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।

—কী…না? শেয়াল চোখ রাঙিয়ে উঠলো—উঠবো তাহলে তোমার বাসায়?

ভয়ে ভয়ে সেদিনও ঘুঘু একটি ছানা দিলে। ছানা নিয়ে শেয়াল গেল চলে।

ঘুঘু বাসায় বসে কাঁদছে…এমন সময় সারস এলো ঘুঘুর বাসায়।

সারস বললে—কাঁদচো কেন ঘুঘু?

ঘুঘু বললে—শোনো না, শেয়াল এসে ভয় দেখিয়ে দু-দুদিন আমার দুটো ছানা নিয়ে গেল। আবার যদি আসে?

সারস বললে—এত উঁচুতে তোর বাসা—এখানে শেয়াল কখনো আসতে পারে যে তাকে তোর ভয়!

ঘুঘু বললে—ছানা আমি দেবো না, বলেছিলুম। তাতে শেয়াল বললে, না দিলে উড়ে আমার বাসায় আসবে। তা যদি আসে, একটাকেও রাখবে না তো,—তাই আমি একটা ছানা দিয়েছিলুম প্রথম দিনে, বাকিগুলোকে বাঁচাবো বলে।

সারস দিলে ঘুঘুকে ধমক—আরে ছি ছি ছি—তুই এমন বোকা! শেয়ালের কি ডানা আছে যে উড়বে? ধাপ্পা দিয়ে তোর দু দুটো ছানা নিয়ে গেল। না, ছানা দিবিনে—খবর্দার, না। ওকে ভয় কি! ও উড়তে পারে না…তোর বাসায় কিছুতেই আসতে পারবে না!

এ-কথা বলে সারস চলে গেল।

দুদিন পরে শেয়াল আবার এলো। ঘুঘু বুঝলো তার মতলব।

ঘুঘু বললে—কি? আবার ছানা চাই? ছানা আমি দেবো না। ভয় দেখিয়ে বলা হয়, উড়ে বাসায় আসবো!…উড়বে, তা ডানা কৈ? মিথ্যা ভয় দেখিয়ে আমার দু-দুটো ছানা নিয়ে গেছ আজ আবার এসেছো ছানা চাইতে! ভাগো, ছানা পাবে না…ছানা আমি দেবো না। যা পারো, তুমি, করো।

শেয়াল শুনলো ঘুঘুর কথা। শুনে শেয়াল বললে,—ডানা নেই, তাতে কি! বেলুন দেখেচো, আকাশে ওড়ে? বেলুনেরও ডানা নেই, তবু ওড়ে। কে তোমাকে বলেছে, আমি উড়তে পারি না?

ঘুঘু বললে—কেন, সারস এসে বলে গেছে।

—ও! সারস! বটে! আচ্ছা, তাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওড়া কাকে বলে!

সেদিন আর ছানা পেলে না, শেয়াল নিশ্বাস ফেলে চলে গেল। কিন্তু রেগে রইলো সারসের উপর! তার এমন-মজার ভোজে সারস সাধলো বাদ!

এর দু-চার-দিন পরে নদীর ধারে সারসের সঙ্গে শেয়ালের দেখা। সারস কি খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে।

শেয়াল ডাকলো—ওহে, বলি, ও সারস…

সারস মুখ তুললো, বললে—আরে, শেয়াল-মশাই যে!

শেয়াল বললে—হ্যাঁ-[illegible] তাই সারস, ঐদিক থেকে যখন ঝড়ো বাতাস আসে, তোমার অমন লম্বা ঘাড়, কোন দিকে তখন তুমি ঘাড় বাঁকাও?

শেয়ালের দিকে ঘাড় কাৎ করে সারস বললে—কেন, এইদিকে—এমনি করে ঘাড় বাঁকাই।

শেয়াল বললে—আর যখন এদিক থেকে বাতাস যায়? ঝড় হয়? বৃষ্টি পড়ে,...তখন?

উল্টো দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সারস বললে—তখন এই দিকে, এমনি করে।

সারস যেমন উল্টো দিকে ঘাড় ফিরিয়েছে, শেয়াল অমনি ঝপাং করে ঘাড়ে পড়ে তার ঘাড়টা দিলে মোচড়ে।

সেই থেকে সারসের ঘাড় হয়ে গেছে অমন বাঁকাপানা...ও-ঘাড় কিছুতে আর এখন সোজা, কি, খাড়া থাকে না।

শেষ